প্রকাশক :
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিঃ
৪/৩বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

১৫ই আগস্ট ১৯৫৯

মুদ্রক :
শম্ভুনাথ চক্রবর্তী
লক্ষ্মী নারায়ণ প্রেস
৪৫/১/এইচ/১৪ মুরারী পুকুর রোড, কলিকাতা-৫৪

পূর্বভাষ

কেতাবী সাহিত্যপাঠ শুরু করবার আগে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ এবং প্রধান সাহিত্যিক আন্দোলন বা মতবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবহিত থাকা প্রয়োজন। একে বলা যেতে পারে সাহিত্যপাঠের উপক্রমণিকা, যেটি নিষ্ঠ সাহিত্য-পাঠকের পক্ষে কেবল প্রত্যাশিত নয়, আবশ্যিক।

ইংরেজিতে এই ধরনের উপক্রমণিকা আছে, বাংলাতেও আছে। বস্তুতপক্ষে ইংরেজি ভাষায় ঔপন্যাসিক-সমালোচক W. H. Hudson-এর An Introduction to the Study of Literature গ্রন্থটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রাথমিক গ্রন্থগুলির আদর্শ বলা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় এই জাতীয় প্রথম গ্রন্থ সম্ভবত শ্রীশচন্দ্র দাশ বিরচিত 'সাহিত্য-সন্দর্শন', যেটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। ইংরেজি ভাষায় তো বটেই, বাংলাতেও শ্রীশচন্দ্র দাশের গ্রন্থের পর এই ধরনের গ্রন্থ আরো কিছু লেখা হয়েছে এবং তা লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের কৃতী সমালোচকেরাই। এই অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থটি সেই ধারার এক তুচ্ছ সংযোজন মাত্র।

এই স্বীকারোক্তিকে বিনয় হিসাবে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রমথ চৌধুরী বর্তমান যুগকে 'ছোটোগল্প, খণ্ডকাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন' রচনার যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। যুগলক্ষণের এত ভালো সনাক্তিকরণ খুব বেশি হয়নি বলেই মনে হয়। এই যুগেও করবার মতো বড়ো কাজ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতেই উৎসাহ ও পরমায়ুর সার অংশ ব্যয়িত হয়ে যায়, বড়ো কাজ অস্পৃষ্টই থেকে যায়। এই গ্রন্থটিও সেই রকমই একটি অনিবার্য অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত।

সাধারণ পাঠক এবং সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরা যাতে সহজে সাহিত্য সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা লাভ করতে পারেন, বিস্তর আয়াস স্বীকার না করেও মোটামুটি ভাবে সাহিত্যপাঠের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারেন—সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই গ্রন্থ রচিত। সুতরাং গবেষণাধর্মী কোন বিশ্লেষণ, কোন নতুন তথ্য, এমনকি সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাও এই গ্রন্থে হয়তো পাওয়া যাবে না। সেই কারণে সাহিত্যের প্রকরণ সম্বন্ধে বা সাহিত্যিক আন্দোলন সম্বন্ধে মৌলিক সংযোজনের কোন দাবি আমার নেই, এবং সেই সঙ্গে একথা স্বীকার করতেও বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই যে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাগ্রসরদের জন্য এ গ্রন্থ নয়—যাঁরা সাহিত্য-অধ্যয়নের প্রথম পাঠ নিতে চলেছেন, এ গ্রন্থ তাঁদের কাছেই উপযোগী করে তোলার চেষ্টা করেছি।

গ্রন্থটি অবশ্যই দুটি খণ্ডে বিভক্ত থাকা উচিত ছিল, প্রথম খণ্ডে থাকতে পারতো সাহিত্যের প্রত্যেকটি প্রকরণ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাহার এবং দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখযোগ্য কিছু সাহিত্যিক মতবাদের বিশ্লেষণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেরকম কোন খণ্ডবিভাগ করা যায় নি। প্রথম সাতটি অধ্যায়ে আছে সাহিত্য-প্রকরণের পরিচয়, এ পরিচয় সংক্ষিপ্ত এবং অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের; গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে আছে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক আন্দোলনের পরিচয় এবং তা থেকে উদ্ভূত কিছু

পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা। প্রায় প্রত্যেকটি সাহিত্যিক আন্দোলনের পূর্বেই থাকে সমজাতীয় এক দার্শনিক আন্দোলন। পরিসরের স্বল্পতার কথা ভেবেই দার্শনিক জগতের সেই আন্দোলনের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি, উল্লেখ করেছি মাত্র। অবশ্য সাহিত্যিক আন্দোলনগুলিও বিশদ করার সুযোগ পাওয়া যায়নি।

একেই প্রাথমিক স্তরের গ্রন্থ, তার ওপর বিশদ করতে না পারার কুণ্ঠা, কাজেই এর স্বীকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন থাকাই স্বাভাবিক। সাগ্রহে রসিকজনের, এবং অবশ্যই বিদগ্ধজনের, মতামতের অপেক্ষায় থাকবো। একটি কথা এখানে বলা দরকার। বিভিন্ন প্রামাণ্য অভিধানের পরামর্শ নিয়ে আমার যে উচ্চারণগুলি সঠিক মনে হয়েছে, যথা রোম্যান্স, রোম্যাণ্টিক ইত্যাদি, সেগুলিই এখানে ব্যবহার করেছি। পাঠক নিজের বিবেচনামত তা গ্রহণ বা বর্জন করতে পারেন।

অতিক্ষুদ্র প্রচেষ্টা, তবু এর জন্য বিস্তর সময় নিয়েছি, ধৈর্যের প্রায় শেষ স্তরে পৌঁছবার পরই পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠাগুলি হাতে তুলে দিতে পেরেছি; এবং তাও যে শেষ পর্যন্ত পেরেছি তার জন্য তরুণ প্রকাশক শ্রীদেবাশিস ভট্টাচার্যের নিরন্তর তাগাদা এবং অশেষ ধৈর্যশীল মনোভাবই দায়ী। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে সে লজ্জা পাবে, আমার শুভেচ্ছাই তাকে জানালাম।

নাম ধরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গেলে এই গ্রন্থপ্রকাশে আরো বিলম্ব হয়ে যেতো, কারণ আমি কৃতজ্ঞ নই কার কাছে, তাই আমাকে ভাবতে হতো। আমার পণ্ডিত সহকর্মীরা, কাছের বন্ধুবান্ধব, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাশীল ছাত্রছাত্রীরা, যেসব গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি তাদের সুপণ্ডিত লেখকবৃন্দ—সকলের কাছেই আমার ঋণ স্বীকার করছি। বিশেষ করে নাম করতে হবে ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীদেবদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের। বিভিন্ন সময়ে তার সঙ্গে আলোচনায় উপকৃত হয়েছি।

আমি মূলত সাহায্য গ্রহণ করেছি দুটি ইংরেজি গ্রন্থ ও দুটি বাংলা গ্রন্থের। এগুলি হল W. H. Hudson-এর An Introduction to the Study of Literature, M. H. Abrams-এর A Glossary of Literary Terms, শ্রীশচন্দ্র দাশের সাহিত্য-সন্দর্শন এবং উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের সাহিত্যের রূপ-রীতি। এ ছাড়াও প্রাসঙ্গিক সাহায্য আছে বহু গ্রন্থের। আমি মুক্তকণ্ঠে এই সব সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এতো রকমের সাহায্যের পর বলবার কথা একটাই থাকে, শংসিত হবার মতো কোন গুণ এ গ্রন্থের থাকলে তার কৃতিত্ব অনেকের, নিন্দিত হবার সুযোগ করে দিয়ে থাকলে সে ত্রুটি সম্পূর্ণ আমার। শংসা ও নিন্দা যাই হোক, তা জানাবার কষ্ট স্বীকার করলে বাধিত হবো।

শেষ কথা, যাদের জন্য এ বই, তাদের ভালো লাগলে নিজেকে কৃতার্থ বিবেচনা

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

সাহিত্যপাঠের ভূমিকা

এক। শিল্পতত্ত্ব ও সাহিত্যালোচনা কী ধরনের তত্ত্ব, সে বিষয়ে বিভ্রান্তি ও মতভেদ—শিল্পের মাধ্যমভিত্তিক প্রকারভেদ। দুই। সাহিত্যসৃষ্টির কারণ—দৈবী আশীর্বাদ বা প্রেরণা—অনুকরণবাদ—বিস্ময়বোধ—রাবীন্দ্রিক ধারণা—সাহিত্যসৃষ্টিতে চিন্তার ভূমিকা—অবাস্তব জগতের চিন্তা, ব্যবহারিক চিন্তা, মানবিক চিন্তা—একক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি—মানুষ হিসাবে মানুষের অভিজ্ঞতা—মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ—প্রকৃতিজগৎ সম্বন্ধে চিন্তা—শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে ভাবনা—চিন্তার প্রকৃতি অনুযায়ী তিন শ্রেণীর সাহিত্য: আত্মমগ্ন বা মন্ময়, বস্তুধর্মী বা তন্ময় এবং তথ্যমূলক। তিন। সাহিত্যের উপাদান: হৃদয়গত—বুদ্ধিগত—কল্পনা—প্রয়োগকৌশল—মুখ্য উপাদান মানবজীবন।

॥ এক ॥

সাহিত্য কাকে বলে, এই প্রশ্ন করলে আমাদের অধিকাংশের মনের অবস্থা ঠিক যেরকম হয় সেটা বোঝা যাবে সেণ্ট অগাস্টিনের একটি রমণীয় উত্তর থেকে—"জিজ্ঞাসা যদি না করো তো আমি জানি, করলে আমি কিছু জানি না।"

সেণ্ট অগাস্টিন অবশ্য সাহিত্য প্রসঙ্গে এই উত্তর দেন নি, কিন্তু 'কবিতা কী?' এই প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর স্যামুয়েল জনসন প্রায় এই রকম একটি মন্তব্যই করেছিলেন—"Why, sir, it is much easier to say what it is not. We all know what light is, but it is not easy to tell what it is."

'কী নয় সেটা বলা সহজ, কী তা জানানোর চেয়ে'—এ কথা কেবল কবিতা সম্বন্ধে সত্য নয়, সমগ্র সাহিত্য সম্বন্ধেই সত্য। আবার শুধু সাহিত্যের কথাই বা বলি কেন, সমস্ত শিল্প সম্বন্ধেই বোধ হয় এ কথা প্রযোজ্য। শিল্প কাকে বলে, স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে সে বোধ আমাদের অনেকেরই আছে। রামকিঙ্করের একটি গতিময় ভাস্কর্য যখন দেখি, চোখে পড়ে পুরাণের পাতা থেকে উঠে-আসা রবি বর্মার ছবি, একটি অসাধারণ নাটকের অভিনয় দেখে যখন মুগ্ধ হই—আমরা বুঝে যাই কাকে বলে শিল্প; যিনি সে নাটক লিখেছেন তিনিও শিল্পী, যিনি অভিনয়ে তাকে সজীব করলেন তিনিও। শুধু কি এই, উদয়শংকরের মত নৃত্য-শিল্পী, আলি আকবর খাঁ সাহেবের মত যন্ত্রশিল্পী, সরোজিনী নাইডুর মত বাগ্মী—এঁরা সবাই তো শিল্পী। কাজেই এই ব্যাপক শিল্পগুলকে সংজ্ঞায় বেঁধে ফেলার মত দুঃসাধ্য কর্ম কেমন করে সম্ভব! কাজেই কেউ প্রশ্ন করলে সেণ্ট অগাস্টিনের মত এ কথা তো বলতেই হবে, যদি জিজ্ঞাসা না করো তো জানি, করলে নয়।

শিল্পের এই ব্যাপকত্বের জন্য যেমন এক কথায় তার পরিচয় দেওয়া খুবই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পণ্ডিত ও শিল্পরসিক মানুষদের মতভেদ

ব্যাপারটিকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে। যেমন, সাধারণভাবে স্বীকার করে নেওয়া হত যে আনন্দ দান করাই শিল্পের উদ্দেশ্য, তাই শিল্পতত্ত্বকে সৌন্দর্যতত্ত্ব হিসাবেই গ্রহণ করা হত। এ বিষয়ে প্রথম সমস্যা দেখা গেল একে সঠিকভাবে কী বলা হবে—সৌন্দর্যবিজ্ঞান না সৌন্দর্যদর্শন। এই প্রশ্নের মীমাংসা করা হলেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই—সৌন্দর্যবাদীদের মধ্যেই এত বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে, সেখানে সাধারণ পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্ত হয়ে পড়া ছাড়া আর কোন রাস্তাই খোলা নেই। এরপরও আমরা এমন কিছু শিল্পতাত্ত্বিকের সন্ধান পাবো যাঁরা সৌন্দর্যকে শিল্পের উদ্দেশ্য মনে করেন না, তাঁদের মতে শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দ। এই মতে বিশ্বাস করেন না এমন শিল্প-রসিকও আছেন। তাঁদের কেউ কেউ মনে করেন শিল্প আসলে রসতত্ত্ব, মনের ভাবকে রসে পরিণত করাই শিল্পের কাজ। অনেকের মতে আবার শিল্প হচ্ছে প্রকাশতত্ত্ব—প্রকাশের আবেগই তার উৎস এবং সমর্থ প্রকাশেই তার পরাকাষ্ঠা। আবার এমন মতও আছে যে কল্পনা, প্রতিভা, সৌন্দর্য, এসব কোন ব্যাপারই নয়—শিল্প জন্ম নেয় অভিজ্ঞতা থেকে। তাই শিল্পবিচারে এঁদের বলা যায় অভিজ্ঞতাবাদী বা বীক্ষণবাদী। এসব কথা যাঁরা বলেছেন, এসব চিন্তা নিয়ে বিভিন্ন ভাবধারা যাঁরা গড়ে তুলেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই রসজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তি। যেমন, বীক্ষণবাদীরা বলেন শিল্পতত্ত্বের সাধারণপ্রচলিত ইংরেজি নাম Aesthetics, যে শব্দটির মূলে আছে গ্রীক 'aisthesis' (যার অর্থ sense-perception বা ইন্দ্রিয়-সংবেদন) সুতরাং বীক্ষণতত্ত্বই শিল্পতত্ত্বের মূল কথা।

এখন কথা হচ্ছে, যখন পণ্ডিতদের মধ্যেই এত মতান্তর তখন আমরা, অত্যন্ত সাধারণ পাঠকেরা, কী করবো! আমাদের এই বিভ্রান্তিকর অবস্থায় মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্যগ্রন্থের সেই বিখ্যাত কবিতা 'পূর্ণিমা'-র কথা :

"পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা
সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা
করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব ; পড়ে হয় শেখা
সৌন্দর্য কাহারে বলে—আছে কী কী বীজ
কবিত্বকলায় ; শেলি, গেটে, কোল্‌রীজ
কার কোন্‌ শ্রেণী। পড়ি পড়ি বহুক্ষণ
তাপিয়া উঠিল শির, শ্রান্ত হল মন,

তন্দ্রাতুর চোখে, বন্ধ করি গ্রন্থখানি
ঘড়িতে দেখিনু চাহি দ্বিপ্রহর রাতি,
চমকি আসন ছাড়ি নিবাইনু বাতি।

যেমনি নিবিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্তদ্বারে, বাতায়নে, চতুর্দিক হতে
চকিত পড়িল কক্ষে বক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবনবিপ্লাবিনী মৌন সুধাহাসি।"

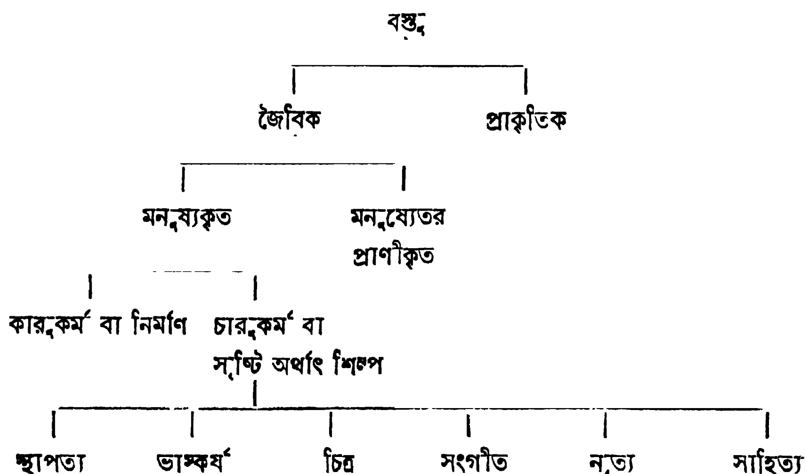
তবে মুশকিল হচ্ছে, মহৎ সাহিত্যপাঠের আসরে প্রবেশ করতে হলে সামান্য কিছু ধারণা তো রাখতেই হয়! কাজেই পণ্ডিতদের তর্ক-বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে আমরা বরং শিল্প-সাহিত্যের সেই প্রাথমিক জ্ঞান সংগ্রহ করবারই চেষ্টা করি।

শিল্প কলা কাকে বলে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যখন একটু অস্বস্তিকর মনে হচ্ছে, তখন বরং নেতিমূলক পথে এগোন যাক খানিকটা, অর্থাৎ শিল্প কাকে বলা যায় না সেই দিকে চোখ রেখেই অগ্রসর হই।

সৌন্দর্যের আকরই হোক বা আনন্দের প্রকাশই হোক, অথবা অভিজ্ঞতার ফসলও যদি বলি—শিল্প যে মানুষের নির্মিত বা মানুষের চেষ্টায় কৃত কোন বস্তু, এ সম্বন্ধে ভুল নেই। সুতরাং অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে তার পার্থক্য আছে: এই কথাটা একটু স্পষ্ট করে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে বস্তু দুরকম —প্রাকৃতিক আর জৈবিক অর্থাৎ জীবের দ্বারা কৃত। এবার এই জীবের তৈরি করা বস্তুকে যদি আমরা দুটি ভাগে ভাগ করি—এক ভাগে থাকবে মানুষের তৈরি বস্তু, অন্যভাগে মনুষ্যেতর জীবের তৈরি বস্তু (যেমন ধরা যাক পাখির বাসা, উইপোকার ঢিবি, মৌচাক প্রভৃতি)। মনুষ্যেতর জীবের তৈরি বস্তু অনেক সময়ই দেখে আমরা মুগ্ধ হই, অবশ্য আকাশে মেঘের খেলা কিংবা ফুলের বিচিত্র বর্ণের শোভাও আমাদের মুগ্ধ করে—কিন্তু তাদের তো আর আমরা শিল্পকর্ম হিসাবে অভিহিত করতে পারবো না। তাহলে শিল্প হল মানুষেরই করা কোন বস্তু, এ ভাবে বললে আমরা নেতিবাচক পথে অন্যান্য অনেক বস্তুর সঙ্গে তার একটা পার্থক্য রচনা করতে পারলাম। এবার দেখা যাক মানুষের করা সব জিনিসই শিল্প কিনা! নিশ্চয়ই তা নয়! মানুষ যন্ত্রপাতি বানায়, রুটি গড়ে, বাড়ি তৈরি করে—এ সব তো আর শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না। তার কারণ হল, মানুষ এগুলো প্রয়োজনের তাগিদেই করে, এর মধ্যে তার নিজের মুগ্ধতা, উপভোগ্যতা বা প্রয়োজনের বাইরে অন্য কিছু নেই। তাই এখানেও আমরা মানুষের তৈরি করা জিনিসকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি—ব্যবহার্য জিনিস এবং উপভোগ্য জিনিস, আর একটু সাধুভাষা ব্যবহার করে এদের বলতে পারি যথাক্রমে কারুকর্ম এবং চারুকর্ম। রবীন্দ্রনাথ এদের তফাৎ বোঝাতে গিয়ে একটাকে বলেছেন নির্মাণ, অন্যটাকে সৃষ্টি। প্রধানত সাহিত্য প্রসঙ্গে বললেও, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এই রকম—"সৃষ্টির উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না, নির্মাণের উদ্দেশ্য পাওয়া যায়। ফুল কেন ফোটে তাহা কাহার সাধ্য অনুমান করে, কিন্তু ইঁটের পাঁজা কেন পোড়ে, সুরকির কল কেন চলে, তাহা সকলেই জানে। সাহিত্য সেইরূপ সৃজনধর্মী, দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নির্মাণধর্মী।"

(সাহিত্যের উদ্দেশ্য / সাহিত্য)

যে ভাবে আমরা অগ্রসর হয়েছি তাতে বলতে পারি, চারুকর্ম অর্থাৎ মানুষের করা সৃষ্টিধর্মী বস্তুই শিল্প। অধ্যাপক সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর শিল্পতত্ত্ববিষয়ক একটি সমালোচনা-গ্রন্থে এই ব্যাপারটি বোঝাতে একটি রেখাচিত্র ব্যবহার করেছেন। তা অবলম্বন করে আমরা এই ভাবে তা সজ্জিত করতে পারি—



শিল্পের এই যে বিভিন্ন বিভাগ নির্দেশ করা হল তা প্রধানত শিল্পমাধ্যমের পার্থক্যের কারণেই ঘটে। মাধ্যম যখন পাথর তখন তা ভাস্কর্য, যখন রং ও তুলি তখন তা হয়ে যায় চিত্র, যখন কণ্ঠস্বর তখন তাকে বলতে পারি সংগীত, যখন তা দেহভঙ্গিমা বা অঙ্গবিক্ষেপ তখন তাকে বলি নৃত্য, সেই মাধ্যম যখন কাগজ-কলম বা ভাষা তখন সৃষ্টি হয় সাহিত্যের। এ বিষয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। স্থাপত্যকে অনেকে মনে করতে পারেন নির্মাণধর্মী, কণ্ঠস্বরের সাধনায় সংগীত শুধু নয়—বাগ্মিতাও শিল্পের মর্যাদা পেতে পারে বলে মনে করতে পারেন কেউ, আবার অভিনয়কে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে তাকে বাচন ও অঙ্গবিক্ষেপের যৌথ ক্রিয়া ভাবতে পারেন কেউ। যেহেতু শিল্প আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়, সেই জটিল বিতর্কে প্রবেশের কোন বাসনা আমাদের নেই।

সাধারণভাবে চারুশিল্পকে কারুশিল্পের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ তো দিয়েছেনই, নন্দলাল বসুও দিয়েছেন, তিনি বলেছেন—"চারুশিল্প আমাদের দৈনন্দিন দুঃখদ্বন্দ্বে সংকুচিত মনকে আনন্দলোকে মুক্তি দেয়, আর কারু-শিল্প আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলিতে সৌন্দর্যের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কেবল যে আমাদের জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে তাই নয়, অর্থাগমেরও পথ করে দেয়।"

অর্থাগমের প্রসঙ্গটা এসেছে কৌতুকের ছলে, কিন্তু মূল বক্তব্য এই যে কারুশিল্প প্রয়োজনের শিল্প, চারুশিল্প অপ্রয়োজনের ব্যাপার এবং তাকে বলা যায়, আনন্দিত সৃষ্টি। সান্তায়ানাও বলেছেন সেই একই কথা—"Art is objectified pleasure." আবার, আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে যে বিভাগটির উল্লেখ করেছি, ঠিক সেইভাবেই চারুশিল্পকে দেখতে আগ্রহী—অর্থাৎ আনন্দ, সৌন্দর্য ইত্যাদির প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে, এমন মত আজকের দিনেও দেখতে পাওয়া যায়। চারুশিল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকরণ বোঝাতে গিয়ে লিও টলস্টয় লিখেছেন—"To evoke in oneself a feeling one has exprienced, and having evoked it in oneself then by means of movement, hues, colours, sounds or forms expressed in words so to transmit that feeling that others experience the same feeling—this is the activity of Art."

সেইভাবে চারুশিল্পের যে বিভিন্ন শ্রেণী নির্দেশ করা হয়েছে, এর মধ্যে আবার বড় বা ছোট শিল্প বলে কোন ভেদাভেদ থাকতে পারে কি! এ বিষয়ে দার্শনিক হেগেলের মত হচ্ছে, যে চারুশিল্পে বস্তুর প্রাধান্য যত কম, তাই তাতে বড়ো শিল্প। এদিক থেকে বিচার করলে সবচেয়ে মোটা দাগের শিল্প আমরা বলতে পারি স্থাপত্যকে, কারণ তা কেবল ভারি নয়, অনেকটাই প্রয়োজনভিত্তিক। ভারির কথা ভাবলে তার পরেই এসে যায় ভাস্কর্য, যদিও প্রয়োজনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। মহত্তর শিল্পের সন্ধান করতে গেলে এরপর আমাদের মনে পড়বে চিত্রকলাকে, তারপর সংগীত এবং সবশেষে সাহিত্যকে। অর্থাৎ এভাবে বিচার করলে সাহিত্যই মহত্তম চারুশিল্প, বস্তুপ্রাধান্য এখানেই সবচেয়ে কম। আমাদের আলোচ্য বিষয়ও সাহিত্য, সুতরাং অন্যান্য চারুশিল্পের প্রসঙ্গে এখানেই ইতি টেনে আমরা এবার সাহিত্য বিষয়েই উৎসাহিত হতে পারি।

॥ দুই ॥

কাকে বলে সাহিত্য! এ প্রশ্ন জেগেছিল একেবারে আদিকবি বাল্মীকির মনে। সংস্কৃত ভাষায় উচ্চারিত প্রথম শ্লোক 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং' ইত্যাদির সঙ্গেই কবির যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ে প্রশ্ন জেগেছিল, এ আমি কী উচ্চারণ করলাম—'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া।' সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য সংস্কৃত আলংকারিকগণ বহু চিন্তিত প্রয়াস উপস্থিত করেছেন—ধ্বনিবাদী, রসবাদী, রীতিবাদী তাত্ত্বিকেরা অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এই চিন্তা প্রতীচ্যেও আমরা লক্ষ করি অনেক আগে থেকেই। সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে মূল্যবান আলোচনার জন্য অ্যারিস্টটল এবং তাঁর 'পোয়েটিক্স্' এখনও অমর হয়ে আছে, এখনও সাহিত্যালোচনার জটিল তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায় আমাদের শরণাপন্ন হতে হয় তাঁর। কিন্তু প্রতীচ্যে এইজাতীয় আলোচনার সূত্রপাত অ্যারিস্টটলের গুরু, আর-এক মহান দার্শনিক প্লেটো-র

হাতে, অথবা বলতে পারি তারও আগে 'ফ্রগ্‌স্‌' গ্রন্থে—যার রচয়িতা প্রায় চব্বিশশো বছর আগেকার কমেডি নাটক রচয়িতা অ্যারিস্টোফিনিস।

এর পর দীর্ঘকাল যাবৎ সাহিত্যতাত্ত্বিকরা নিয়োজিত রয়েছেন সাহিত্যের স্বরূপ এবং লক্ষণ বিচারের কাজে। সাহিত্যরচনার উৎসাহ কেন মানুষের মনে জাগে, 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি' কেন, সকলে কিছু লেখার চেষ্টা করলে 'বাক্য' হয়েই থাকে অথচ বিশেষ কারো কারো লেখা 'কাব্য' হয়ে ওঠে কী কারণে, কাব্যরচয়িতাদের প্রতি অলৌকিক ক্ষমতা বর্ষিত হয় কিনা—এই ধরনের অনেক প্রশ্নই তাত্ত্বিকদের আলোড়িত করেছে। দার্শনিক সক্রেটিস এবং প্লেটো কবিদের সম্বন্ধে যে ঐশী প্রেরণার উল্লেখ করেছিলেন, তার পর থেকেই নানাভাবে এই প্রেরণার ব্যাপারটা একটা তাত্ত্বিক চেহারা লাভ করেছে। আবার ওই একই সঙ্গে দার্শনিক অ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদী চিন্তার ফলে অনুকরণবাদের উদ্ভব ঘটেছে, যার বলে সাহিত্যপ্রতিভা এই রকম কোন দৈবী প্রতিভানিরপেক্ষ এক শক্তি বলে পরিগণিত হয়েছে।

মানুষের মনে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা আসে কেবলমাত্র ঈশ্বর যখন সে শক্তি তাকে দান করেন, প্লেটোর এ কথা সত্যি ধরে নিলে যে কী সমস্যার উদ্ভব ঘটে তা প্লেটোরই লেখা থেকে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, হোমারের মতো কবি যখন দিব্যোন্মাদ হয়ে যান তখনই লিখতে পারেন এবং সেই দিব্যোন্মাদনা ও ঐশী শক্তির প্রকাশ না ঘটলে কারো পক্ষে সে লেখার সঠিক রসগ্রহণেও সম্ভব নয়। এই কথায় বিস্মিত হয়ে আয়োন বলেছে—"That is good, Socrates; and yet I doubt whether you will ever have eloquence enough to persuade me that I praise Homer only when I am mad and possessed; and if you could hear me speak of him I am sure you would never think this to be the case."

সাহিত্যসৃষ্টির নেপথ্য কারণ হিসাবে যদি দৈবী আশিস্‌ বা প্রেরণা সঞ্চারের ব্যাপার থাকে, তবু তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন কারণ আছে কিনা সেটাই আমাদের চিন্তা করতে হবে, কারণ যে শক্তি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা করাই সম্ভব নয়, তাকে বিশ্লেষণের ক্ষমতাও আমাদের নেই। আমাদের ধারণার সীমার মধ্যে যা আছে, তার বিচার-বিশ্লেষণই আমাদের পক্ষে সম্ভব।

সেই ভাবে চিন্তা করতে গেলে দেখা যাবে, মানুষ নিজে যা অনুভব করে সেই অনুভূতি প্রকাশের জন্য তার একটা ব্যাকুলতা আছে। এর দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ তার অনুভূতির ক্ষেত্র অনেক বড়ো—পশুর মতো খাদ্য-অনুসন্ধান এবং বংশবিস্তারের মধ্যেই তার চিন্তা ও পরিশ্রম সীমাবদ্ধ নয়। দ্বিতীয়ত সে বস্তুজগতকে ঠিক যেমনটি দেখে ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করে না—বাস্তব অস্তিত্বকে নিজের মনের

মাধুরী মিশিয়ে সে একটু অন্যরকম ভাবে তৈরি করে নেয় হৃদয়ের মধ্যে। এই দুটি কারণেই নিজের অনুভূতিকে সে প্রকাশ করতে যায়।

অবশ্য এর পেছনে রূপনির্মাণের একটা আগ্রহও আছে। মানুষ শিল্পসৃষ্টি করতে পারে, নিজের সৃষ্টি দেখেই হয়তো মানুষ তা শিখেছে এবং তারপর থেকেই হয়তো সে নিজের সৃষ্টির প্রেমে পড়ে গেছে। সে গুহার গায়ে আঁচড় কেটে দেখেছে, তার শিকার-দৃশ্যের কিছুটা আনুরূপ্য ফুটে উঠেছে সেখানে। পাহাড়ের টুকরো ঘষে দেখেছে তার চেহারায় আকৃতি ফুটে উঠেছে কোন কিছুর। সাহিত্যের ব্যাপারটা এসেছে নিশ্চয়ই অনেক পরে, কিন্তু রূপনির্মিতির প্রতি ঔৎসুক্যও যে সাহিত্যরচনার একটি প্রধান কারণ এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সমস্ত সৃষ্টির মূলে আছে বোধহয় মানুষের বিস্ময়বোধ। এই জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে মানুষ ছিল অত্যন্ত উৎসুক। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তার প্রতিটি জিনিসই আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। একদিকে পর্বত, সমুদ্র, আকাশের মতো বিশাল সৌন্দর্য, অন্যদিকে অগ্নি, বজ্রবিদ্যুৎ, ঝঞ্ঝার মতো প্রবল শক্তি আমাদের ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত করেছে। কিন্তু কেবল বিশাল জিনিস নয়, মানুষ যখন একটি বর্ণোজ্জ্বল প্রজাপতি দেখেছে সে বিস্মিত হয়েছে, ফুলের শোভা তাকে মুগ্ধ করেছে, পাখির কূজন তার ভালো লেগেছে। এই বিস্ময়ের কারণেই মানুষের মুগ্ধতা, মুগ্ধতার জন্যই ভালোবাসা, আবার ভালোবাসার সূত্রেই পৃথিবীর ওপর তার আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ এই বিস্ময়বোধকে তাই বোধহয় বলতে চেয়েছেন 'হৃদয়ের জারক রস'। মনুষ্যেতর প্রাণীর হৃদয়ে এই বিস্ময়বোধ নেই বলেই তার জগৎ অত্যন্ত সীমিত, কিন্তু মানুষের পৃথিবী অনেক বড়ো—সে যেমন তার কাছের জিনিসকে জানতে চায়, তেমনি জানতে চায় দূরের জিনিসকে; যেমন সে জানতে চায় অপরকে, তেমনি জানতে চায় নিজেকে।

আর এই যে জানা, এ শুধু চোখ দিয়ে জানা নয়, কান দিয়ে শোনা নয়—এর সঙ্গে যুক্ত আছে হৃদয়। ইন্দ্রিয়ের জগৎকে পরিবর্তিত করছে অনুভূতি—অনুভূতির সাহায্যে দৃশ্যমান জগৎকে আমরা আমাদের মনের মধ্যে একটা নতুন জগতে পরিণত করে চলেছি। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে লিখেছেন—"বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর-একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্বনি প্রভৃতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।"

'হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রস' আছে বলেই বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা, কৌতূহল ও জানার আনন্দ এতো প্রবল। মানুষ যে পৃথিবীতে বাস করে প্রথমে সেই পৃথিবীকে সে ভালো করে জানতে চেয়েছে তার বাঁচার চেষ্টাতেই, তার

অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করতে। এরপর জেগেছে তার বিস্ময়—বৃহৎ শক্তি সম্বন্ধে, ক্ষুদ্র সৌন্দর্য সম্পর্কে, দৃশ্যমান সব কিছু সম্পর্কে। মানুষের মনে এই যে সৌন্দর্যের জগৎ জেগে উঠেছে, সেই হৃদয়ের জগৎকেই সে প্রকাশ করতে চেয়েছে। চোখে দেখা পৃথিবী যেমন তাকে মুগ্ধ করেছে, তেমনি চোখে দেখা যায় না এমন জগতের কথাও সে কল্পনা করেছে—কল্পনার এই প্রসারও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানুষ এই বাস্তব জগতের মতো অন্য জগতের কল্পনা করেছে আকাশলোকে, ভেবেছে পাতালেও এই রকম আর একটি পৃথিবী আছে—ফলে এক ভুবনের অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে ত্রিভুবনের কল্পনা। সে ভাবতে চেষ্টা করেছে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমানের কথা। এই অতিলৌকিক শক্তির চিন্তাতেই তার মনে এসেছে স্বর্গলোকে দেবতাদের কথা, সেই সঙ্গেই সে ভেবে ফেলেছে পাতালে অসুর-শক্তির পরাক্রমের কথা।

অবশ্য এসব চিন্তা মানুষের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের চিন্তা। তাই তার সাহিত্যেরও একেবারে আদিকালে এই সব চিন্তার প্রকাশ আমরা দেখি। মানুষের চিন্তাশক্তি যতো পরিণত হয়েছে ততোই, এই বহির্জগতের চেয়ে মানুষ এবং মানুষের বিচিত্র মনোজগৎ তার উৎসাহের কেন্দ্রে চলে এসেছে। নিজে ছাড়া অন্যান্য যেসব মানুষ রয়েছে—তার পরিবারে, তার গোষ্ঠীতে, অন্যান্য গোষ্ঠীতে, তাদের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে তার। তারপরে এসেছে মানুষের নিজের সম্বন্ধেই চিন্তা—উদরপূর্তির চিন্তা নয়, বাসস্থানের চিন্তা নয়, এরচেয়ে অনেক বেশি স্বার্থবিযুক্ত চিন্তা, অনেক বেশি মানবিক চিন্তা। মানুষ হিসাবে আমাদের করণীয় কী, মানব-জীবনের সার্থকতা কী—মানুষের প্রকৃত জীবনযাপন ঠিক কেমন হওয়া উচিত, এই সব চিন্তা। এই সঙ্গে অর্থাৎ জীবনে সার্থকতার প্রশ্নের সঙ্গেই মানুষের মাথায় এসেছে মৃত্যুচিন্তা, মানুষের পরিণামের চিন্তা। মৃত্যুচিন্তার সঙ্গেই বিকশিত হয়েছে প্রাসঙ্গিক আরো অনেক কিছু—নিয়তি বা অদৃষ্ট চিন্তা, পাপ-পুণ্যের চিন্তা, কর্মফল, জন্মান্তর ইত্যাদির চিন্তা। আসলে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ-বীতরাগ, স্বপ্ন ও ভালোবাসা—এক কথায় তার সংরক্ত অনুভূতির জগৎ এতোই প্রবল যে, মৃত্যুই মানুষের জীবনের সব কিছুর আকস্মিক ছেদ, এক চরম পরিসমাপ্তি—এ কথা মানুষ মন থেকে মেনে নিতে পারে না। সেইজন্যই মানুষের এই ধরনের চিন্তা, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক পথ-পরিক্রমা। এর মধ্যে কতটুকু সত্য কতটুকু অসত্য সে আমাদের বিচার্য নয়, সম্ভবত তা আমাদের সাধ্যের মধ্যেও নয়। কিন্তু চিন্তার জগৎ যেহেতু আমাদের সাহিত্যেরই জগৎ, তার একটা পরিসীমা আছে, একথাও আমাদের জেনে রাখা উচিত।

চিন্তার আর একটি মাত্রাগত বৈচিত্র্যও আছে, সেটি নির্দেশ করেছেন সমালোচক হাডসন। সেদিক থেকে বিচার করলে আমরা পাই চিন্তার বিষয়। অথবা চিন্তার প্রতিফলনই যেহেতু সাহিত্য, এমন কথাও বলা যায় আমরা এই ভাবে বিশ্লেষণ করলে

পেয়ে যাই সাহিত্যের বিষয় সম্বন্ধে কিছু স্থূল বিভাজন-রেখা। সেগুলি এইরকম—

ক) একক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির বিবরণ, বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তিত্ব হিসাবেই। তার এই চিন্তার দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তি, সমাজ বা সামাজিক কোন সত্যের স্বরূপ পরিস্ফুট হয় কী না আমাদের জানার দরকার নেই। এর দ্বারা সে ব্যক্তি হিসাবে নিজেকেই স্পষ্ট করে তোলে। একদিকে যেমন আমরা পাই তার বাহ্যিক আচরণ ও পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার, অন্যদিকে তার অন্তর্জগতেরও উদ্ভাস ঘটে। অর্থাৎ, এক কথায় বলতে গেলে, আমরা সেই মানুষটিকে বা একক ব্যক্তিত্বকে চিনে নিতে পারি।

খ) মানুষ হিসাবে মানুষের অভিজ্ঞতা। এখানে সমস্যা ঠিক একক মানুষের নয় এবং সমস্যার প্রকৃতিও প্রাত্যহিক জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত নয়। সেটা নয় বলেই সমস্যার প্রকৃতি নৈর্ব্যক্তিক এবং সামান্য। একটা জীবনের সার্থকতা কী, মরণোত্তর কোন অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কী না, পাপ-পুণ্য বলে সত্যিই কিছু আছে কী না—এই ধরনের বোধ আমাদের কোন্ দিকে পরিচালিত করছে, ঈশ্বর যদি থাকেন মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঠিক কী রকম, মানবজাতির ভবিষ্যৎ কী, এই ধরনের প্রচুর জিজ্ঞাসা। এগুলি সবই মানবিক জিজ্ঞাসা, কিন্তু এ প্রশ্ন সাধারণভাবে প্রত্যেকটি মানুষের, কোন ব্যক্তিগত মানুষের নয়।

গ) মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের চিন্তা, এক কথায় তার সামাজিক চিন্তা। সমাজের অন্যান্য মানুষের প্রতি একক ব্যক্তির কী ধরনের মনোভাব হওয়া উচিত, অথবা সমাজকে তার কী দেবার আছে বা সমাজের জন্য তার কিছু করণীয় আছে কী না। সামাজিক ক্রিয়াকর্মের তাৎপর্য—ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতা তা ব্যাহত করে অথবা ব্যক্তিজীবনকে উদ্দীপ্ত করতে সাহায্য করে, এই ধরনের চিন্তাভাবনা।

ঘ) বাইরের প্রকৃতির জগৎ সম্বন্ধে চিন্তা। একে এক অর্থে নিসর্গচিন্তা বলা যায়, সৌন্দর্যচিন্তাও বলা যায় কিছুটা সংকীর্ণ অর্থে। আসলে প্রকৃতি ও মানুষ —এই নিয়ে পার্থিব জগৎ, সুতরাং একে অন্যের পরিপূরক কী না, আমাদের অনুভূতি ও জীবন নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতির কোন ভূমিকা আছে কী না, এইরকম নানা প্রশ্ন আমাদের আন্দোলিত করতে পারে। বস্তুত ভারতীয় সভ্যতার আদিযুগে এই প্রশ্ন বিচলিত করেছিল আর্য ঋষিদের। প্রকৃতির বিশাল শক্তি দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাঁরা পবন, বরুণ, উষা, আকাশ প্রভৃতিকে দেবতাজ্ঞানে বন্দনা করেছেন।

ঙ) শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে মানুষের ভাবনা। শিল্পে-মানুষ বিভিন্ন প্রকারভেদের কথা ভাবতে পারে, নানা প্রকরণে তার সৃষ্টিক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারে, অথবা মানুষ শিল্প ও সাহিত্যে তার যে সাফল্য এবং সৃষ্টিক্ষমতার বিকাশ, তাকেই বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে।

মানুষের যে চিন্তা তার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়, তার এই বিভিন্ন

মাত্রাগত বৈচিত্র্য বিচার করলেই সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের একটা রূপরেখা আমরা পেতে পারি। যেমন হাডসনের নির্দেশিত চিন্তার এই পাঁচটি চরিত্র-বৈশিষ্ট্য স্মরণ রাখলে সাহিত্যের পাঁচটি স্থূল প্রকারভেদও আমরা তাৎক্ষণিক ভাবে নির্দেশ করতে পারি যথাক্রমে এইভাবে—আত্মগত বা মন্ময় সাহিত্য, সাধারণভাবে মানুষের জীবন-নির্ভর সাহিত্য, সামাজিক সত্যমূলক সাহিত্য, নিসর্গচেতনামূলক সাহিত্য এবং সাহিত্য ও শিল্প সংক্রান্ত রচনা।

অবশ্য ঠিক এইভাবে সাহিত্য-প্রকরণের বিভাগ করা চলে না, কারণ এই বিভাগ একান্তভাবেই বিষয়নির্ভর। সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের কথা যখন আমরা ভাবি তখন কেবল বিষয়ের কথা ভাবি না, তার আঙ্গিকের কথাও ভাবি। তাছাড়া প্রকরণের বিভাগ ও উপবিভাগের সূক্ষ্মতায় যে প্রচুর বৈচিত্র্যের মুখোমুখি হতে হয়, এতো সাধারণ বিভাগে তার কাছাকাছি পেঁছিনোও সম্ভব নয়। সুতরাং এই আলোচনা স্মরণ রেখেই আমরা অন্যভাবে সাহিত্যের শ্রেণীবিচারের কথা ভাবতে পারি।

মানুষের চিন্তার একেবারে উৎসমূলে গিয়ে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের কথা ভেবেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন —"যখন হৃদয়, কোন বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথার দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেইটুকু গীতিকাব্য-প্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়।"

এখানে আমরা সাহিত্যের এক স্থূল শ্রেণীবিভাগ পাই, এবং বুঝতে পারি প্রকৃতি অনুযায়ীই বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্যের রূপনির্মিতি স্পষ্ট হয়। নাটককে সাধারণভাবে দৃশ্যকাব্য বলা হয়, তার দৃশ্যত্ব নামক ধর্মটির ওপরই প্রাচ্য সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা বেশি জোর দিয়েছেন। সাধারণ রূপের বিচারেও তাকে আমরা বলে থাকি 'উক্তি-প্রত্যুক্তিবন্ধ', কারণ নাটকের উপজীব্য কেবল সংলাপ এবং নাট্যনির্দেশিত ক্রিয়া। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আরো গভীরভাবে বিচার করে দেখাতে চেয়েছেন, মানুষের কোন কোন হৃদয়ভাবেরই এমন বৈশিষ্ট্য থাকে যে কথা এবং ক্রিয়াদ্বারা তা প্রকাশ করা সম্ভব, এবং নাট্যকার সেই ধরনের ভাবই নাটকের জন্য গ্রহণ করেন। যে হৃদয়ভাব অব্যক্ত, যা কথার দ্বারা এবং ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশের যোগ্য নয়, তা যদি বিষয় হিসাবে নাট্যকার গ্রহণ করেন তাহলে কী অনর্থ ঘটে তাও বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন ভবভূতির 'উত্তরচরিত' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে:

যে হৃদয়ভাব অব্যক্ত, তা গীতিকবি কেমন করে প্রকাশ করেন, সে অন্য প্রসঙ্গ এবং তা সবিস্তারে আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে, মহাকাব্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে মাত্র তিনটি প্রকরণ আশ্রয় করে সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগের উৎসমূল দেখিয়েছেন, হাডসনের অবলম্বন সেরকম তিনটি মাত্র প্রকরণ নয়, কিন্তু বিভাগের ক্ষেত্রে তিনি অযথা জটিলতার সৃষ্টি করেন নি। চিন্তায় যেসব বৈচিত্র্যের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি সেদিক থেকে বিচার করলে সাহিত্যের প্রধান শ্রেণী হতে পারে তিন ধরনের—

ক) আত্মমগ্ন বা মন্ময় সাহিত্য : এখানে যিনি সৃষ্টি করছেন, তাঁর হৃদয়ের উন্মোচনই বড় কথা, অর্থাৎ তিনি তাঁর হৃদয়ের কথাই বলুন অথবা বাইরের কোন মানুষ, বস্তু বা প্রকৃতির কথাই বলুন—এগুলি উপলক্ষ করে তাঁর নিজের চিন্তার যে প্রতিফলন এবং তার দ্বারা স্রষ্টা-হৃদয়ের যে অন্তরঙ্গ উদ্ভাস, সেটিই সৃষ্টিকর্মে বড় হয়ে ওঠে। কবিতার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গীতিকবিতা এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং সেই একই কারণে ধর্মমূলক খণ্ডকবিতা, শোকগাথা এমনকি আধ্যাত্মিক চিন্তার কবিতাও মন্ময় সাহিত্যের মধ্যেই পড়তে পারে। কবিতা ছাড়া এক ধরনের প্রবন্ধকেও আমরা আত্মমগ্ন বলতে পারি, যাদের আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ। রম্যরচনায় প্রায়ই বাইরের একটি বিষয় প্রাধান্য পায়, কিন্তু যেখানে বাইরের বিষয় উপলক্ষমাত্রে পরিণত হয়, লেখকের অন্তর্জগতই আলোকিত হয় বেশি—সেখানে রম্যরচনাও নিঃসন্দেহে মন্ময় সাহিত্যেরই দৃষ্টান্ত। একই সঙ্গে বলা যেতে পারে একটি বিশেষ ধরনের সমালোচনার কথা যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Impressionistic Criticism, বাংলায় বলতে পারি প্রতীতি-মুখ্য সমালোচনা। এই ধরনের সমালোচনায় লেখকের মনের বিশেষ ধারণা বা প্রতীতিই নিয়ন্ত্রণ করে তাঁর রচনাকে, তথ্য ও যুক্তি নয়। সুতরাং এই জাতীয় সমালোচনাকেও আমরা আত্মমগ্ন রচনাই বলবো।

খ) বস্তুধর্মী বা তন্ময় সাহিত্য : এই ধরনের সাহিত্যে স্রষ্টার হৃদয়ের উন্মোচন আমাদের কাছে মুখ্য আকর্ষণ নয়, বহির্জগৎ এবং অন্যান্য মানুষ সম্বন্ধে তাঁর বোধ ও অভিজ্ঞতা কীভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাই আমাদের উৎসাহিত করে। কবিতার মধ্যে দীর্ঘ আখ্যানমূলক কবিতা আখ্যানকাব্য বা গাথাকাব্য এই বিভাগে পড়তে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মহাকাব্য মন্ময় ও তন্ময় ধারার মিশ্র রূপ, কিন্তু প্রকরণের বিচারে মহাকাব্যকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। নাটক অবশ্যই এই শ্রেণীতে পড়বে কারণ নাট্যকার সর্বদাই নিজেকে অনুপস্থিত রাখতে চান নাটকে, এবং তন্ময়তাই এই সাহিত্য-প্রকরণের প্রধান ধর্ম। উপন্যাস, অর্থাৎ নভেল ও রোমান্স—এই দু ধরনের রচনাই বস্তুধর্মী সাহিত্য হিসাবে গণ্য হতে পারে, যদিও উপন্যাসে লেখকের জীবনদৃষ্টি এবং জীবন সম্বন্ধে

বোধ অত্যন্ত মূল্যোবান। তদ্‌সত্ত্বেও বাস্তব জীবনবীক্ষা এবং লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতাই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন বলে তাকে তন্ময় সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না করে উপায় নেই। একই কারণে ইতিহাস এবং মহৎ জীবনীকাব্যও এই দ্বিতীয় বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত ধরে নিতে হবে।

গ) তথ্যমূলক সাহিত্য : কেবল তথ্য দান করাই যে সাহিত্যের কাজ, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'জ্ঞানের বিষয়' এবং ইংরেজিতে সাধারণভাবে যা পরিচিত literature of knowledge নামে, তাকেই আমরা এই তৃতীয় বিভাগের মধ্যে ফেলতে পারি। গুরু প্রবন্ধ, তথ্যমূলক সমালোচনা এমনকি ভ্রমণকাহিনীকেও আমরা এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত মনে করতে পারি। তবে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে সাহিত্যের এই বিভাগটির গুরুত্ব খুব বেশি নয়, অন্তত সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের কথা চিন্তা করলে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হবে যে গুরু প্রবন্ধের মধ্যে-যেখানে কোন লেখকসত্তার বা কোন সৃষ্টির অন্তরঙ্গ রহস্য-উন্মোচন আছে, কিংবা ভ্রমণকাহিনী যেখানে তার তথ্যের ভার একান্ত লঘু করে দিয়ে আদ্যন্ত সাহিত্যরসে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে সেখানে তাকে আমরা তথ্যমূলক সাহিত্য বলতেই পারি না - লেখক নিজেই সেখানে নিবিড় ভাবে ধরা দেন। উদাহরণ হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ', প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' বা সৈয়দ মুজতবা আলির 'দেশে-বিদেশে' গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে।

॥ তিন ॥

সাহিত্যের যে-কোন প্রকরণেরই প্রধান উপাদান মোট চারটি, যার প্রথমটি অভিহিত হতে পারে হৃদয়গত উপাদান নামে। এই উপাদান হৃদয়-সংবেদন জাগায়। সৃষ্টির ইচ্ছা প্রাথমিকভাবে হৃদয়েই জাগে, তার কারণ যাই হোক না কেন। যাঁরা প্রতিভাবাদী তাঁরা মনে করেন, কেবল প্রতিভাবানদের—অর্থাৎ ঈশ্বর যাঁকে কবিপ্রতিভা দান করেছেন, কেবল তাঁরাই হৃদয়ের এই উপাদান লাভ করেন। ফলে 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' যাঁরা প্রেরণাবাদী তাঁদের ধারণা উপযুক্ত প্রেরণা এলে সকলেই এই সংবেদন লাভ করতে পারেন। আবার অ্যারিস্টটল-এর মত মনীষীর ধারণা, এই উপাদান সকলেরই মনে আছে—প্রতিভা বা প্রেরণার বিশেষ কোন ভূমিকা এক্ষেত্রে নেই। সমালোচকদের অভিমত যাই হোক, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছাটা হৃদয়ের এই উপাদানের ওপরই নির্ভরশীল, সাহিত্যসৃষ্টিও তার ব্যতিক্রম নয়। কোন মানুষ, কোন দৃশ্য, কোন ঘটনা বা কোন অভিজ্ঞতা তাঁর হৃদয়ে যে আবেগ জাগায়, সেই আবেগই তাঁর রচনার প্রাথমিক উৎস। একে বলা যায় সৃষ্টির আবেগ। কাজেই, শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাবার চেষ্টা যেখানে না হয় সেখানে হৃদয়গত উপাদান থাকবেই।

সাহিত্যের দ্বিতীয় উপাদান বুদ্ধিগত। সাহিত্যরচনার আবেগ অনুভব করলেই তা রচনা করা যায় না, তাকে কাজে পরিণত করতে বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। সাহিত্যে এই বুদ্ধিগত উপাদানের দুটি কাজ আছে—প্রথমত বিষয়-নির্বাচন, দ্বিতীয়ত রূপ-নির্বাচন। মনে অনেক কারণেই আবেগ জন্ম নেয়, প্রাত্যহিক জীবনে পরিচিত ও অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে ব্যবহারে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে যা আমাদের হৃদয়কে আলোড়িত করে। কিন্তু এই আবেগের মধ্যে কোনগুলি সাহিত্যে প্রকাশের যোগ্য, কোনগুলি তা নয়—এই ব্যাপারটা ঠিক করে নিতে হয় বুদ্ধিকেই। একেই বলা যায় বিষয়-নির্বাচন। এরপর থাকে রূপ-নির্বাচন। যে বিষয়টি সাহিত্যে প্রকাশের জন্য নির্বাচিত হল, তাকে কোন্ রূপে অর্থাৎ সাহিত্যের কোন্ প্রকরণে প্রকাশ করলে তা সবচেয়ে উপযুক্ত, কার্যকর এবং সমর্থ সৃষ্টিতে পরিণত হতে পারে, মানুষের বুদ্ধিই সে কথা বলে দেয়। এই সিদ্ধান্তও মহৎ সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের বিষয় কাব্যনাট্যের বিষয় হতে পারতো কী না, 'ক্যামেলিয়া' বা 'বাঁশি' কবিতা নিয়ে ছোটগল্প লেখা সম্ভব ছিল কী না, এসব প্রশ্ন চিন্তাশীল ও সতর্ক পাঠকের মনে নিশ্চয়ই উদিত হতে পারে—কৌতুকের ছলে হলেও। আমাদের ভাবতে ভাল লাগে রবীন্দ্রনাথকেও হয়তো এই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য, অল্প হলেও, ভাবতে হয়েছে।

সাহিত্যের তৃতীয় উপাদানকে আমরা বলতে পারি কল্পনা বা Imagination। যে ঘটনা মানুষ চোখের সামনে দেখে বা যে মানুষ তার চিত্তকে আলোড়িত করে সেই মানুষের সবটুকু তার পক্ষে দেখা সম্ভব নয়। একটি ঘটনার নেপথ্যে কী ঘটনা ছিল, অথবা কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার যোগসূত্র আসলে কোথায়—কিম্বা মানুষের যেটুকু দেখা যায় তার অন্তরালে না-দেখা মানুষের যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে—স্রষ্টাকে তা কল্পনায় পূর্ণ করে নিতে হয়। যাঁর কল্পনাশক্তি যত বলিষ্ঠ এবং সুস্থ, এ কাজে তিনি ততই সফল। Imagination ছাড়াও Fancy বা খেয়ালি কল্পনা বলে এক ধরনের তরল অনুমান-শক্তি আছে—যার মধ্যে গভীরতা এবং চিন্তার স্বচ্ছতা নেই। ফলে খেয়ালি কল্পনার আশ্রয় নিলে রচনা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে।

সাহিত্যের চতুর্থ উপাদান প্রয়োগকৌশল। মনে সৃষ্টির আবেগ এলো, তাকে সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী বলে রায় দিল বুদ্ধিবৃত্তি, তার মধ্যে যত অসম্পূর্ণতা ছিল, কল্পনাশক্তি তাকে ভরাট করেও নিল। এবার প্রশ্ন, মনের মধ্যে গোটা ব্যাপারটা যত কার্যকর ছিল, যত সুন্দর ছিল, প্রকাশের পরও কি তা ঠিক সেই রকমই আছে!

সাহিত্যের আন্তরিক উপলব্ধি এবং তার প্রকাশক্ষমতা—উভয়ের গুরুত্ব একইরকম কী না এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। অনেকে এরকম ধারণা পোষণ করেন

যে সাহিত্যের আবেগ ও তার প্রকাশ স্বতন্ত্রভাবে মনে আসে না, একই সঙ্গে উদিত হয়। অর্থাৎ মনে যখন কোন চিন্তা আসে তখন তা ভাষার সাজ পরেই আসে। চিন্তা ও তার প্রকাশভঙ্গি যে স্বতন্ত্র এবং প্রকাশভঙ্গির আলোচনা যে পৃথকভাবে হতে পারে, এই ব্যাপারটিই স্বীকার করেননি সজ্ঞাবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক বেনেদিত্তো ক্রোচে। আবার রবীন্দ্রনাথের মতো কবি বলেছেন, প্রকাশই সাহিত্য—সাহিত্যের অনুভূতি এবং সেই অনুভূতি প্রকাশের সামর্থ্যের মধ্যে তিনি প্রকাশ ক্ষমতাকেই অনেক বেশি মূল্য দেন।

এই দুই চরম মতবাদের কোন্‌টি সত্য তা জানার কোন প্রয়োজন আপাতত আমাদের নেই, আমরা শুধু সহজ বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝি যে, সাহিত্যের আবেগ যেখানে জাগে—প্রকাশের চিন্তা ঠিক সেখানে জাগে না। হৃদয়ে আলোড়ন জাগে অনেকেরই, কিন্তু সেই অনুভূতি কীভাবে প্রকাশ করলে সেই অনুভূতি সঠিকভাবে প্রকাশিত হবে, অথবা নিজে যে ধরনের অনুভূতি উপলব্ধি করেছেন, পাঠকের চিত্তেও সেই সমজাতীয় অনুভূতি কেমন করে জাগাতে পারবেন,—এই ভাবনাটা কিছুটা স্বতন্ত্র। সুতরাং প্রকাশক্ষমতা ও প্রয়োগকৌশল, ইংরেজীতে বলা যায় Composition and style, যে সাহিত্যের অন্যতম প্রধান উপাদান, একথা অস্বীকার করা মুশকিল।

তবে এ সবই গৌণ ব্যাপার—সাহিত্যসৃষ্টির প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিগত উপাদান মাত্র, সাহিত্যের মুখ্য উপাদান অবশ্যই মানবজীবন—বিভিন্ন প্রকরণের সাহিত্যে মানুষের জীবনই বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত ও ব্যাখ্যাত হয়। ম্যাথু আর্নল্ড সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন তা জীবনের সমালোচনা, আমরা মনে করি সাহিত্য-স্রষ্টা জীবনের ব্যাখ্যাতা—জীবনকে যিনি যেমন ভাবে দেখেছেন তিনি সেই ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক সময় স্রষ্টার জীবনের প্রক্ষেপ ঘটেছে বলে কোন সাহিত্যকে মহৎ সাহিত্যের স্বীকৃতি না দেবার প্রশ্ন ওঠে, সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা মনে করি ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকলেই তাকে মহৎ সাহিত্য বলা যায় না। ব্যক্তিগত জীবন অথবা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় লব্ধ জীবন সম্বন্ধে উপলব্ধিই সাহিত্যে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত ও প্রতিফলিত হয়। ব্যাখ্যাতা অনুসারে তার প্রকৃতি পালটে যায়, আবার সাহিত্যের প্রকরণভেদেও তার বৈচিত্র্য বেড়ে যায়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সাহিত্যের সম্ভাব্য সব রকম প্রকরণের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

দ্বিতীয় অধ্যায় সাহিত্য-প্রকরণের পরিচয়

এক ॥ সাহিত্য-প্রকরণ বলতে কী বোঝায়—কবিতা ও পদ্য—কবিতার প্রধান বিভাগের লেখচিত্র—গীতিকবিতা—বস্তুনিষ্ঠ কবিতা। দুই ॥ নাটকের সাধারণ পরিচয়—নাটকের প্রধান বিভাগের লেখচিত্র—পূর্ণাঙ্গ নাটক—নাটকের রসগত বিভাগ: ট্র্যাজেডি ও কমেডি এবং তাদের বাংলা নামকরণ—ট্র্যাজেডির মূল সংবেদন, উদাহরণ—নাটকের প্রয়োগগত বিভাগ—নাটকের বিষয়গত বিভাগ। তিন ॥ উপন্যাসের প্রধান বিভাগের লেখচিত্র—নভেল ও রোম্যান্স—প্রতি-উপন্যাস—উপন্যাসের প্রবৃত্তিগত উপবিভাগ—উপন্যাসের বিষয়গত উপবিভাগ—ছোটগল্প—ছোটগল্পের বিশেষ লক্ষণ।

॥ এক ॥

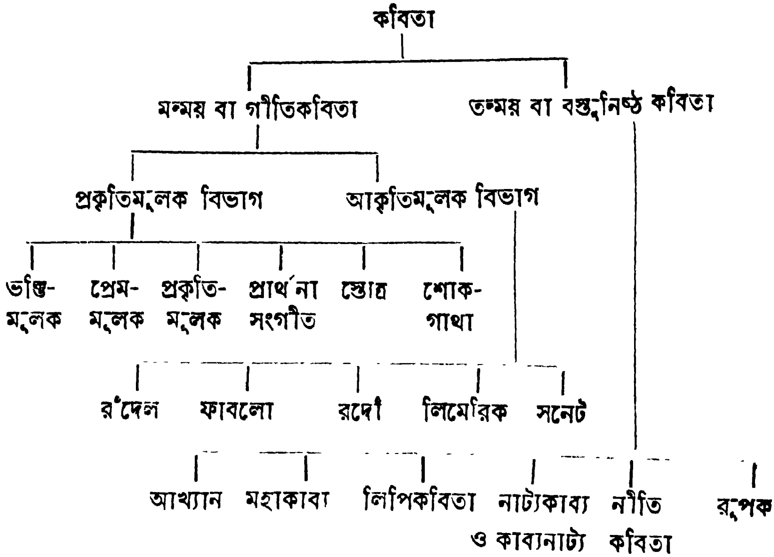
সাহিত্যের বিভিন্ন শ্রেণীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার আগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা জেনে রাখা দরকার সেটা হল, সাহিত্যের এই প্রকারভেদ কেবল আঙ্গিক ভেদ বা form-এর পার্থক্য নয়, অনেক সময় তার বিষয়েরও পার্থক্য। সাহিত্যের বিষয় অনুযায়ীই তার প্রকরণ নির্বাচন করেন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকগণ। এই সঙ্গেই সত্যি, যে প্রকরণ বা প্রকরণের অন্তর্গত রূপকৃতি নির্বাচন করা হয়েছে তার চাহিদা অনুযায়ী বিষয়েরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যে ঘটনার দৃশ্যত্ব বা অভিনেয়ত্ব আছে—অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে গেলে জীবনের যে রূপ কথা বা ক্রিয়াদ্বারা প্রকাশ হতে পারে, নাটক নামক সাহিত্য-প্রকরণের জন্য সেই ঘটনাই বেছে নেওয়া হয়, কেবল সংলাপের মাধ্যমে কিছু লিখলে—অর্থাৎ সেই আঙ্গিক মেনে নিলেই তা নাটক হয়ে ওঠে না। কবিতা সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য, কবিতার উপযোগী বিষয় হলে তবেই তা নিয়ে কবিতা রচনা করা সম্ভব, নাটকের উপযোগী বিষয় নিয়ে মহৎ কবিতা লেখা যায় না। এ কথা বলার উদ্দেশ্য, সাহিত্যে-প্রকরণগুলির বিষয় ও আঙ্গিকের নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ আছে, তারা কেবল আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যই নির্দেশ করে না।

যে-কোন সাহিত্যেই সবচেয়ে আগে যে সাহিত্য-প্রকরণ দেখা দিয়েছে তার নাম কবিতা, বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম নয়। বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন, অন্তত এখনও পর্যন্ত আমরা যা জানি, চর্যাপদ। এগুলি ধর্মবিষয়ক এক ধরনের গীতিকবিতা বা খণ্ড কবিতা। অবশ্য কবিতা বলতে আমরা আধুনিক

অর্থে ঠিক যে সাহিত্য-প্রকরণকে বুঝে থাকি, ঠিক সেই অর্থে তাদের কবিতা বলা যাকে কী না সন্দেহ, হয়তো গীতিকবিতাও বলা যাবে না। কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগে পদ্যে লেখা যাবতীয় রচনাকেই কবিতা হিসাবে গ্রহণ করা হতো।

কবিতা বলতে সঠিক ভাবে কী বোঝায়, পদ্যের সঙ্গে কবিতার পার্থক্য কিছু আছে কী না, এসব প্রশ্ন আমরা কবিতা নামক সাহিত্যশ্রেণীর পরিচয় দান কালে বিশদ করতে পারবো। আপাতত শুধু এইটুকুই বলা যেতে পারে পদ্য এবং গদ্য সাহিত্যপ্রকাশের দুটি মাধ্যম বা medium-মাত্র, কবিতা সাহিত্যের একটি বিশেষ শ্রেণী। সাহিত্যের যে-কোন শ্রেণী এই দুটি মাধ্যমের যে-কোন এক মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। আধুনিক যুগের আগে গদ্য মাধ্যমের বিশেষ ব্যবহার ছিল না বলে দেবদেবী-বিষয়ক দীর্ঘ আখ্যানও লেখা হতো পদ্যে, আবার গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের মতো গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের বিষয়ও পদ্যেই লিখতে হয়েছে। অবশ্য যদি কেবল আধুনিক অর্থে যাকে কবিতা বলে, সেই অর্থেই এই প্রকরণটিকে গ্রহণ করি তাহলে সুদীর্ঘ প্রাচীন ও মধ্যযুগের অনেক পদ্যকেই কবিতা নামের অযোগ্য বলতে হয়। সুতরাং প্রকরণের আলোচনাকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পদ্য মাধ্যমে লেখা যাবতীয় রচনাকেই আমরা স্থূল অর্থে কবিতা হিসাবে স্বীকার করে নেব। তবে গদ্য মাধ্যমেও যে কবিতা লেখা সম্ভব সে কথাও স্বীকার করে নেব এবং তার দ্বিধাহীন স্বীকৃতি জানাবো।

পদ্য মাধ্যমে লেখা রচনা মাত্রকেই কবিতা হিসাবে গ্রহণ করলে অবশ্য কবিতা নামক প্রকরণটির ব্যাপ্তি এতো বেড়ে যায় যে তার বিভিন্ন উপবিভাগ সম্বন্ধে আলোচনাই শক্ত হয়ে পড়ে। একেবারে প্রাথমিক বিভাগ করার জন্য আমরা তার আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়কেই আশ্রয় করতে পারি। কবিতার আকৃতি বা আয়তনগত বিভাগ করতে হলে বলতে হবে কবিতার প্রধান বিভাগ দুটি—খণ্ড কবিতা এবং দীর্ঘ কবিতা। প্রকৃতিগত বিভাগ করলে বলা উচিত কবিতার একেবারে প্রাথমিক বিভাগ দুটি হল, মন্ময় কবিতা বা Subjective poetry এবং তন্ময় কবিতা বা Objective poetry। সাহিত্যের প্রকরণ নির্দিষ্ট হয় তার আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়েরই বিচারে, তবু বেশি গুরুত্ব পাওয়া উচিত নিশ্চয়ই প্রকৃতির। সুতরাং কবিতার মোটামুটি বিভাগের রেখাচিত্র হতে পারে এইরকম ঃ—



এখন যদিও গীতিকবিতা বলতে বিশেষ এক ধরনের খণ্ড কবিতাই বোঝায়, কিন্তু একসময় গীতের উদ্দেশ্যে রচিত বিশেষ শ্রেণীর আত্মমগ্ন কবিতাই ছিল লিরিক বা গীতিকবিতা। সেই অর্থে গীতিকবিতাকে গ্রহণ করলে আমরা এর প্রকৃতি অনুযায়ী অনেকগুলি বিভাগ পাই। সেগুলির আলোচনা যথাস্থানে করা হবে, রেখাচিত্রে তার প্রধান বিভাগগুলির নামই কেবল উল্লেখ করা হল।

প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্বেও আঙ্গিকের বৈচিত্র্য এবং সুনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধতার জন্যই আমরা কয়েক ধরনের গীতিকবিতাকে চিনি। গীতিকবিতার আকৃতিগত বিভাগের মধ্যে সেগুলিকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করেছি। এদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত আঙ্গিক অবশ্যই সনেট, মোটামুটি ভাবে যে আঙ্গিক অনুসরণ করে বাংলায় চতুর্দশ-পদী কবিতা রচনা করা হয়েছে।

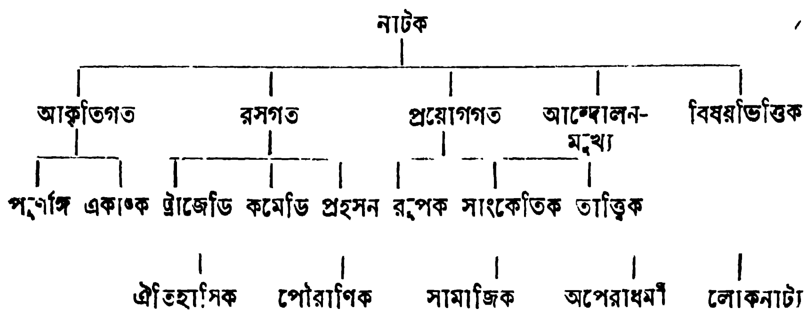
বস্তুনিষ্ঠ কবিতা বলতে আমরা বুঝিয়েছি, যেখানে বক্তার আত্মগত উচ্ছ্বাস বা নিজের হৃদয়-উন্মোচনের পরিবর্তে অন্য কোন বিষয়বস্তু বেছে নেওয়া হয় কবিতা রচনার জন্য। এর মধ্যে প্রধান অবশ্যই আখ্যানকাব্য বা গাথা—যার মধ্যে আমাদের মঙ্গলকাব্যগুলির মতো ভক্তি-গাথা আছে, 'ময়মনসিংহ' গীতিকার মতো লৌকিক গাথা আছে, আবার উনবিংশ শতকের স্বদেশ গাথাও যার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই শ্রেণীতে অন্য যেসব উপবিভাগ থাকতে পারে বা অন্য যেসব কাব্য এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, পৃথক ভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

॥ দুই ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক বিভাগে সাহিত্যের প্রধানভাগ ছিল দুটি—কবিতা এবং নাটক। নাটক নামক সাহিত্য-প্রকরণ বাংলা সাহিত্যে বিশেষ প্রাচীন না হলেও যাত্রা এবং পালাগান হিসাবে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে এর বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল। অবশ্য এখন যে নাটকের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার উদ্ভব ঘটেছে ইংরেজি theatre-এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে।

সংস্কৃত সাহিত্যে এবং ইউরোপীয় সাহিত্যে নাটক এক সুপ্রাচীন সাহিত্য-শ্রেণী। সংস্কৃতে একে বলা হয়েছে দৃশ্যকাব্য এবং পঞ্চম বেদ। প্রাচীন কালেই ভরতমুনি এর লক্ষণ নির্ণয় করে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রীক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পোয়েটিক্স্'-এ সাহিত্যের যে আলোচনা করেছেন তাতে নাটকের আলোচনাই বেশি এবং গ্রীক সাহিত্যের উজ্জ্বল নাটকগুলি তিনি তাঁর সমালোচনার জন্য পেয়েছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যেও নাট্যকলা একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকার উইলিয়ম শেক্সপীয়র সর্বকালের সেরা নাট্যকার হিসাবে সম্মান পেয়ে থাকেন।

প্রকরণ হিসাবে নাটকের অনেকগুলি বিভাগ মেনে নেওয়া হয়েছে। স্থূলভাবে বলতে গেলে, পাঁচটি প্রধান দিক থেকে নাটকের শ্রেণীবিভাগ করা সম্ভব। সেগুলি এইভাবে দেখানো যেতে পারে—



এই রেখাচিত্র থেকে বোঝা যাবে বাংলা নাটকের আকৃতিগত বিভাগ আছে দুটি—পূর্ণাঙ্গ এবং একাঙ্ক। পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে আমরা নাটকের প্রথাগত পাঁচটি অঙ্কবিভাগ বুঝে থাকি, অবশ্য প্রতিটি অঙ্কে সম বা অসম সংখ্যার দৃশ্য থাকতে পারে এবং এই সংখ্যার কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। নাট্য-আন্দোলন এবং নাট্য-বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরে অবশ্য পাঁচ অঙ্কের কমেও পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখা হয়েছে—নবনাট্য আন্দোলনের প্রতিভূস্বরূপ 'নবান্ন' নাটকটিই এই প্রথাগত পঞ্চাঙ্ক বিভাগ মানে নি। একাঙ্ক নাটকের আবির্ভাব আরো অনেক পরে। এই নাটকের অঙ্ক তো একটি বটেই, প্রায় প্রথাগত ভাবে একটি দৃশ্যেই নাটকটি সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

নাটকের রসগত বিচারে প্রধান ভাগ দুটি—ট্র্যাজেডি এবং কমেডি, যদিও এর সঙ্গে প্রহসন বা farce-এর লক্ষণও অ্যারিস্টটল আলোচনা করেছেন। ট্র্যাজেডির স্বরূপ এবং অন্যান্য লক্ষণ নির্ধারণেরই অ্যারিস্টটল সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করেছেন এবং আমরা সেই আলোচনার ঐশ্বর্যে এখনও বৈভবশালী হয়ে আছি। ট্র্যাজেডি ও শেক্‌স্‌পীয়রের ট্র্যাজেডি নিয়ে যতো গ্রন্থ ইংরেজি সাহিত্যে লেখা হয়েছে তাদের সংখ্যাও আমাদের রীতিমত রোমাঞ্চিত করতে পারে। তুলনায় কমেডির আলোচনা কিছু কম হলেও তাকে মোটেই উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত নাটকের আলোচনা বলতেই—অন্তত তার শ্রেণীবিচারে, ট্র্যাজেডি ও কমেডির আলোচনাই সবচেয়ে আগে মনে আসে।

ট্র্যাজেডি এবং কমেডি পূর্ণতই রসগত বিভাগ, এবং সেই রসগত প্রকৃতি স্মরণ রেখেই ট্র্যাজেডির বাংলা নামকরণ করা হয়েছে বিয়োগান্ত বা বিষাদান্ত নাটক—যদিও কমেডির সুনির্দিষ্ট কোন বাংলা নামান্তর এখনও চোখে পড়ে না। সাধারণ ভাবে তাকে বলা যায় মিলনান্ত নাটক, ট্র্যাজেডির সঙ্গে এর রসগত পার্থক্যের কথা স্মরণে রেখে। পোয়েটিক্‌সের প্রথম সার্থক বঙ্গানুবাদে একে বলা হয়েছিল 'হাস্যোদ্দীপক' কিন্তু 'প্রহসন' নামটিও মোটামুটিভাবে প্রচলিত। নাটকের অন্তে বিষাদ অথবা মিলনের আনন্দ—এই দুইয়ের মধ্যে কী আছে, প্রধানত তার ওপরই নির্ভর করে ট্র্যাজেডি ও কমেডির পার্থক্য। কিন্তু এ পার্থক্য নিতান্তই স্থূল। সাহিত্যের অনেক বিয়োগব্যথার মধ্যেও লুকিয়ে থাকে বিধাতার প্রসন্ন আশীর্বাদ, যেমনটি ঘটেছিল 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নারীচরিত্র ভ্রমরের ক্ষেত্রে—অনুতপ্ত স্বামীকে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে শয্যাপার্শ্বে দেখে অকৃত্রিম আনন্দেই সে মৃত্যু বরণ করেছে। তুলনায় 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের নায়িকা সূর্যমুখীর জীবনবৃত্তান্তকে মিলনান্তক বলতেই হবে, স্বামী নগেন্দ্রনাথকে সে ফিরে পেয়েছে রাহুগ্রাস কেটে যাবার পর। তবু তার পরবর্তী দাম্পত্য জীবন কতটা সুখের হবে বলা কিন্তু সহজ নয়। দামোদর মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসের প্রলম্বিত পর্ব কল্পনা করে কোন উপন্যাস রচনা করেননি, তবে আমরা যারা অনুভূতি-নির্ভর সাহিত্যপাঠে আগ্রহী তারা বুঝতে পারি নগেন্দ্রনাথের মিলন এবং তার জন্য একটি নিরপরাধা কিশোরীর করুণ আত্মহনন দুজনের কেউ ভুলতে পারবে না—তাদের সুখী দাম্পত্যজীবনের মাঝে মধ্যবর্তিনী এই কুন্দনন্দিনীর স্মৃতি ভবিষ্যৎ জীবন সুখের হতে দেবে না।

অ্যারিস্টটল অবশ্য ঠিক সেভাবে বিচার করেননি, করেছেন একটু ভিন্ন দিক থেকে। তিনি বলেছেন, ট্র্যাজেডিতে আমরা দেখতে চাই সেইসব চরিত্রকে যাঁরা আমাদের চেয়ে বেশ খানিকটা মহৎ ও উচ্চস্তরের মানুষ। কমেডিতে আমরা দেখতে চাই সেই ধরনের মানুষকে যাঁরা আমাদের চেয়ে কিছুটা হীন—অবশ্য চরিত্রের গুণাবলীর দিক থেকে নয়, চরিত্রের কোন একটা বৈশিষ্ট্যের অতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে,

যা অন্যের চোখে তাঁদের হাস্যকর করে তোলে। তবে সেসব বিচার আপাতত তোলা থাক।

নাটকের উপস্থাপন বা প্রয়োগের দিক থেকে চিন্তা করলে তার খুব স্পষ্ট তিনটি বিভাগ আমরা দেখতে পাই—রূপক, সাংকেতিক এবং তত্ত্বনাটক। এই বিভাগগুলিকে বিভিন্ন নাট্য-আন্দোলনে উদ্ভূত বিভাগ হিসাবেও গ্রহণ করা চলে, তবে আন্দোলনের ফলে নাট্যধারার যে পরিবর্তন ঘটে তার মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় ধরনের পরিবর্তনই থাকে এবং সেসব পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে যান্ত্রিকও হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে প্রয়োগগত যে তিনটি বিভাগের কথা বলা হল এরা সাধারণভাবে নাট্যকারের মানসিকতাই প্রতিফলিত করে। অনেকে মনে করেন নাটক মানেই একটি বিশেষ সমস্যা এবং বিভিন্ন দিক থেকে তার পর্যালোচনা। বিশ্রুত নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ এই মতের পরিপোষক ছিলেন, তিনি মনে করতেন নাটক মানেই 'discussion, discussion and discussion only'। এ থেকেই মনে হতে পারে, একটি বিশেষ তত্ত্ব না থাকলে নাটক নির্জীব হয়ে পড়ে।

পক্ষান্তরে, মহৎ নাটক মানেই সাংকেতিক নাটক—এই ধারণাও পোষণ করেন কিছু সমালোচক। তাঁদের মতে, সংকেতবাদী সংলাপই শ্রেষ্ঠ সংলাপ এবং সাহিত্যের অন্যসব বিভাগের মতোই বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যাওয়াই নাট্যসংলাপের উৎকর্ষের চরম সার্থকতা। প্রায় এই একই রকম ভাবে রূপক নাটকের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে থাকেন, এমন সমালোচকও নিতান্ত দুর্লভ নন। আমরা মুখ্যত এই তিনটি বিভাগ এবং নাট্য-আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত প্রধান কয়েকটি নাট্যধারার আলোচনা করবো যথাস্থানে।

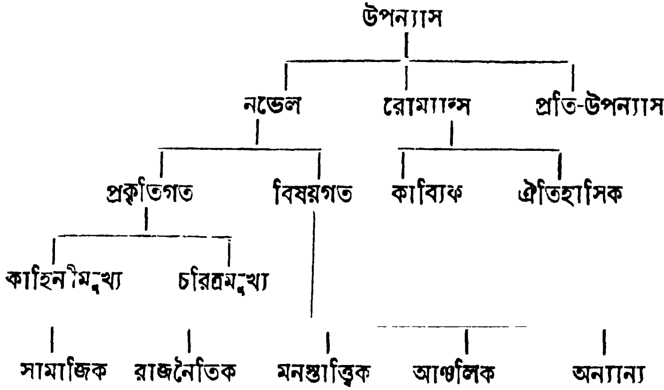
নাটকের আর একটি প্রথাগত বিভাগও আছে, সেটি বিষয়ভিত্তিক। অর্থাৎ নাটকের বিষয় যে উৎস থেকে গ্রহণ করা হয়, নাটকটিকে সেই জাতীয় নাটক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। যেমন, নাটকের বিষয় যদি হয় সমাজসমস্যামূলক, তাকে আখ্যা দেওয়া হয় সামাজিক নাটক। নাটকের বিষয়বস্তু যদি আমরা সংগ্রহ করি ইতিহাস এবং পুরাণ থেকে, তাহলে তাদের বলা হবে যথাক্রমে ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটক। তেমনি লোকসমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনী ও লোকগাথা অবলম্বন করে রচিত নাটককে বলা যায় লোকনাট্য। অবশ্য শুধুমাত্র এই উৎসের কথা স্মরণ রাখলেই হয় না, এইরকম বিষয়ভিত্তিক নাটকেরও প্রকৃতিগত কিছু লক্ষণ থাকে এবং সেই সব লক্ষণ না পাওয়া গেলে কেবল বিষয়ের প্রকৃতি দেখেই তাদের ওই জাতীয় নাটক বলতে অনেকে রাজি হবেন না।

॥ তিন ॥

উপন্যাস সাহিত্য-সংসারের আধুনিক সদস্য। মানুষ সম্পর্কে মানুষের উৎসাহ ও শ্রদ্ধা এবং আমাদের যথার্থ বাস্তবতার বোধ না জাগা পর্যন্ত উপন্যাসের

আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। বাংলা সাহিত্যে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই উপন্যাসের উদ্ভব ঘটে এবং উপন্যাসের সার্থক পথিকৃৎ হিসাবে এখনও পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রই স্বীকৃতি লাভ করে থাকেন।

উপন্যাসের বিভাগ-বিভাজন কীভাবে করা হয়, এই রেখাচিত্র থেকে তার মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে—



বাস্তবতাই উপন্যাসের, এবং বাংলা উপন্যাসের প্রথম শর্ত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লেখক যখন তাঁর চোখে দেখা বাস্তব, অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনা ও চরিত্র নির্ভর করে উপন্যাস রচনা করেন তখন আমরা তাকে বলি নভেল। খুব সাধারণভাবে উপন্যাস বলতেই বোঝায় নভেল। এর পাশাপাশি আছে উপন্যাসের আর একটি ধারা, প্রায় নভেলের জন্মলগ্ন থেকেই, তার নাম রোম্যান্স। রোম্যান্সে লেখক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনার ওপর নির্ভর করেন না, তাঁর কাহিনী নির্মাণের উৎস হয় তাঁর কল্পনা অথবা ইতিহাসের ঘটে যাওয়া কোন অধ্যায়। তবে মনে রাখতে হবে এই কথা যে, কল্পনাই হোক বা ইতিহাসের কোন ঘটনাই উপজীব্য হোক, তাতে বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হলে তাকে আমরা রোম্যান্স বলতে পারবো না, কারণ রোম্যান্স উপন্যাসেরই একটি বিভাগ। নভেলে লেখক যখন নির্বাচন করেন ঘটেছে এমন কোন (possible) ঘটনা, রোম্যান্সে তখন লেখক জোর দেন বর্ণিতব্য ঘটনার সম্ভাব্যতার (probability) ওপর। অবশ্য রচনা-প্রক্রিয়াতেও নভেল ও রোম্যান্সের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে। রোম্যান্সের উপকরণ যখন কল্পনা থেকে সংগ্রহ করা হয় তখন আমরা তাকে বলি কাব্যিক রোম্যান্স, যখন সেই উপাদান সংগৃহীত হয় ইতিহাস থেকে তখন তাকে আমরা আখ্যা দিই ঐতিহাসিক রোম্যান্স।

উপন্যাসের আর একটি বিভাগ করা সম্ভব, যাকে বলা যায় প্রতি-উপন্যাস। এই ধরনের উপন্যাসে আমরা ভবিষ্যৎ মানুষের একটা চিত্র দেখাতে চাই, অথবা

উপন্যাসের আধারে কোন এক অনাগত ও অনিবার্য পরিস্থিতিকে দেখাতে চাই। এই ধরনের কাহিনী-পরিকল্পনায় বিজ্ঞানের ভূমি থাকলে তাকে আমরা বলি কল্পবিজ্ঞান, যেমন অলডাস হাক্সলির 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' বা ফ্রেড হয়েলের 'দা ফিফথ্ প্ল্যানেট'। বিজ্ঞানের ভূমি না থেকে কেবল বিজ্ঞানের পরিমণ্ডল ও অনুষঙ্গ থাকলে তাকে বলতে পারি ফ্যাণ্টাসি, যেমন সত্যজিৎ রায়ের শঙ্কুবিষয়ক বেশ কিছু কাহনী। এছাড়া বিশেষ উদ্দেশ্য ও জীবন-সমালোচনা নিয়ে খেয়ালী কল্পনামূলক কিছু উপন্যাসও আমরা দেখেছি—তাদেরও এই তৃতীয় বিভাগেই আমাদের স্থান দিতে হবে।

নভেলের কয়েকটি উপবিভাগ আছে এবং সেগুলি গুরুত্বপূর্ণ। একেবারে প্রাথমিক ভাবে তাকে দুভাগে ভাগ করা যায়—প্রকৃতিগত ও বিষয়গত বিভাগ। প্রকৃতিগত বিচারে নভেলকে দুটি শ্রেণীতে ফেলা যায়—কাহিনীমুখ্য উপন্যাস এবং চরিত্রমুখ্য উপন্যাস। উপন্যাসের উদ্ভবের সময় প্রায় সব দেশেই থাকে কাহিনীমুখ্য উপন্যাস, কাহিনীর আকর্ষণেই পাঠক তা পড়তে আগ্রহী হয়। পাঠক প্রাপ্ত-মনস্ক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্র এবং তাদের আচরণের গভীর মনস্তত্ত্ব পাঠককে উৎসাহিত করে। ফলে কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রসৃষ্টিই তখন প্রাধান্য পায়। ইংরেজি সাহিত্যে 'প্লটের মৃত্যু' নামক যেরকম সাহিত্যিক আন্দোলন উত্থিত হয়েছিল আমাদের দেশে তা দেখা যায়নি বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস থেকেই যে কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রের প্রাধান্য সূচিত হল, এ কথা মনে প্রায় দ্বিধা না রেখেই বলা যায়।

উপন্যাসের বিষয়গত বিভাগ গড়ে উঠেছে তার অবলম্বিত বিষয়ের প্রকৃতি দিয়ে, তাই এর সঙ্গেও যে উপন্যাসের প্রকৃতির যোগ নেই এমন কথা কখনোই বলা যাবে না। আসলে বিষয় এবং তার উপস্থাপনরীতি এত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত যে একটিকে অপরটির নিরপেক্ষ বলা সম্ভব নয়—এই ধরনের বিভাগ আসলে আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য করা। উপন্যাসের ক্ষেত্র ও সমস্যা যখন সামাজিক তখন তাকে আমরা বলি সামাজিক, যখন তা রাজনৈতিক বা আঞ্চলিক তখন তাদের আমরা সেই শ্রেণীতেই বিন্যস্ত করি। এদের প্রকৃতিগত অনেক বৈশিষ্ট্যও অবশ্য বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখবার মত। বিস্তারিত আলোচনার সময় আমাদের সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

ছোটগল্পকে বলা হয়েছে 'উনবিংশ শতকের বিস্ময়।' অথচ সাহিত্যসংসারের এই কনিষ্ঠতম সদস্যই এখন সবচেয়ে প্রাণবান্। জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ এই সাহিত্য-প্রকরণ বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্যে পাঠকের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে বলা যায়। গতিশীল ও কর্মচঞ্চল জীবনে দীর্ঘরচনা পাঠ এবং ধ্রুপদীরীতির সাহিত্যের সৌন্দর্য উপভোগের অবকাশ অনেক কমে এসেছে। ছোটগল্প তার সংহত আয়তনে আমাদের 'বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ' এনে দেয়—জীবনের বহুবিচিত্র

নাটক, সমগ্র জীবনবৃত্তের উপন্যাস এবং ধ্রুপদী নাটক যেন বলিষ্ঠ দু-একটি রেখায় সজীব করে তুলে ধরে আমাদের সামনে। ফলে যুগোপযোগী এই সাহিত্য-প্রকরণ আমাদের সবচেয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের কোন সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপই যখন এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে গড়ে ওঠেনি তখন ছোটগল্পের মত নবীন আগন্তুক তার শিল্পরূপ নির্দিষ্ট করে নিতে পারবে, এটা আশা করা যায় না। তাছাড়া জীবনের বিচিত্র দিক তা লিপিবদ্ধ করে বলেই তার বহিরঙ্গ রূপ নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রমথ চৌধুরী অবশ্য বলেছেন, নামেই বোঝা যায়, একে আগে ছোট হতে হবে এবং তারপর গল্প--কিন্তু এভাবে তাকে কখনোই বিচার করা যায় না। কারণ ছোটগল্প শব্দটি সমগ্রতই একটি সাহিত্য-প্রকরণকে বোঝায়, ছোট যে গল্প—এইভাবে কর্মধারয় সমাস হিসাবে শব্দটি গঠিত হয়নি। বস্তুত ছোটগল্প চলমান জীবনের সংহত রূপ বলেই তাকে ছোট হতে হয়, কিন্তু তা কতটা ছোট হবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, থাকতেও পারে না। রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'-ও যেমন ছোটগল্প হিসাবে স্বীকৃত, আধুনিক কালে বনফুলের অতিক্ষুদ্র ছোটগল্পগুলিও সার্থক ছোটগল্প হিসাবেই স্বীকৃতি লাভ করেছে, সুতরাং গল্পের আয়তন এই সাহিত্যশ্রেণীর স্বভাববৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

সাহিত্যপ্রকরণ হিসাবে ছোটগল্প নবাগত হলেও এ নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, এবং বাংলা সাহিত্যে এর পরিমাণ খুব বেশি না হলেও, একেবারে হয়নি এমন বলা যাবে না। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোটগল্প' এ বিষয়ে এখনও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ছোটগল্পের বিভাগ-বিভাজন সমালোচকগণ করেছেন অনেকভাবেই, আপাতত সেই বিস্তারে যাবার দরকার নেই। ছোটগল্পের উদ্দেশ্যের একমুখিনতা বা singleness of purpose-কে প্রায় সব সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং সেই একমুখিনতার প্রকৃতি অনুসারে ছোটগল্পের প্রধান ভাগ তিনটি—ঘটনামুখ্য ছোটগল্প (story of incident), চরিত্রমুখ্য ছোটগল্প (story of character) এবং প্রতীতিমুখ্য ছোটগল্প (story of impression)। অবশ্য এই সঙ্গে এ কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে সাধারণভাবে প্রতীতি বা impression-ই ছোটগল্পের মূল কথা। ছোটগল্প পাঠ করে যে প্রতীতি মনে জাগে তার ওপরই নির্ভর করে ছোটগল্পটির শিল্পসাফল্য।

তৃতীয় অধ্যায় | মন্ময় কবিতা

ক. কবিতা ও অকবিতার প্রভেদ—কবিতার কিছু বিখ্যাত সংজ্ঞা ও তার বিচার—কবিতায় কল্পনার ভূমিকা—কবিতায় অনুভূতি ও প্রকাশ-কৌশলের তুলনামূলক গুরুত্ব—কবিতা ও সৌন্দর্যবোধ—সৌন্দর্য বস্তুগত অথবা আত্মগত—কবিতার কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা। খ. কবিতা ও পদ্য—গদ্য ও পদ্য মাধ্যম—কবিতার সঙ্গে ছন্দের অপরিহার্য কোন সম্বন্ধ আছে কিনা—এ বিষয়ে কিছু পরস্পরবিরোধী মত—কবিতা ও ছন্দস্পন্দ। গ. গীতিকবিতার পরিচয়—গীতিকবিতার সংজ্ঞা সন্ধান—গীতিকবিতার প্রধান কিছু লক্ষণ। ঘ. গীতিকবিতার উৎস—প্রাচীন গ্রীক ও বৈদিক সাহিত্য—সংস্কৃত ও অপভ্রংশে গীতিকবিতার সন্ধান—আধুনিককালের আগে খাঁটি গীতিকবিতা রচনা সম্ভব ছিল কিনা—লোকসাহিত্যে গীতিকবিতা। ঙ. আধুনিক ও প্রাচীন গীতিকবিতার সাধারণ পার্থক্য—বৈষ্ণবপদাবলীর আত্মমগ্নতা গীতিকবিতার অনুরূপ কিনা—সাম্প্রতিক গীতিকবিতা—একটি প্রাচীন ও একটি আধুনিক গীতিকবিতার তুলনা। চ. ভক্তিমূলক কবিতা—এদের আদৌ কবিতা বলা যায় কিনা। ছ. প্রেমমূলক কবিতা। জ. প্রকৃতিমূলক কবিতার বৈশিষ্ট্য—প্রাচীন প্রকৃতিমূলক কবিতা—আধুনিককালে এর সূচনা। ঝ. প্রার্থনাসংগীতের সঠিক লক্ষণ—ভারতীয় প্রার্থনাসংগীত—পাশ্চাত্ত্য প্রার্থনাসংগীত। ঞ. ওড বা স্তুতি কবিতার উৎস—ওডের সংজ্ঞা—ওডের অঙ্গবিভাগ, প্রাচীন ও আধুনিক মত—বাংলায় স্তুতি কবিতা। ট. এলিজির বৈশিষ্ট্য—এলিজির উদ্ভব—প্রাচীন গ্রীক কবিতায় এলিজি—ইংরেজি এলিজি—বাংলা লোককবিতা। ঠ. সনেটের সাধারণ আলোচনা—সনেটের উদ্ভব—পেত্রার্কীয় সনেটের অঙ্গবিভাগ—ইংরেজী সনেটের অঙ্গবিভাগ—সনেটের ভাবগত বৈশিষ্ট্য—সনেটের পাঁচটি বিশিষ্ট লক্ষণ—পাশ্চাত্ত্য বিশিষ্ট সনেট-রচয়িতা—বাংলায় সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। ড. মধুসূদন দত্তের একটি সনেটের বিশ্লেষণ। ঢ. কবিতার আঙ্গিকমুখ্য বিভাগ—ট্রায়োলেট—লিমেরিক—লিপি-কবিতা—বাংলা লিপি-কবিতা।

ক. কবিতা কাকে বলে ?

কবিতা কাকে বলে, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে কবিতা কাকে বলেনা সে কথা বলা অনেক সহজ। আদি গ্রীক মহাকবি হোমার কবিতা লেখার জন্য মিউজ-এর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন, প্লেটো বলেছেন, এক 'স্বর্গীয় উন্মাদনা' এলেই কবিতা রচনা করা সম্ভব, আবার আমাদের আদিকবি বাল্মীকি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রথম শ্লোক 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ' ইত্যাদি উচ্চারণ করার পরমুহূর্তেই বিস্ময়ে বলে উঠেছেন 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া।' অর্থাৎ আমার মুখ থেকে এই যে অপূর্ব বস্তু প্রকাশিত হল, সেটি কী।

তার মানে, আজ পর্যন্ত কবিতা ব্যাপারটা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিতে না পারলেও মানুষ কবিতাসৃষ্টির সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত তার উত্তর সন্ধান করছে। কবিতার আত্মা কী, তার সৃষ্টিরহস্য কী, এ সব প্রশ্নের

উত্তর নিয়ে সংস্কৃত অলংকারিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ ছিল, পাশ্চাত্য সমালোচকদের মধ্যেও এ নিয়ে মতান্তরের অন্ত নেই। কিন্তু তা সত্বেও কবিতা এবং অকবিতা সম্বন্ধে তাঁদের কোন সংশয় ছিলনা, এই দুই জিনিসের পার্থক্য তাঁরা বুঝতে পারতেন। সংস্কৃত আলংকারিগণ কবিতা ও চিত্রকাব্যের (অর্থাৎ মেকি কবিতার) তফাৎ করতে পারতেন এবং সুখের কথা, সে বোধ আমাদেরও আছে, এখনও। যেমন আমরা জানি, একে বলে কবিতা ঃ

'ভিজেছে চোখের পাতা বৃষ্টি কিংবা কুয়াশার হিমে
এখন পড়ে না মনে, শুধু ঝাপসা দেখি গেরস্থালি
কোনদিন বনজ্যোৎস্না জ্বলেছিল বুকে,
কোনদিন উদাসী হাওয়ায়
অন্যমনে বেজেছে নূপুর।
সমস্ত দুপুর জুড়ে একা ছিল চিলেকোটা,
আজ সেই চঞ্চল কিশোরী
খুলেছে ডাকের সাজ, অন্ধকারে দিগন্ত ছুঁয়েছে।'
[কিশোরী / আনন্দ বাগচী]

আধুনিক কালের কবি আনন্দ বাগচীর তুলনায় ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিখ্যাতি কিছু কম ছিল না, তবু তাঁর তপ্‌সে মাছ বিষয়ক এই কবিতাটিকে 'কবিতা' বলে মেনে নিতে বোধহয় আমাদের অনেকেই এখন রাজি হবেন না। এর অংশবিশেষ উদ্ধার করি ঃ

'কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁফদাড়ি তপস্বীর প্রায়॥…
মানুষের দৃশ্য নও বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা ননীর শরীরে॥…
প্রাণে নাহি দেরী সয় কাঁটা আঁস বাচা।
ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাঁচা॥…
যথা ইচ্ছা তথা থাক মনোহর মীন।
পেট ভরে খেতে যেন পাই একদিন॥'

ঠিক একই ভাবে আমরা বুঝতে পারি ইংরেজি ভাষায় লেখা একটি খাঁটি কবিতাকেও, যদি সেটি সত্যিই কবিতা হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে কবিতা হিসাবে মোটামুটিভাবে চলে গেলেও অ-কবিতাকে সহজে আমাদের মন কবিতা হিসাবে স্বীকার করতে চায় না। দুটি ছোট দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা বোঝা আরো সহজ হবে।

বড় কবি লিখলেই যে সব সময় তা কবিতা হয়ে ওঠে না, তা বুঝবার জন্য আমরা স্মরণ করতে পারি রোম্যাণ্টিক যুগের অবিসংবাদিত কবি শেলির এই কটি ছত্র—

"Alas! I have nor hope nor health,
Nor peace within nor calm around,
Nor that content, surpassing wealth,
The sage in meditation found,
And walk'd with inward glory crown'd—
Nor fame, nor power, nor love, nor leisure ;"

গদ্যগন্ধী এই ছত্রকটির পাশে স্মরণ করা যাক আপেক্ষাকৃত অপরিচিত, মধ্যযুগীয় কবি অ্যানড্রু মারভেলকে—

"But at my back I alwaies hear
Times winged charriot hurrying near :
And younder all before us lye
Desarts of vast Eternity."

সময়ের উড়ন্ত রথের এই কল্পনা এক মুহূর্তে আমাদের কবিতাটির জাত চিনিয়ে দেয়।

কাকে বলে কবিতা তা জানার জন্য কবিতার বিখ্যাত সংজ্ঞাগুলির দিকে একবার চোখ বোলান যাক। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তাকে প্রায় কবিতার সংজ্ঞা হিসাবেই অভিহিত করা যায়, তিনি বলেছেন—"বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।" বোঝা যায়, একেবারে অস্পষ্ট ভাববাদী সংজ্ঞা রবীন্দ্রনাথ দেননি। এ কথা বলেছেন বটে যে, হৃদয়ে অনুভূতি দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তার চিত্রধর্মী ও সংগীতধর্মী প্রকাশই সাহিত্য—তবে সেই সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে বাস্তব অভিজ্ঞতার জগৎ থেকেই তার মৌলিক উপাদান সংগৃহীত হয়।

কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার কিন্তু একেবারে ভাববাদী ব্যাখ্যাই দিয়েছেন এবং সেই সংজ্ঞা থেকে কবিতার প্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা খুব সফল না হতেও পারে। তিনি বলেছেন, "কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে আত্মার রতিসুখ-সম্ভোগকালে রসমূর্ছিত মানবের ভাববিধুর গদগদ ভাবই কবিতা।"

ইংরেজিতে যেসব বিখ্যাত সংজ্ঞার সঙ্গে আমরা পরিচিত তারা মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন কোন সংজ্ঞায় জোর দেওয়া হয়েছে কবিতার অপরূপ বাণীভঙ্গির ওপর, কোন সংজ্ঞা জোর দিয়েছে আবেগ ও অনুভূতির ওপর

এবং তৃতীয় ধরনের সংজ্ঞায় অনুভূতি, প্রকাশভঙ্গি এমনকি কবিতার উৎস ও কর্তব্য সম্বন্ধেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। প্রথম ধরণের সংজ্ঞার কথা স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়বে কোলরিজের সেই বিখ্যাত উক্তি—"Prose is words in their best order, Poetry is the best words in the best order."

সমালোচক ওয়াট্স্ ডান্টন এই বাণীভঙ্গির ওপর জোর দিলেও অনুভূতির উল্লেখ করেছেন—"Absolute poetry is the concrete and artistic expression of the human mind in emotional and rhythmic language."

প্রকাশসৌন্দর্য ছাড়াও কবিতার যে কিছু কাজ আছে, ম্যাথু আর্নল্ড তা বলেছেন, তবে তিনি এও বলেছেন—"Poetry is simply the most delightful and perfect form of utterance that human words can reach."

কবি-গল্পকার এড্গার অ্যালান পো-এর অভিমতও সেইরকম—"It is the rhythmic creation of beauty."

অনুভূতি এবং কল্পনার ওপর যাঁরা জোর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কবি শেলির কথাই আগে মনে পড়বে। কবিতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেলি বলেছেন, "...in a general sense (it) may be defined as the expression of the imagination."

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের বিখ্যাত সংজ্ঞাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings."

মেকলের ব্যাখ্যাটি আরও বিশদ, কিন্তু মোটামুটি এই ধরনের কথাই বলতে চেয়েছেন তিনি। তিনি বলেছেন, "By poetry we mean the art of employing words in such a manner as to produce an illusion on the imagination, the art of doing by means of words what the painter does by means of colours."

অবশ্য শুধু কল্পনা নয়, কবিতার কাজ যে সত্যের বাণীও প্রচার করা এবং জীবনের সমালোচনা ও ব্যাখ্যাও যে কবিতারই কাজ—এসব কথাও বলেছেন মনস্বী সমালোচকগণ। জনসন কবিতাকে বলেছেন, 'the art of uniting pleasure with truth by calling imagination to the help of reason."

ম্যাথু আর্নল্ডকে এই প্রসঙ্গে পুনর্বার স্মরণ করি। তিনি বলেছেন, "Poetry is at bottom criticism of life under the conditions fixed for such a criticism by the laws of poetic truth and poetic beauty."

সমস্যা এই যে, সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করে আমরা কবিতার স্বরূপে উপনীত হতে পারি না, বরং কবি-সমালোচকদের আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও আমাদের সংশয় ও বিভ্রান্তি ক্রমেই বেড়ে যায়। এটুকু আমরা বুঝতে পারি, বাহ্যজগৎ এবং

মানুষকে বাদ দিয়ে কবিতার জগৎ নয়, তবে কবিদের রচনায় কল্পনার একটি বড় ভূমিকা আছে। কল্পনা বলতে অবশ্যই আমরা অলীক কল্পনা বুঝি না, বুঝি সেই creative imagination যাকে ইংরেজ সমালোচকগণ অত্যন্ত গুরুত্ব দান করেছেন। কবিতা সৃষ্টির পক্ষে এই ধরনের কল্পনা একেবারে অনিবার্য, কারণ—

"The light that never was on sea or land
The consecration and the Poet's dream"

প্রতিফলিত করার জন্য সৃজনী কল্পনার সাহায্য দরকার হবেই। 'স্মর-গরল' কাব্যে মোহিতলাল মজুমদার একেই বলেছেন—

"শব্দ-বন্ধে ছন্দ-স্পন্দে, রূপ দেয় চঞ্চল তরলে,
ছায়ারে দানিছে কায়া শূন্য হতে টানিয়া সবলে,
সুসম্পূর্ণ করি তারে সুডৌল সুন্দর অবয়বে..."

কবি কোলরিজ একেই বলতে চেয়েছেন Esemplastic Imagination এবং এটি এমনই এক কবিপ্রতিভা যা 'tends to objectize itself and to know itself in the object'।

আসলে, কবিতার প্রধান প্রকাশসৌন্দর্য যে চিত্রকল্প এবং উপমা, তার অনেকটাই নির্ভর করে কল্পনার সুস্থতা ও বলিষ্ঠতার ওপর। এ কথার তাৎপর্য আমরা বুঝতে পারি যখন মনে করি মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের বর্ষাভিসারের পদ—

"তঁহি অতি দূরতর বাদর-দোল।
বারি কি বারই নীল-নিচোল॥"

অথবা, কোলরিজ যখন লেখেন—

'silent icicles
Quietly shining to the quiet moon."

কিংবা যখন রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য সেই পংক্তিগুলি আমাদের মনে পড়ে—

"ওগো, প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে কবরী—
এলায়ে ?
ওগো, নবঘন-নীলবাস খানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি ?
তড়িৎ-শিখার চকিত আলোকে
ওগো, কে ফিরিছে খেলায়ে ?"

সংস্কৃত আলঙ্কারিগণ এই কবিকল্পনার ব্যাপারটিকে অবহেলা করেছেন এবং কল্পনা বা Imagination-এর কথা কখনও বলেননি, এরকম অভিযোগ করেছেন

ড. সুশীল কুমার দে তাঁর Sanskrit Poetics গ্রন্থে। ঠিক 'কল্পনা' শব্দটির প্রয়োগ না থাকলেও, 'কবি-কৌশল', 'কবি-ব্যাপার' প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত আলংকারিকগণ ব্যবহার করেছেন। তার চেয়েও বড় কথা, ধ্বনিবাদী আলংকারিক অভিনবগুপ্ত যে 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা'-এর কথা বলেছেন, তাকে আমরা কল্পনারই নামান্তর বলতে পারি। সুতরাং কবিতার প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় কবির গভীর অনুভূতি ও সৃজনশীল কল্পনা যার একটি ঋদ্ধ প্রকাশ ঘটলেই আমরা তাকে গ্রহণ করি কবিতা হিসাবে।

এই প্রসঙ্গেই কবিতার প্রকাশভঙ্গির সামর্থ্যের প্রশ্ন ওঠে। কেবল অনুভূতির ঐশ্বর্য থাকলেই তাকে আমরা মহৎ কবিতা হিসেবে গ্রহণ করি না। 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোনো কোনো মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মতো নীরব হইয়া থাকে তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কী আছে বা না আছে তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।"

এই রকম চরমপন্থী মত অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র প্রকাশ করেননি, একজন রোম্যাণ্টিক কবির কাছে তা আমরা প্রত্যাশাও করতে পারি না, তবে এ কথা আমরা বুঝতে পারি যে মনোভাব মনের মধ্যে থাকলে তা পাঠকের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়—ভাব যখন রূপ পরিগ্রহ করে তখনই তা কবিতা হয়ে ওঠে। ক্রোচের মত সজ্ঞাবাদী নন্দনতাত্ত্বিকও প্রকাশভঙ্গির মূল্য অস্বীকার করতে পারেননি, তবে তিনি বলেছেন প্রকাশের জন্য কবিকে কোন অতিরিক্ত চিন্তা করতে হয় না—মনে ভাব যখন আসে তখন তা রূপ পরিগ্রহ করেই আসে।

কবিতার আর একটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত থাকা দরকার। সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের অন্যতম প্রকরণ হিসাবে, এবং সম্ভবত গভীরতম অনুভূতি সঞ্জাত বলে, কবিতার প্রধান আবেদন আমাদের হৃদয়ে এবং সৌন্দর্যবোধের কাছে। বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিক আন্দোলনের পথিকৃৎ গুস্তাভ ফ্লবেয়র কথাসাহিত্য সম্বন্ধেই এরকম মত প্রকাশ করেন যে তার জন্ম হৃদয়ে, মস্তিষ্ক তাকে উষ্ণতা দান করতে পারে মাত্র। সুতরাং কবিতা যে হৃদয়নির্ভর, এ কথা আমাদের মনে রাখা দরকার—বিশেষ করে বিশিষ্ট কবি টি. এস্‌ এলিয়টের কাব্য-আন্দোলনের পর, কারণ তাঁর প্রভাব রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতাতেও প্রবলভাবেই পড়েছে।

সেই একই কারণে কবিতার আবেদন যে আমাদের সৌন্দর্যবোধের কাছে, এ কথাও আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। সৌন্দর্যকে অবশ্যই আমরা এখানে প্রথাগতভাবে গ্রহণ করবো না। আমরা জানি সৌন্দর্যবোধ সম্বন্ধে আমাদের

ধারণা চিরকাল স্থির হয়ে নেই এবং ব্যক্তির মানসিকতা অনুসারেও সৌন্দর্যধারণার পরিবর্তন হয়ে থাকে। সৌন্দর্য সম্বন্ধে এবং রবীন্দ্রযুগের কবিতায় সৌন্দর্যচর্চা সম্বন্ধে আধুনিক পাঠকের যদি কোন অসন্তোষ থাকে তবে তা এই কারণে যে, সে সৌন্দর্য ছিল অনেকটাই বস্তুগত। সংস্কৃত আলংকারিকগণ যেমন বলেছেন কিছু বিষয় স্বভাবতই কাব্যিক বিষয় হবার যোগ্য, যেন সেই যোগ্যতাতেই কবিরা তাদের গ্রহণ করেছেন নির্বিচারে। সৌন্দর্যধারণার একটি বিপরীত দিকও আছে, যাকে বলা যায় আত্মগত সৌন্দর্যবোধ, এবং যার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথেই আছে—"গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর', / সুন্দর হল সে।"

আসলে, সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বস্তুগতও নয়, আত্মগতও নয়—একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, সৌন্দর্যের সিদ্ধি যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে এই দুইয়েরই দরকার হয়। বস্তুগত সৌন্দর্য অনেক সময়ই নির্ভর করে তার সামঞ্জস্যের ওপর—এ কথা জড়বস্তু সম্বন্ধে যেমন সত্য, মানবচরিত্র সম্বন্ধেও তাই। আবার আত্মগত ভাবে দেখতে গেলে, মানুষ যাকে সত্য বলে অনুভব করে তার মধ্যেই সে সৌন্দর্য খুঁজে পায় এবং সৌন্দর্যকেও সে সত্য বলে মনে করে বলেই তার কাছে তা এতো সুন্দর। কীট্সের কথাটি এ প্রসঙ্গে একেবারে প্রবাদ হয়ে আছে—'Truth is beauty, beauty truth.' এর সঙ্গে মঙ্গলদৃষ্টি বা অধ্যাত্মদৃষ্টি যোগ দিলে কেমন করে সৌন্দর্যবোধের মাত্রা বেড়ে যায়, রবীন্দ্রনাথ 'সৌন্দর্যবোধ', প্রবন্ধে তা বিশদ করবার চেষ্টা করেছেন। আবার ব্যক্তিভেদে, তার মানসিক গঠন অনুসারেও যে সৌন্দর্যবোধ পৃথক হতে পারে সে কথা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বুঝি। সুতরাং সৌন্দর্যসৃষ্টি কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, এ কথা স্বীকার করতে সম্ভবত কোন আপত্তি হবে না। নৈর্ব্যক্তিক সুন্দর-অসুন্দর বিচার করলে যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারি শীলকেও সুন্দর বলা যায় না এবং তা সত্ত্বেও যে তারা আমাদের আকর্ষণ করে—এ প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথকেও বিচলিত করেছিল। তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে তারা সত্য বলেই সুন্দর। কাজেই সুন্দর-অসুন্দরের সে রকম বিচার অর্থহীন। কোন বস্তু, ঘটনা বা চরিত্র আমাদের আকর্ষণ করে বলেই তার সত্যতা আমাদের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যাকে অভ্রান্তভাবে সত্য বলে জানি, তাই আমাদের কাছে আকর্ষণীয় সুন্দর এবং যা আকর্ষণীয় তাকেই আমরা নান্দনিক রূপ দিতে চেষ্টা করি, অন্যের মনেও তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে মনে করে।

কবিতা-বিষয়ক আর একটি প্রশ্ন তার উদ্দেশ্যমূলকতা নিয়ে। আনন্দ দেওয়া এবং আনন্দ পাওয়া ছাড়া কবিতার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে কিনা, এই প্রশ্নে তাত্ত্বিকদের মধ্যে স্পষ্ট দুটি বিভাগ রচিত হয়েছে। একদল সাহিত্যতাত্ত্বিককে বলা হয় উদ্দেশ্যবাদী, তাঁরা Art with a purpose-এই নীতিতে বিশ্বাস করেন। অন্য দলকে বলা হয় কলা কৈবল্যবাদী, তাঁরা Art for art's sake-এই নীতিতে বিশ্বাসী। প্রথম দল মনে করেন কবিতার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, দ্বিতীয়

খলের মতে কবিতাই কবিতার উদ্দেশ্য—কবিতার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

কবিতার যে প্রকৃতির কথা আমরা উল্লেখ করেছি তা থেকে এটি স্পষ্ট যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকৃত কবি কোন কবিতা রচনা করেন না—সৌন্দর্যসৃষ্টি বা মনের আনন্দপ্রকাশই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই কারণেই কীট্‌স্‌ বলেন, "We hate poetry that has a palpable design upon us......Poetry should be great and unobtrusive." অবশ্য সেই সঙ্গে ম্যাথ্যু আর্নল্ডের কথাও আমরা ভুলতে পারি না, কবিতা যাঁর কাছে জীবনের সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্র এমন কথাও বলেছেন যে কাব্য নীতি এবং অন্যান্য শিক্ষা দিয়ে থাকে, যদিও তার শিক্ষাদানের পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন—"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতি জ্ঞান নহে।...কবিরা জগতের শিক্ষা-দাতা—কিন্তু নীতি ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।"

সংস্কৃত আলংকারিকগণ কাব্যের চতুর্বিধ উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, তাঁদের মতে কাব্যপাঠ করলে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই সব কিছুই লাভ হয়ে থাকে।

এই সমস্যার গভীরে না গিয়েও আমরা প্রকৃত সত্য অনুভব করতে পারি। কবিতা রচনার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই জীবন-সমালোচনা বা নীতিশিক্ষা দেওয়া নয়, কিন্তু কবিতা তো জীবন ও জগৎ-বহির্ভূত কোন অলীক বস্তুও নয়। কাজেই জীবনের অনুভূত সত্য, অভিজ্ঞতার নির্যাস সেখানে থাকবেই। তাই জীবনের সমালোচনা না হোক, জীবনের একটা ব্যাখ্যা আমরা সেখানে নিশ্চয়ই আশা করতে পারি। নীতি প্রচার করা হয়েছে অথবা হয়নি, কবিতার উৎকর্ষ ও অপকর্ষের ক্ষেত্রে এটি কোন বিচার্য বিষয়ই নয়। কোন কবির জীবনে সুনীতির প্রভাব থাকলে তাঁর কবিতায় নীতির স্পর্শ আমরা পেতে পারি, কোন কবির ক্ষেত্রে এর বিপরীত ব্যাপারও ঘটতে পারে। কবির নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশের স্বাধীনতা আছে বলেই কবিতা এদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, আবার কবিতা জীবন-বহির্ভূত এক খামখেয়ালি সৃষ্টি নয় বলেই তাতে জীবনের স্বাদ আমরা লাভ করি।

কবিতা প্রসঙ্গে আর একটি প্রসঙ্গ বেশ বিতর্কিত এবং গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল ছন্দ কবিতার পক্ষে অপরিহার্য কী না। প্রশ্নটি গুরুত্বসহকারে আলোচ্য বলেই তা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করাই সংগত।

খ. কবিতা ও পদ্য

কবিতা কেবল পদ্যেই লিখিত হতে পারে কিনা, ছন্দ কবিতার পক্ষে অপরিহার্য কিনা, বিশুদ্ধ গদ্যে কবিতা লেখা সম্ভব অথবা নয়—এ সব প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে একটা কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জেনে রাখা এবং স্মরণে রাখা ভাল যে

কবিতা এবং পদ্য এক জিনিস নয়, তাদের পার্থক্যটা এতো স্পষ্ট যে দুটিকে অভিন্ন মনে করার কোন কারণই নেই।

কবিতার যেটুকু বৈশিষ্ট্য আমরা জেনেছি শুধু সেইটুকু জেনেও বলা যায়, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতির মতো কবিতা একটি সাহিত্য-প্রকরণ। তার কোন বিশেষ রূপ আছে কি নেই সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায়, কবিতা হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য তার প্রকৃতিগত কিছু বৈশিষ্ট্য দরকার—সেগুলি থাকলেই তাকে আমরা কবিতা বলে মেনে নেবো। পক্ষান্তরে পদ্য সাহিত্যের একটা মাধ্যম—গদ্য যেমন তার আর-একটা মাধ্যম, ঠিক তেমনি। বাংলায় যেমন পদ্য এবং কবিতা দুটি আলাদা শব্দ শুধু নয়, ব্যাপারটাও আলাদা—ইংরেজিতেও তাই। গদ্য এবং পদ্য মাধ্যমকে ইংরেজিতে বলে যথাক্রমে prose এবং verse, কবিতা বলতে আমরা বুঝি poetry। একই কথা আমরা গদ্যে বলতে পারি, পদ্য মাধ্যমেও বলতে পারি ; পদ্য মাধ্যমে বললেই তা কবিতা হবার গৌরব অর্জন করে না। 'দেখি, পারলে কাল তোমার বাড়ি যাবো'—গদ্য মাধ্যমের এই সংবাদ পদ্য করে আমরা জ্ঞাপন করতে পারি এইভাবে—'সময় যদি করতে পারি / কালকে যাবো তোমার বাড়ি।' কিন্তু এর সঙ্গে কবিতার কোন সম্পর্ক নেই, কবিতাকে কবিতা হতে হলে নির্দিষ্ট কিছু প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হতে হবে—তার মাধ্যম কী, সে প্রশ্ন পরে। আমরা যখন এই কবিতা পড়ি—

"হাত দুখানি জড়ায় গলা, সাঁড়াশি সেই সোনার অধিক
উজ্জ্বলতায় প্রখর কিন্তু উষ্ণ এবং রোমাঞ্চকর
আলিঙ্গনের মধ্যে আমার হৃদয় কি পায় পুচ্ছে শিকড়
আঁকড়ে ধরে মাটির মতন চিবুক থেকে নখ অবধি ?"

[এক অসুখে দুজন অন্ধ / শক্তি চট্টোপাধ্যায়]

তখন মাধ্যমটি গদ্য অথবা পদ্য সে বিচারের চেয়ে কবিতাটি কেমন করে কবিতা হয়ে উঠলো সেদিকেই আমাদের মন আরো অনেক বেশি থাকে না কি।

তা সত্ত্বেও কবিতা ও পদ্য প্রায় সমার্থক হয়ে এসেছে অনেকের কাছেই। কারণটা এমন হতে পারে যে, দীর্ঘ দিন পদ্যই ছিল, আমাদের সাহিত্য-মাধ্যম এবং তার ফলে রাধা-কৃষ্ণের লীলা থেকে শুরু করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের মতো দুরূহ গ্রন্থও লেখা হয়েছে পদ্য মাধ্যমেই। দীর্ঘ পদ্যগ্রন্থ রচনার জন্য তাঁদের কবির সম্মানও আমরা দান করেছি। এ ব্যাপার যে শুধু বাংলা সাহিত্যে ঘটেছে তা নয়, ইংরেজি সাহিত্য-সমালোচকদেরও আমরা পদ্য এবং গদ্য কথাদুটি প্রায় রূপকার্থে প্রয়োগ করতে দেখি। কবিতার বিষয় ও পরিবেষণভঙ্গী সাদামাটা বা তথ্যবহুল হয়ে গেলে তাকে তাঁরা 'prosaical' আখ্যা দেন। তুলনায় গদ্যরচনায় কাব্যিক অনুভূতি পেলে তাকে বলেন 'poetical' বা সেই ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ রচনায় তাঁরা

খুঁজে পান 'the other harmony of prose.'। এই সমস্যার সমাধান করা দরকার শুধু এই কারণে নয় যে গদ্যমাধ্যমে কবিতা রচনার প্রবণতা এখন ক্রমবিস্তার লাভ করছে, কবিতার সত্যিই কোন নির্দিষ্ট শিল্পরূপ আছে কিনা সে কথা জানার জন্যও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া জরুরি।

কবিতাকে কবিতা হলেই চলবে, ছন্দ বা পদ্যের সঙ্গে তার যে বিশেষ সম্বন্ধ নেই, এ কথা একেবারে প্রথম দিকে বলেছিলেন ষোড়শ শতকের কবি সার ফিলিপ সিডনি। তাঁর মতে, পদ্যছন্দ কবিতার অলংকারমাত্র—"...being but an ornament and no cause to poetry ; sith there hath beene many most excellent poets, that have never versified, and now swarme many versifires that need never answere to the name of poets." ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থের মতো কবি তাঁর 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্‌'-এর ভূমিকায় খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন—"There neither is, nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition."

রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন, "পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি।" ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ এবং রবীন্দ্রনাথ এ সব কথা বললেও ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ যে শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি পদ্যমাধ্যমেই রচনা করেছেন তা আমরা নিশ্চয়ই মনে করতে পারবো। 'গদ্য ও পদ্যের 'ভাসুর-ভাদ্রবউ' সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ মানেন না, এমন কথাও তিনি বলেছেন এবং 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে 'কাব্যের অধিকার' অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন, এও তাঁর দাবী। তা সত্ত্বেও যখন পরবর্তী কাব্যপ্রয়াসে পদ্যছন্দকে তিনি ফিরিয়ে আনেন এবং 'আফ্রিকা'-জাতীয় বেশ কিছু কবিতায় বার বার আঙ্গিক পরিবর্তন করেন, তখন বোঝা যায় একটা কোন অস্বস্তি তাঁকে বিচলিত করছে। আমরা এখন অন্তত বুঝি, মিল বা পর্বের মাত্রা সমকত্ব ত্যাগ করলেও ছন্দ-স্পন্দ বা Rhythm রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করতে পারেন না, ইচ্ছে করলেও না।

অতঃপর যাঁরা মনে করেন কবিতার সঙ্গে ছন্দের একটা অনিবার্য সম্পর্ক আছে, তাঁদের কথা শোনা যাক। হেগেলের মতো পণ্ডিত দার্শনিক একেবারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "metre is the first and only condition demanded of poetry."

অথচ আমরা আগেই বলেছি কবিতা এক সাহিত্য-প্রকরণ এবং পদ্য ও গদ্য দুটি সাহিত্য-মাধ্যমমাত্র, সুতরাং কবিতার সঙ্গে পদ্যকে এক করে দেখার ব্যাপারটা

একই সঙ্গে কেন ঠিক আবার ঠিক নয়—সেটি সুন্দর করে বুঝিয়েছেন প্রাবন্ধিক লী হাণ্ট। দীর্ঘ হলেও তাঁর উক্তিটি এক্ষেত্রে সমস্যাটিকে বোঝার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলেই মনে করি—"It has been contended by some that poetry need not be written in verse at all ; that prose is as good a medium, provided poetry be conveyed through it ; and that to think otherwise is to confound letter with spirit, or form with essence. But the opinion is a prosaical mistake. Fitness or unfitness for song, or metrical excitement, make all the difference between a poetical and prosaical subject ; and the reason why verse is necessary to the form of poetry is that the perfection of the poetical spirit demands it—that the circle of its enthusiasm, beauty, and power, is incomplete without it."

এই কারণেই, সাহিত্যপ্রকৃতির সঙ্গে প্রায় সাহিত্যের আঙ্গিক মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে জানিয়েও, লী হাণ্ট বলেছেন কবিতার শিল্পরূপেই পদ্য অপরিহার্য, নইলে তার ভাব, সৌন্দর্য ও বলিষ্ঠতার বৃত্ত সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই কথাটাই শেলি বলেছেন অন্যভাবে, মানে কথাটা যতো ভালো ভাবে বলা সম্ভব ঠিক ততোটাই ভালো করে—"The distinction between poets and prose writers is a vulgar error."

কোলরিজ অবশ্য একথা বলেছেন, অথবা বলতে বাধ্য হয়েছেন—"poetry of the highest kind may exist without metre' কিন্তু তাঁর মনের কথাটি বোঝা যায়, যখন তিনি বলেন—"There may be, is and ought to be essential difference between the language of prose and metrical composition." (নিম্নরেখা আমার)।

কবি ও সমালোচকদের এই ধরনের পরস্পরবিরোধী উক্তি আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারে, বিশেষত সাম্প্রতিককালে বাংলায় ছন্দবদ্ধ কবিতাই যখন ব্যতিক্রম হয়ে পড়েছে। এই প্রসঙ্গের উপসংহার টানতে গেলে বলতে হবে, কবিতা এবং পদ্য যে সমার্থক নয় এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমরা এ কথা অবশ্যই মনে রাখবো যে কবিতা একটি সাহিত্য-প্রকরণ, পদ্য এক রকমের সাহিত্যমাধ্যম। কবিতা যে পদ্যে লিখতেই হবে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই, পক্ষান্তরে পদ্যে লিখলেই তা কবিতা হবে না, কবিতা হবার শর্ত আছে অন্যত্র। এতো কথা বলেও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, কবিতার বিষয় গভীর ও মর্মচারী অনুভূতি বলেই সেই অনির্বচনীয়ের প্রকাশ সম্পর্কে আমাদের একটু বেশি সাবধান থাকতে হয়। আমাদের অনুভূতি গোপনচারী, একান্ত ও মৌলিক, কিন্তু যে ভাষায় তা প্রকাশিত হয় তা সর্বসাধারণের এবং বহুব্যবহৃত—নিত্যকার প্রয়োজনে সে ভাষা বার বার

ব্যবহার করা হয়েছে। সেই কারণেই কবিতার ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য (যদিও তিনি একে সাধারণভাবে সাহিত্যের ভাষা বলেছেন)—"অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়।...ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সংগীত।"

যাকে রবীন্দ্রনাথ ভাষার সংগীতধর্ম বলেছেন, তাকেই প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে এক ধরনের ছন্দ-স্পন্দ বা Rhythm, এবং কবিরা প্রায় সকলেই এই সংগীতধর্ম বজায় রেখেই থাকেন। কবিতার পংক্তি যে সাজানো হয় অসমভাবে, ক্রিয়াপদ যে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় স্বস্থানের অনেকটা আগে—এ থেকেই বোঝা যায় ছন্দ পরিহার করে গদ্যমাধ্যমে কবিতা লিখতে চাইলেও আমরা ছন্দ-স্পন্দকে পরিহার করতে পারি না। যেখানে সচেতনভাবে আমরা সেটাও পরিহার করি—যদিও এটাকে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া ও ব্যতিক্রম হিসাবেই ধরতে হবে, সেক্ষেত্রেও দেখা যায় আমরা একটি বিশেষ লয় বা গতি এবং কার্যত একটি বিশেষ ধরনের শব্দ-স্পন্দনকে বজায় রেখে থাকি। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। গদ্যে কবিতা রচনা করবার জন্য, এবং অসাধারণ গদ্য লিখবার জন্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় দ্বিধাহীন স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁর একটি কবিতার কয়েক পংক্তি উদ্ধার করি—

"একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা
খুলে খুলে পড়ে, বজ্রের হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে"

এ কবিতা একেবারেই গদ্যে লেখা, পদ্যের কোনও ঝোঁক এখানে কোথাও নেই! তবু সমগ্র কবিতাটির ভাষায় এমন সংবদ্ধ ও অপরিবর্তনীয় একটা সিদ্ধি আছে যার জন্য এর একটি শব্দও আমরা বর্জন করতে পারি না, অতিরিক্ত ঢোকাতে পারি না, এমনকি পরিবর্তনও করতে পারি না। এ সব কাজ করতে গেলে একটা অঘটন যে ঘটিয়ে ফেলি, একটা অমার্জনীয় চ্যুতি—সে কথা আমরা আমাদের উচ্চতর কাব্যবোধে বুঝতে পারি। কোথায় বসাবো আমরা নতুন শব্দ? 'একটি কবিতা লেখা হবে আজ। তার জন্যে'? বর্জন করবো কোথায়—'আগুনের নীল শিখা আকাশ'? পালটাবো কোন শব্দ। 'রাগে উন্মত্ত হয়'? কোন উন্মাদও কি তা পারে! কিছু করা যায় না, কারণ এটি কবিতা হয়ে উঠেছে এবং কবিতা হলেই তা হয়ে যায়—যাকে কোলরিজ বলেন

'Best words in the best order', তাই। আসলে, এই কবিতাংশে ছন্দ না থাকলেও আছে একটা ছন্দ-স্পন্দ, যা তৈরি হয় নিয়ন্ত্রিত গীতিবেগ এবং অতি-নির্বাচিত শব্দের ধ্বনিসজ্জার দ্বারা। অবশ্য এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি, আমরা অগ্রসর হবো এবার পরবর্তী প্রসঙ্গে।

গ. গীতিকবিতা

গীতিকবিতা কথাটি এসেছে ইংরেজি Lyric poetry থেকে। Lyric শব্দটির মূলে আছে লায়ার নামক একটি বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র, এই যন্ত্র-সহযোগে যে গান গাওয়া হতো তাকেই বলা হতো লিরিক বা গীতিকবিতা। এই ভাবে গ্রহণ করলে ইউরোপের বিভিন্ন আখ্যানকাব্য, এমনকি ইলিয়াড ও ওডিসিকেও গীতিকবিতা বলতে হবে, কারণ সেগুলি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গানই করা হতো একদিন। এইভাবে দেখতে গেলে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে লেখা খণ্ডকাব্য ও আখ্যানকাব্যের প্রায় প্রত্যেকটি ধারাকেই গীতিকবিতা বলতে হবে, কারণ এ সবই গান করা হতো। বৈষ্ণব পদাবলী বা শাক্ত পদাবলী ছিল মূলতই গান, সেগুলি এখনও সংগীত হিসাবেই পরিবেষণ করা হয়, কিন্তু বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ-মূলক কাব্য ইত্যাদি সবই তো সুর করে পাঠ করা হতো। সুতরাং সাংগীতিক অনুষঙ্গ থেকে তাদেরও তো বাদ দেওয়া শক্ত।

অথচ গীতিকবিতা বলতে আমরা এখন যে ধরনের কবিতা বুঝি তার সঙ্গে সংগীতের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। এই ব্যাপার কেমন করে ঘটেছে তা বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা থেকে। বিবিধ প্রবন্ধের 'গীতিকাব্য' নামক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—

"গীতের পরিপাট্যজন্য আবশ্যক দুইটি—স্বরচাতুর্য এবং শব্দচাতুর্য।... দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীত হইতে গীতিকাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে, গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্তভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা পুরোপুরি গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কারণ গীত এবং

গীতিকবিতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। গীতরচয়িতার স্বাধীনতা অত্যন্ত সীমিত, সুরারোপের পক্ষে উপযোগিতাই সংগীত রচনার প্রধান লক্ষ্য ; ছন্দ গঠনে তিনি খানিকটা সুবিধাও লাভ করে থাকেন—সুরবাহিত বলে ছন্দের বিভিন্ন ত্রুটি গানে সংশোধন করে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু খাঁটি গীতিকবিতায় প্রকাশসৌন্দর্যও অত্যন্ত বেশি পরিমাণে দরকার হয়।

অবশ্য গীতিকবিতার আলোচনায় উদ্ধৃত বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ বাক্যটি অত্যন্ত মূল্যবান, 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের' পরিস্ফুটন গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে দেখতে গেলে মন্ময় কবিতামাত্রই গীতিকবিতা। রবীন্দ্রনাথ কবিতার স্থূল দুটি বিভাগ করতে গিয়ে বলেছিলেন—"কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা।" গীতিকবিতা একলা কবির কথা। কবির নিজের কথা বলেই অনুভূতির তীব্রতা এই কবিতার প্রাণ। তীব্র অথচ সংহত অনুভূতি প্রকাশিত হয় ক্ষুদ্র বা অনতিদীর্ঘ পরিসরে। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি যে-কোন বিষয় আশ্রয় করেই ব্যক্ত হতে পারে, সুতরাং গীতি-কবিতার বিষয়ের ব্যাপ্তি অত্যন্ত বেশি। তবে এই সঙ্গেই আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস কেবলই ব্যক্তিগত স্বার্থে সীমিত থাকলে তা কবিতার মর্যাদা লাভ করতে পারে না—তার আবেদন অবশ্যই সর্বজনীন হতে হবে। সেই কারণেই গীতিকবিতার বিষয় ধর্মীয় বা তাত্ত্বিক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ধর্ম এক বিশেষ সম্প্রদায়ের, অনেক ক্ষেত্রে তত্ত্বও তাই। কাজেই তার দ্বারা ব্যক্তিগত অনুভূতি ঠিক সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত থাকে না।

এবার গীতি কবিতার প্রধান লক্ষণগুলি সূত্রাকারে উল্লেখ করতে গেলে আমরা বলতে পারি, প্রথমত, তা কবির একান্ত ব্যক্তিগত কথা ; তাঁর এই নিজস্ব উপলব্ধির সঙ্গে সাধারণভাবে ধর্ম বা তত্ত্বদর্শনের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকবে না, এটাই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয়ত, কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির তীব্রতার জন্যই এতে এমন এক নিবিড় আত্মময়তা থাকে যা অনুভূতিশীল চিত্তকে প্রবলভাবে স্পর্শ করে। কবি ও পাঠকের এই রসসংযোগেই গীতিকবিতার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

তৃতীয়ত, কবির অনুভূতি ও উপলব্ধি ব্যক্তিগত হওয়া সত্ত্বেও গীতিকবিতার এক শাশ্বত ও সর্বজনীন আবেদন থাকে—সম্ভবত এই কারণে যে, আন্তরিক অনুভূতির মধ্যে এমন এক নিত্যতা এবং আবেদন আছে যে অনুভূতিশীল সকল মানুষকেই তা আন্দোলিত করতে পারে।

চতুর্থত, আবেগ সংযত ও সংহত হয়ে যখন গাঢ়ত্ব লাভ করে, ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ যে অবস্থাকে বলেন 'Emotions recollected in Tranquillity'—সেই অবস্থাতেই গীতিকবিতা লেখা হয়। সুতরাং এর প্রকাশ হয় সাবলীল, ব্যঞ্জনাময় ও সংহত—

নিটোল মুক্তাসম্ভব এক-একটি শুক্তির মত। আকারে সংক্ষিপ্ত অথচ অনুভূতিতে প্রগাঢ়—এটাই গীতিকবিতার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

ঘ. গীতিকবিতার উৎস :

খাঁটি গীতিকবিতার লক্ষণ একেবারে সাহিত্যের চরম মূল্যে (absolute value) বিচার করলে আধুনিক কালের আগে তার উদ্ভব স্বীকার করা সম্ভব হবে না, কারণ কবির বিশুদ্ধ অহং তখনই ধর্ম ও তত্ত্ব নিরপেক্ষাভাবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে যদি আমরা বিচার করি, অন্তত ধর্মীয় উপলক্ষকে ব্যক্তির অহং-আবরক বলে বিবেচনা না করি তাহলে গীতিকবিতাকেই সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন শাখা হিসাবে আমরা স্বীকৃতি জানাতে পারবো। প্রাচীন ও মধ্যযুগের গীতিকবিতার বিচারে ধর্মীয় উপলক্ষকে আমরা ততটা মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না দুটি কারণে, প্রথমত সেই সময়ে ধর্মকে আশ্রয় করাটা ছিল সাহিত্যের পক্ষে একটা অপরিহার্য ব্যাপার। 'The poet is not a mystic'—কথাটি সূক্ষ্ম ও দৃঢ়ভাবে মানতে গেলে ধরে নিতে হয় আদি ও মধ্যযুগে সাহিত্য বলে কিছু ছিলই না; এবং সেটা মেনে নেওয়া আদৌ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, কবি যখন গীতিকবিতার মন্ময়তাকে সত্যিই আত্মস্থ করতে পারেন তখন তিনি যে-দেবদেবীর কথাই বলুন, তাঁর জবানীতে আসলে কিন্তু তিনি নিজের কথাই বলতে থাকেন। অন্যভাবে বলা যায় দেবদেবীর সঙ্গে আত্মস্থতায় তিনি এমন নিমগ্ন হয়ে যান যে এখানে তাঁদের ভিন্নতা প্রায় লুপ্ত হয়।

অবশ্য হাডসন তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, সুপ্রাচীন সাহিত্যে যেসব রচনার সন্ধান বা উল্লেখ আমরা পাই তা ছিল প্রধানত গোষ্ঠীসাহিত্য, একক সাহিত্য নয়। একক সাহিত্য বা ব্যক্তিত্বের বোধ আমাদের এসেছে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পর। আমরা মনে করি, প্রাচীন যুগে গীতিকবিতা বা মন্ময় কবিতা লেখা সম্ভব, এই ছাড়পত্র দিলে গোষ্ঠীসাহিত্যকেও গীতিকবিতা আখ্যা দেওয়া অসম্ভব হবে না। কারণ বিশ্বের অনেক উল্লেখযোগ্য গীতিকবিতাতেই ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে যা পরিস্ফুট হয়েছে তা হল অনুভূতির গভীরতা এবং মানবিক উচ্চারণ। দেবদেবীর বন্দনাকে উপলক্ষ করেও যদি সেই মানবতার সুর আমরা শুনতে পাই এবং তা যদি উঠে আসে অনুভূতির গভীর স্তর থেকে, তাহলে তাকে গীতিকাব্য বলতে আমাদের বাধা থাকা উচিত নয়। এরপরও বলবো, অনুভূতির সেই গহন উষ্ণতা থেকে উঠে আসা পংক্তিগুলি গোষ্ঠীসাহিত্যের উপলক্ষ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত না হয়ে পারে না। যেমন বেদ-রচয়িতা আর্যঋষি যখন ঈশ্বরকে জানার অনুভূতিও ব্যক্ত করেন, সে অনুভূতি ব্যক্তিগত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ইহুদী সংগীতে কবি যখন 'আমি' বা 'আমার' বলে উল্লেখ করে কবিতা রচনা করেন, তাতেও ব্যক্তিগত কবি অপেক্ষা ইহুদী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হয়। সেই

জন্যই ভারতবর্ষের 'সামগানে' মাঝে মাঝে যে ব্যক্তিগত অনুভূতি আমাদের স্পর্শ করে, 'ওল্ড টেস্টামেন্টে'র 'বুক অব সাম্‌স্‌'-এ সেই ব্যক্তিগত অনুভূতির পরিচয় অল্প—যদিও প্রকাশ-সৌন্দর্যে সেগুলি অসাধারণ।

গীতিকবিতার প্রাচীন উৎস সন্ধান করলে আমাদের গ্রীক সাহিত্যেরই শরণাপন্ন হতে হবে। অবশ্য আদি ভারতীয়-আর্য যুগের বৈদিক সাহিত্য কিংবা চীনের প্রাচীন কবিতার কথাও আমাদের মনে পড়বে। চীনের প্রাচীন কবি লি-পোর কবিতা রবীন্দ্রনাথের এত আধুনিক মনে হয়েছিল যে তিনি বেশ কিছু কবিতার অংশবিশেষ অনুবাদ করে আমাদের শুনিয়েছেন 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে। একটি কবিতা এই রকম—

"নগ্ন দেহে শুয়ে আছি বসন্তে সবুজ বনে।
এতই আলস্য যে সাদা পালকের পাখাটা নড়াতে গা লাগছে না।
টুপিটা রেখে দিয়েছি ঐ পাহাড়ের আগায়,
পাইন গাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া আসছে
আমার খালি মাথার 'পরে।"

প্রাচীন গ্রীক কবিতা যেকোন প্রাচীন সাহিত্যের মতোই ছিল গেয় কবিতা। এক ধরনের গান ছিল সমবেতভাবে গাইবার, তাদের বলা হতো 'কোরিক' অর্থাৎ কোরাস গান; অন্য ধরনের গানকে বলা হতো 'মোনোডিক' বা একক সংগীত। এর মধ্যে 'কোরিক' আলাদা লেখা হতো না, লেখা হতো নাটকের মধ্যে। তবে এস্কাইলাস এবং সোফোক্লেসের মতো কবিও সমবেত-সংগীত রচনা করেছেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে যে মোনোডিক গান শ্রেষ্ঠতর ছিল সে কথা অনেকেই স্বীকার করেন। প্রাচীন গ্রীক কবি সাফো, এলকেয়াস প্রভৃতি এই রকম একক সংগীতের বড় শিল্পী ছিলেন। অবশ্য এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানাতে পারেন বোধ হয় কবি পিণ্ডার।

গ্রীক কবিতায় লিরিকের এই প্রস্তাবনা লাতিন সাহিত্যে নিয়ে এলেন কাতুল্লস, হোরেস প্রমুখ কবি। এদিকে ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যুষ-পর্বে অর্থাৎ অ্যাংলো-স্যাকশন পর্বেই যে গীতিকবিতার উদ্ভব দেখা গিয়েছিল সে কথা আমরা জানতে পেরেছি। সেই সময় যেমন 'বিউল্‌ফের' মতো মহাকাব্যিক রচনা ছিল, তেমনি ছিল 'এক্সাইটর বুক', যাতে মানবিক ঐশ্বর্যসম্পন্ন সাতটি খণ্ডকবিতা ছিল। প্রত্যেকটি কবিতাতেই ব্যক্তিগত বিষাদের সুর ফুটেছে, অবশ্য তাতে কবিরা কেউই ভেঙে পড়েননি। যেমন 'ডিওর' কবিতার লেখক যা বলেছেন তার অনুবাদ—

"গিয়াছে চলিয়া সে দুঃখ হায়,
এ ব্যথাও যেন সেভাবে মিলায়।"

হাল ভেঙে দিশা হারানো এক নাবিকের কণ্ঠস্বর শোনা যায় 'দি সি-ফেয়ারার' কবিতায়, ঊনবিংশ শতকের কবি সুইনবার্ণের কবিতায় যেন সেই কণ্ঠস্বরই ভেসে আসে কালের সমুদ্র পেরিয়ে। মধ্যযুগেই ইংল্যান্ড, জার্মানী এবং ফ্রান্সে লিরিক কবিতার সমৃদ্ধি দেখা যায়। কিছু পরে ইংরেজি সাহিত্যে লিরিক কবিতা আরো ঐশ্বর্যময় হয় সার ফিলিপ সিডনি, এডমণ্ড স্পেন্সার, স্যামুয়েল ডানিয়েল, জন ডান এবং যুগোত্তীর্ণ কবি ও নাট্যকার উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়রের হাতে।

অবশ্য ধর্মের উষ্ণতায় লালিত হলেও ভারতবর্ষের গীতিকবিতা একেবারে অনুল্লেখ্য ছিল না। বৈদিক সংস্কৃত বা ছান্দস্‌ ভাষার সময় পেরিয়ে এসে লৌকিক সংস্কৃতের যুগে দেখি ধর্মীয় সাহিত্যের প্রবণতাও কমে এসেছে; অন্তত লৌকিক সাহিত্য বেশ খানিকটা প্রাধান্য পেয়েছে। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক, কারণ তখন সাহিত্যের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন রাজন্যবর্গ এবং রাজসভায় রচিত সাহিত্য কিছুটা মানবিক এবং দেহসম্পর্কযুক্ত হতে বাধ্য। কালিদাসের দীর্ঘ কাব্যেও লিরিক ধর্মের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, বিশেষত তাঁর পত্রকাব্য 'মেঘদূতে'র দুটি পর্বেই। পরবর্তীকালে রচিত ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' যদিও রাধাকৃষ্ণের ভাগবত উপাদান নিয়ে রচিত, তা সত্বেও 'বিলাসকলাকুতূহল' মানুষের পক্ষেও যে তা সমান রুচিকর, সে কথা কবি নিজেই বলেছেন।

গীতিকবিতা বলতে যদি সঠিকভাবে ওই বীণাজাতীয় যন্ত্রসংযোগে, বা আরো সাধারণভাবে, গান করবার জন্যই লেখা কবিতা বোঝায়, তবে বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে তার বিশেষ সন্ধান পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমরা যে অর্থে কবিতাকে গীতিকবিতা বা লিরিক হিসাবে ধরে নিয়েছি সেরকম কবিতা যে সংস্কৃতে অনেক লেখা হয়েছিল তার প্রমাণ দুটি সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোকসংগ্রহ—'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' (পরবর্তীকালে পরিবর্তিত নাম 'সুভাষিতরত্নকোশ') এবং 'সদুক্তিকর্ণামৃত'। রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক কবিতার সংখ্যা কিছু বেশি ছিল বটে এই দুটি সংকলনে—অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ-আশ্রিত কবিতা, তবে অন্য বিষয়ে লেখা লিরিকগন্ধী কবিতাও ছিল। যেমন দারিদ্র্যলাঞ্ছিত একটি কবিতা—

"চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্‌।
গণ্ডূপদার্থিমণ্ডূকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥"

মূলভাবের অনুবাদ হতে পারে এই রকম ঃ

'খসে গেছে কাঠ, ধ্বসেছে দেয়াল,
জমে জড়ো হল এ ঘরের চাল,
আকীর্ণ শুধু জীর্ণ গৃহেতে
কেঁচো, আর কিছু ব্যাঙ।'

এই সঙ্গে একটু সম্পন্নতার সুখের কবিতাও মনে করা যাক। কেদারভট্ট নামে এক কবি লিখেছেন—

"তরুণং সর্ষপশাকং নবোদনং পিচ্ছিলানি চ দধীনি।
অল্পব্যয়েন সুন্দরি গ্রাম্যজনো মিষ্টমশ্নাতি॥"

সুন্দরী রমণীকে ভোজনের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, বঙ্গানুবাদের বোধ হয় প্রয়োজন নেই তা, থাকলে ভাবানুবাদ এরকম করা যায়ঃ

'তরুণ সর্ষপশাক, নতুন চালের ভাত,
পিচ্ছিল দধি কিছু—শোন হে সুন্দরী,
সামান্য ব্যয়ে গ্রামে এসব ভোজন করি।'

সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভবের মধ্যবর্তী স্তর প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ ভাষাতেও কিছু খাঁটি গীতিকবিতার সন্ধান পাই। এই ভাষার প্রকীর্ণ কবিতার সংকলনও একটি আছে—'প্রাকৃত পৈঙ্গল,' অবশ্য সরহের দোহাকোষেও কিছু উৎকৃষ্ট কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তা অধ্যাত্ম সাধনার রহস্যময় কবিতা। 'প্রাকৃত পৈঙ্গল' সংকলনের অনেক কবিতাই যে মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ ও সাহিত্য-গুণসম্পন্ন তাই নয়, তাদের একটু সীমিত অর্থে, সার্থক গীতিকবিতাও বলা যায়। দু-একটি কবিতার দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা বোঝা যাবে। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলের' এক কবি লিখেছেন বিরহের এই আশ্চর্য সুন্দর কটি পংক্তি—

"সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেলু দুলাএ॥"

অনুবাদ এই রকমঃ

'কান্ত এখন দূরে প্রবাসে,
মন উচাটন, বর্ষা আসে।' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

লক্ষ্য করবার মতো, কবি স্পষ্ট 'মন উচাটন' বলেননি, বলেছেন 'চেলু দুলাএ'—অর্থাৎ শাড়ির আঁচল উড়ছে, তার মানে শাড়ির আঁচলের মতো মনও চঞ্চল হয়ে পড়েছে।

এবার একটি গদ্যরসাত্মক কবিতা স্মরণ করা যাক। আধুনিক রসিক পাঠকের মুখে মুখে এটি প্রায় আধুনিককালের কবিতাই হয়ে গিয়েছে—

"ওগ্গর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা
দুগ্ধ সজুত্তা।

মোইলি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা
খাই পুনবন্তা।"

অর্থাৎ কিনা,

'ওগরানো ভাত কলার পাতে,
গাওয়া ঘি আর দুধের সাথে
মৌরলা মাছ, নালিতা শাক,
দিচ্ছে তো বউ, বর বসে খাক।'

বাংলা ভাষার উদ্ভবের একেবারে প্রথম পর্বে চর্যাপদের মধ্যে গীতিলক্ষণ থাকলেও গীতিকবিতার লক্ষণ তেমন ছিল না, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বৈষ্ণব পদাবলী এবং আরো পরে শাক্তপদাবলী দেব-দেবীকে অবলম্বন করেও সার্থক গীতিকবিতার আস্বাদ এনে দিয়েছে। আধুনিককালের গীতিকবিতা আমরা প্রথম পাই সম্ভবত বিহারীলাল চক্রবর্তীর লেখায়। অবশ্য হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা নবীনচন্দ্র সেনের খণ্ড কবিতাতেও নিশ্চয়ই তার যোগ্য পূর্বাভাস ছিল এবং মধুসূদন দত্তের আক্ষেপমূলক চতুর্দশপদী কবিতায় গীতিকবিতার লক্ষণ আরো স্পষ্ট। আধুনিককালের কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যে গীতিকবিতার ভাণ্ডারকে অফুরন্ত ঐশ্বর্যে পূর্ণ করেছেন সে কথা বলাই বাহুল্য। সেই সঙ্গে আছেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, প্রিয়ম্বদা দেবী, কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর মতো কবি এবং রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রভৃতি।

তবে সব কথার শেষে, অর্থাৎ গীতিকবিতার উৎস বিচার শেষ করেও এ কথা আমাদের বলতে হবে যে, শিষ্ট সাহিত্যের সমান্তর ধারায় বাংলা লোকসাহিত্যেও টুকরো কবিতা ও ছড়া প্রচলিত ছিল। আজ সেসবের অনেকটাই লুপ্ত হয়ে গেছে—ছড়া ও ব্রত কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরনো গ্রাম্যমহিলার মুখে, মেয়েলি ব্রতকথায়; আখ্যান কিছু বেঁচে আছে রূপকথায়, আর মৈমনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকায়। কিন্তু গীতিকবিতার উদ্ভবে এইসব লোক-সাহিত্যের মূল্যও নিতান্ত কম নয়।

ঙ. আধুনিক ও প্রাচীন গীতিকবিতার তুলনা :

প্রাচীন গীতিকবিতা বলতেই মনে পড়বে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ, বৈষ্ণব পদাবলী। এই পদের উপজীব্য রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম—যখন রাধা কৃষ্ণের দর্শন বা

স্পর্শসুখে আনন্দিতা তখন লেখা হয়েছে রূপোল্লাস, পূর্বরাগ, অভিসার প্রভৃতি পর্যায়ের পদ ; যখন কৃষ্ণের বিরহে রাধা কাতর বা কুপিত তখন লেখা হয়েছে মান, মাথুর বা আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের পদ। কিন্তু রাধা বা কৃষ্ণকে অবলম্বন করে রচিত হলেও, যে আর্তি এবং আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে কবিদের লেখায় তাতে কবি যে নিরাসক্ত দর্শকমাত্র, এ কথা আমাদের কখনই মনে হয় হয়। আমাদের মনে হয় কবি নিজের জীবন দিয়ে এই আনন্দ ও বেদনা অনুভব না করলে, কেবল ধর্মীয় সংবেদন সৃষ্টির জন্য এমন পদ রচনা করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের 'বৈষ্ণব-কবিতা'-য় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তা এখন একবার মনে পড়বেই—

"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,......
বিজন বসন্তরাতে মিলন শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেখেছিল মগ্ন করি। এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।"

এই অভিযোগ যে নিতান্ত অকল্পনীয় নয়, মাথুর পর্যায়ে বিদ্যাপতির একটি বিখ্যাত পদ স্মরণ করলেই তা বোঝা যাবে ঃ

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝম্পি ঘন গর— জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া ॥

বর্ষার সঙ্গে বিরহের যেন একটা নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গিয়েছে। রাধা আক্ষেপ করে বলছে, তার দুঃখের সীমা নেই, কারণ ভাদ্রমাসের এই ভরা বাদলেও কিনা তার গৃহশূন্য। ঠিক কথা, সে যুগের অবহট্‌ঠ ভাষার কবিও বলেছেন, বর্ষা এলেই প্রবাসী কান্তের জন্য মন উচাটন করে ওঠে। এ যুগের কবিশ্রেষ্ঠও বলেন 'এমন দিনে তারে বলা যায়। এমন ঘনঘোর বরষায়।' সেই বলবার মানুষটি ঘরে না থাকলে রবীন্দ্রনাথের নায়িকারও মনে হয়—

"ঝরো ঝরো ঝরো ভাদরবাদর, বিরহকাতর শর্বরী।
ফিরিছে এ কোন্ অসীম রোদন কানন কানন মর্মরি ॥"

বিদ্যাপতির মনে হয়েছে আজকের যে দুর্যোগ, ঘনগর্জিত বিভীষিকা, তা যেন সারা পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়েছে—অবশ্যই এ পৃথিবী রাধার যার একপ্রান্তে নিশ্চয়ই আছে কৃষ্ণ। তা জানে বলেই প্রবাসী কান্তের অদর্শনে মদনের নিষ্ঠুর শরাঘাতে তার হৃদয় বিক্ষত। হৃদয়ের সঠিক অবস্থা চিত্রিত করার জন্যই চার পাশে প্রমত্ত আনন্দের চিত্র কবি এঁকেছেন—ঘনঘন বজ্রপাতের শব্দে আনন্দে নেচে উঠছে ময়ূর, ধারাপাতের আনন্দে গেয়ে উঠছে দাদুরী, ডাকছে ডাহুকী। অথচ 'এহেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,/বাক্যহীন পুত্র শোকে'—আধুনিক কবির প্রায় এই পরিপ্রেক্ষিত রচনার তীব্রতায় বিদ্যাপতি বলেন, দুঃখে রাধার বুক ফেটে যাচ্ছে। এরপর যে একটি অসাধারণ চিত্রকল্প আছে তা আধুনিককালেও কবিরা ব্যবহার করেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে সাম্প্রতিকতম কবি পর্যন্ত। বিদ্যাপতি দেখেছেন ঘোর যামিনীর তিমির অন্ধকারে, দুর্যোগের কালো মেঘের ওপর বিদ্যুতের পংক্তি অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছে। হতে পারে ঘন নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে চকিত আশার দীপ্তিকেই কবি উপমিত করতে চেয়েছেন, কিন্তু কী অব্যর্থ চিত্রকল্প। সেই ছবি মনে না থাকলে কি রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন আষাঢ়কে 'তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা'। আর একেবারে আজকের কবি সুমন চট্টোপাধ্যায়ই কি পারেন প্রবীণ কবির দীপ্ত উঠে দাঁড়ানোকে এই অসাধারণ পংক্তি দিয়ে চিত্রিত করতে—

'অতর্কিতেই আকাশ হানলো
বিদ্যুৎময় আলোকচিত্র,
নতুন একটা কবিতা লিখতে
উঠে দাঁড়ালেন অরুণ মিত্র।'

আসলে, মধ্যযুগের কবি বিদ্যাপতি ধর্মের উপলক্ষ পেরিয়ে রাধার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন, তাই এ কবিতায় তাঁর অনুভূতি ও তার ব্যঞ্জনার মধ্যে রাধা কোন ব্যবধান নয়, এক অলৌকিক সেতু। যে প্রকৃতিকে রাধা দেখেছে কৃষ্ণকে স্মরণ করতে, কবির কাছে সেই কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকৃতিই হয়ে গেছে কৃষ্ণ। আধুনিক

কবির কাছে ধর্মের এই উপলক্ষ নেই, নেই তাঁর রাধার মতো কৃষ্ণরতির আকুলতা। তবু যখন আজকের কবি বলেন—

"এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ যে আমার চোখের 'পরে নাচে॥"

তখন একটি কৃষ্ণমূর্তি কি ঝলছে ওঠে না আমাদের মনের মধ্যে। এখানেই কবি বিদ্যাপতি একটি কবিতায় উপলক্ষকে অতিক্রম করে যান, সার্থক গীতিকবিতার স্বাদ সঞ্চারিত করতে পারেন তার মাথুর পর্যায়ের ধর্মীয় কবিতায়।

এবার সময়ের বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করে চলে আসি সাম্প্রতিক কালের স্বীকৃত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি কবিতায়। কবিতাটি এই রকম—

"নবীন কিশোর তোমাকে দিলাম ভুবন ডাঙার মেঘলা আকাশ
তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর
ফুসফুস-ভরা হাসি
দুপুর রৌদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা, রাত্রির মাঠে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা
এসব এখন তোমারই, তোমার হাত ভরে নাও আমার অবেলা
তোমার দুঃখ ক্রোধ শিহরণ
নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম আমার যা-কিছু ছিল আভরণ
জ্বলন্ত বুকে কফির চুমুক, সিগারেট চুরি, জানালার পাশে
বালিকার প্রতি বারবার ভুল
পরুষ বাক্য, কবিতার কাছে হাঁটু মুড়ে বসা, ছুরির ঝলক
অভিমানে মানুষ কিংবা মানুষের মত আর যা-কিছুর
বুক চিরে দেখা
আত্মহনন, শহরের পিঠ তোলপাড় করা অহংকারের দ্রুত পদপাত
একখানা নদী, দু' তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী—
এ সবই আমার পুরোনো পোশাক, বড় প্রিয় ছিলো, এখন শরীরে
আঁট হয়ে বসে, মানায় না আর
তোমাকে দিলাম, নবীন কিশোর, ইচ্ছে হয় তো অঙ্গে জড়াও
অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও, যা খুশি তোমার
তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় সাধ হয়।"

প্রমত্ত কৈশোর এবং নবীন যৌবনের সমস্ত মত্ততা—সব স্বাধীনতা, সব স্বপ্ন, সমস্ত ক্রোধ-দুঃখ-শিহরণ কবি দান করেছেন নবীন কিশোরকে। এক 'নওল কিশোরকে' সব কিছু দান করার পরও তাকে বুঝতে পারেনি বলে একদিন বিলাপ করেছে বিদ্যাপতির রাধা 'কৈছে গোঙায়বি / হরি বিনে দিনরাতিয়া,' আর কালের অপর সীমায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আকুল হয়ে পড়েছেন আর এক নবীন কিশোরকে সব

কিছু দেবেন বলে। একেবারে নিঃস্বার্থ দান, চিরকালের মত—'একখানা নদী, দু-তিনটে দেশ, কয়েকটি নারী' পর্যন্ত। রসিক পাঠক বোঝেন এই নবীন কিশোর কোন বিশেষ কিশোর নয়, ইংরেজি কবিতায় যেমন আমরা পড়ি 'every man' 'every child', রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন 'চির-যুবা'—এও তেমনি চির-কিশোর। এক কথায় বলতে গেলে 'নবীন কিশোর' একটা ধারণার মূর্ত রূপ, চির নবীনতার, চির কৈশোরের।

গীতিকবিতার যেসব লক্ষণের কথা আমরা জানি সেগুলি নিয়ে কবিতাটির বিচার করতে পারি। প্রথমত, ব্যক্তিগত লক্ষণ। এই কবিতা অবশ্যই একটি ব্যক্তিগত দুঃখ প্রকাশ করেছে। কবির বয়স হয়ে যাচ্ছে, একদিন বয়সের ধর্মে যে চূড়ান্ত স্বাধীনতা ভোগ করেছেন, ছোটখাট কাজকর্মে যে নিবিড় আনন্দ পেয়েছেন তা পাবার ক্ষমতা এখন ক্রমেই কমে আসছে। এই পুরনো এবং প্রিয় পোশাক শরীরে যে আঁট হয়ে বসছে, কবি টের পান সে কথা। তাই গভীর বেদনাতেই সেই সোনালি কৈশোর ত্যাগ করার কথা বলেছেন, তা দান করার কথা বলেছেন—এ কবির ব্যক্তিগত কথা তো বটেই।

দ্বিতীয়ত, আত্মময়তা। 'উত্তরাধিকার' একান্তই আত্মময় কবিতা। কবি না বললে আমরা জানতেই পারতাম না কবির সেই অভিমানী আত্মহননের কথা, 'অহংকারের দ্রুত পদপাতের' কথা যা নাকি একদিন শহর তোলপাড় করেছে। আমরা জানতেই পারতাম না কবির অধিকারে ছিল গোটা একখানা নদী, দু-তিনটে দেশ, এমনকি কবির নিজস্ব কয়েকটি নারী। এমন একটি আত্মময় কবিতা খুব বেশি লিখতে পারেন না, এমনকি একজন সমর্থ কবি নিজেও।

তৃতীয়ত, গীতকবিতায় যে শাশ্বত ও সর্বজনীন আবেদন থাকে তাও নিশ্চয়ই এই কবিতায় আছে। আমরা যেসব উত্তরকৈশোর পাঠক এই কবিতার দর্পণে নিজেদের মুখ দেখি, এ কবিতা তো তাদের সকলেরই। একদিন আমাদের সকলেরই অহংকারের পকেট অনেক ভারি ছিল। একটি নারী পাশে থাকলে, কবিতার জন্য দগ্ধ হতে পারলে, রাতের মাঠে চিৎ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে প্রায় অকারণেই নিজেদের আমরা সম্রাট ভাবতে পারতাম। তার দশগুণ বেশি পেয়েও আজ যখন সেই প্রার্থিত পুলক অনুভব করতে পারি না, স্পষ্ট বুঝতে পারি সেই পুরনো পোশাক শরীরে আর মানাচ্ছে না, ছাড়তেই হবে এ পোশাক। এই সোনালি কৈশোরকে ফেলে আসার দুঃখ এতোই সর্বজনীন যে কবিতাটি ব্যক্তিগত হয়েও সহানুভব পাঠে হয়ে ওঠে আমাদের সকলের।

চতুর্থত, যে যন্ত্রণা এবং তীব্র অনুভূতি কবিতাটির মধ্যে নিহিত আছে তা অতি সংহত প্রকাশভঙ্গি খুঁজে নিতে পেরেছে বলেই তাকে একটি ছোট গীতিকবিতার সংযমী পরিসরের মধ্যে আমরা আবদ্ধ দেখেছি। উচ্ছ্বসিত প্রকাশ ঘটাতে চাইলে এই বিষয় নিয়ে কবি অনায়াসে একটা কৈশোর-সংহার কাব্য লিখে ফেলতে পারতেন।

চ. ভক্তিমূলক কবিতা

গীতিকবিতার আলোচনায় যদিও আমরা দেখেছি মধ্যযুগে ধর্মকে অবলম্বন করেও তা লেখা সম্ভব, তবু ভক্তিমূলক কবিতা নামে মন্ময় কবিতার একটি স্বতন্ত্র বিভাগের পক্ষপাতী সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ। তিনি এর নামকরণ করতে চেয়েছেন ভক্তিমূলক গীতিকবিতা। তিনি এর যে উদাহরণ দিয়েছেন তা হল 'শঙ্করাচার্যের স্তোত্রমালা, অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কোথা তুমি', রামপ্রসাদের পদাবলী, গোবিন্দদাসের 'বন্দনা-গীতি' Cardinal Newman-এর Lead Me Kindly Light, Browning-এর Saul, রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র কবিতানিচয়, রজনী সেনের (রজনীকান্ত সেন) 'নির্ভর' এই শ্রেণীর কবিতা।"

আমরা মনে করি ধর্মই যখন এদের উপজীব্য এবং ধর্মের মূল্যেই যখন রচনার মূল্য তখন তাদের কবিতাই বলা যায় না। কিন্তু বিষয়কে তুচ্ছ করে যখন তা সত্যিই কবিতা হয়ে উঠেছে, তখন আর ভক্তিমূলক সংজ্ঞায় অভিহিত না করাটাই সংগত। যেমন চর্যাপদের কোন কোন পদ কবিতা হয়ে উঠেছে, লালন ফকিরের গান ধর্মের পিঞ্জর ভেঙে উদার মানবলোকে প্রবেশ করেছে, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি অনুভূতির আলোয় এমন অসামান্য কবিতা হয়ে উঠেছে যে ধর্ম তার উপজীব্য কিনা ভাবারই অবকাশ থাকে না আমাদের। অন্যদিক থেকে বিচার করলে শঙ্করাচার্যের স্তোত্র এবং রবীন্দ্রনাথের গান অথবা Newman এবং Browning-এর কবিতা একই বিভাগে বিন্যস্ত করাটাও খুব বেশি যুক্তিসংগত বলে আমাদের মনে হয় না।

ছ. প্রেমমূলক কবিতা

গীতিকবিতার এই বিভাগটিও করেছেন সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ। এই বিষয়ের পথিকৃৎ সমালোচক হিসাবে আমরা বিভাগটির উল্লেখ করলাম। তিনি লিখেছেন—"প্রেমমূলক গীতিকবিতায় প্রেমের আশা-নৈরাশ্য, বেদনা-মধুরতা প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া কবি আত্মগত ভাব-কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত রূপ দান করেন। ইংরেজী সাহিত্যে Burns-এর My love is like a red, red rose, Donne-এর The Ecstasy, Browning-এর The Last Ride Together, One Word More, রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষার দিনে' দেবেন সেনের 'লাজ ভাঙান', গোবিন্দদাসের 'আমি তোরে ভালবাসি', এবং জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' উল্লেখযোগ্য।

গীতিকবিতার অস্তিত্ব স্বীকার করলে নতুন করে প্রেমমূলক কবিতার পৃথক বিভাজন স্বীকার করার কোন অর্থ হয় বলে আমাদের মনে হয় না, কারণ খাঁটি গীতিকবিতার পঞ্চাশ ভাগই তো প্রেমের কবিতা। তাছাড়াও এই একই বিভাগে

গোবিন্দদাসের 'আমি তোরে ভালবাসি অস্থিমজ্জাসহ' এবং জীবনানন্দ দাশের 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' এক পর্যায়ভুক্ত মনে করে নেওয়াও শক্ত।

ঙ. প্রকৃতিমূলক কবিতা

প্রকৃতিমূলক কবিতা আধুনিক বাংলা সাহিত্যেরই অবদান। এর উত্তরাধিকার আমাদের ছিল না একথা বলা যায় না। বৈদিক সাহিত্যে প্রকৃতির উপাসনা-স্তোত্র রচনা করা হয়েছে। লৌকিক সংস্কৃত এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশ সাহিত্যেও অবশ্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু প্রেক্ষাপট হিসাবে। নায়ক-নায়িকার মনের অবস্থা পরিস্ফুট করবার জন্য প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণ করাই এর উদ্দেশ্য। আলংকারিক ভাষায় বলতে গেলে, প্রকৃতিকে সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে উদ্দীপন বিভাব হিসাবে, অবলম্বন বিভাব হিসাবে নয়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও এই ব্যাপারটি দেখা যায়। প্রকৃতি সেখানে আসেনি এমন নয়, বরং মাঝে মাঝেই তাকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে ওই উদ্দীপন বিভাব হিসাবে, প্রকৃতিকে সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করার উৎসাহ কবিরা দেখাননি। যেমন ধরা যাক প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চর্যাপদ, সেখানে এরকম পংক্তি আছে—

"উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি-পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।

এখনকার বাংলায় হতে পারে ঃ

শবরীর বাসভূমি পর্বত উচ্চ,
গ্রীবায় গুঞ্জা-মালা, শিরে কেকা-পুচ্ছ।

সেখানে এমন পংক্তিও আছে—'নানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী' (অর্থাৎ, নানা তরু মেলে শাখা গগন-স্পর্শী), কিন্তু প্রকৃতি সেখানে ধর্মতত্ত্বের রূপক। অনেক পরে অষ্টাদশ শতকের শাক্ত পদাবলীতেও আমরা ঠিক এই একই ভাবে রূপকার্থে প্রকৃতিকে পাই যখন কবি বলেন, "শুকনো তরু মুঞ্জরে না, ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে।"

আদি-মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য বাংলা কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রকৃতি-চিত্রণের অভাব নেই, একটি উদাহরণ—

"আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী
মেঘ বহিআঁ গেলে ফুটিবেক কাশী।"

সহজ বাংলায় ঃ

বর্ষা কাটবে গেলে আশ্বিন মাস,
মেঘ উড়ে যাবে, ফুটে উঠবে যে কাশ।

মধ্যযুগের ঐশ্বর্য বৈষ্ণবপদাবলী প্রকৃতিচিত্রণের ভাণ্ডার বলা যেতে পারে। মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যায় এবং মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকাতেও প্রকৃতির অনেক চিত্র আমরা পাই। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে উদ্দীপন বিভাবের ওপরে আর তা উঠতে পারেনি। প্রকৃতির মহিমা পরিস্ফুট করবার জন্যই প্রকৃতিকে অবলম্বন করবার মতো ঘটনা ঘটেনি প্রাগাধুনিক সাহিত্যে, অবশ্য ব্যতিক্রম সব ক্ষেত্রেই থাকতে পারে, সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

মধ্যযুগে প্রকৃতিকে তার নিজস্ব মূল্যে গ্রহণ করার একটা অস্পষ্ট আভাস যদি থাকে, তবে তা আছে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের কাব্যে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যদি কবি হিসাবে মেনে নিতে আপত্তি না থাকে তবে তাঁর কবিতায় এ আভাস আরো স্পষ্ট। তবে প্রকৃতিমূলক কবিতা বলতে প্রকৃতই যা বোঝায় তার সূত্রপাত যে মধুসূদন দত্তের হাতে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'-র অন্তর্গত 'স্বায়ংকাল', 'সায়ংকালে তারা', 'নিশা', 'উদ্যানে পুষ্করিণী' প্রভৃতি কবিতা এর উদাহরণ। তবে প্রকৃতিকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে প্রকৃতি ও মানবের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—

"হায়রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন—
কেন হেন ওঠে মনে চিন্তার লহরী!"

রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'ভোরের পাখি' বলেছেন, সেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর হাতে প্রকৃতি প্রাণ পেয়েছে এবং বিবিধ বৈচিত্র্যে তা দীপ্ত হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে।

খ. প্রার্থনাসংগীত

ইংরেজিতে থাকে বলে Hymn, বাংলায় তাকে আমরা প্রার্থনাসংগীত বা স্তবগাথা নাম দিতে পারি। মন্ময় কবিতার মধ্যে 'হিম্' এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে তার আলোচনা করা দরকার।

'হিম্' বলতে বোঝায় দেবদেবীদের উদ্দেশে রচিত স্তবগাথা, সাধারণ ভাবে গাওয়ার জন্যই যা লেখা হতো, তবে আবৃত্তির জন্য রচিত প্রার্থনাগীতিও একেবারে পাওয়া যায় না এমন নয়। দেবদেবীর উদ্দেশে রচিত হলেও মানবিক অনুভূতি এই সব গানে একেবারে তাৎপর্যহীন নয়। পুরনো প্রার্থনাসংগীতে কবিরা ঈশ্বর

ও অধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের ব্যক্তিগত উপলব্ধি যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি তাঁদের গানে মর্ত্যধামের পার্থিব জীবনও তুচ্ছ হয়ে যায়নি।

সবচেয়ে প্রাচীন খণ্ডকবিতা হিসাবেই স্তবগাথাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সালেই রচিত হয়েছে বৈদিক স্তবগাথা, অথচ আর্যঋষিদের কবিকল্পনার ঐশ্বর্য আমাদের বিস্মিত করে। প্রকৃতিকে বন্দনা করবার জন্য তাঁরা যে স্তোত্র রচনা করেছেন তাতে প্রকৃতিকে তাঁরা মূর্ত করে তুলেছেন এবং এই পদ্ধতির জন্যই তাঁদের প্রকাশ অনেক মানবিক হয়ে পড়েছে। সেই বেদগানের প্রার্থনাসংগীতের চেয়ে আজকের শ্যামাসংগীতের প্রার্থনা 'ব্রহ্মময়ী দে মা পাগল করে' আপাত-বিচ্ছিন্ন অথচ এক সুনিশ্চিত সাদৃশ্য সূত্র অবলম্বন করে এক অভিন্ন ধারার মতো প্রবাহিত হয়ে আসছে। তার সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে মিশেছে বহু বিভিন্ন ধারা—সুর-দাসের ভজন, কবীরের ভজন, তুলসীদাস-মীরাবাঈ-এর ভজন, রামদাস-তুকারামের ভজন। অন্য দিকে আছে বৈষ্ণব কবিদের প্রার্থনা, শাক্ত কবিদের আকুতি। সমস্ত ধারা মিলে একটি প্রধান আধ্যাত্মিক ধারাকেই এমন পরিপুষ্ট করেছে যে আমরা একথা আজ জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যাই বাউল গানে কোন্ বিশেষ ধর্মের মরমীয়া সাধনের কথা বলা হয়েছে, সুফী সাধনতত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সাধনতত্ত্ব কিনা এবং ভাটিয়ালি গানে যে সুজন বন্ধুকে সম্বোধন করা হয় তিনি কোন্ ধর্মমতের দেবতা। নাকি তিনি একান্তই প্রাণের দোসর, রবীন্দ্রনাথের 'পান্থজনসখা' বা 'পরাণসখা বন্ধু-'র মতোই জীবনের নিয়ন্তা এক পরম বান্ধব কিনা।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে গ্রীক 'হিম্'-ই সবচেয়ে প্রাচীন। কিন্তু তার বেশির ভাগ আজ বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত। যা আমরা স্মরণ রেখেছি তার মধ্যে পড়তে পারে বেশ কিছু স্টোয়িক স্তোত্র। ইহুদীদের প্রার্থনাসংগীতে ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের চেয়ে নিজেদের লাঞ্ছনা এবং তা থেকে উত্তরণের প্রয়াসই বেশি দেখা যায়। 'ওল্ড টেস্টামেন্টের' বহু গানেই তার প্রমাণ আছে। গ্রীক এবং হিব্রু ভাষার প্রার্থনা-সংগীতের অদ্ভুত এক সমন্বয় দেখা যায় ইংরেজি ভাষায় রচিত খ্রীষ্টান 'হিমে'। বিভিন্ন গীর্জায় যেসব প্রার্থনাসংগীত গাওয়া হতো বা হয় তার স্বরলিপি-সমৃদ্ধ এক সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল বিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে। প্রাচ্য সাহিত্যে ওমর খৈয়াম, হাফিজ প্রভৃতির মতো পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় অনেক প্রার্থনাসংগীত লেখা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে—অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকেও কুপার, হেবার, পামার-এর মতো ইংরেজ ও আমেরিকান কবি প্রার্থনাসংগীত লিখেছেন।

অবশ্য ঊনবিংশ শতকেই বা প্রান্তরেখা টানি কেন, ধর্মসংগীত হওয়া সত্ত্বেও স্তোত্র গাথার ধারা এখনও অব্যাহত বললেই সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া হবে। কারণ তা নাহলে ফ্রান্সিস টমসন বা রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্বের গানগুলিকে আমরা আর কোন্ শ্রেণীতেই বা বিন্যস্ত করতে পারি।

৪৬. ওড বা স্তুতিকবিতা

গীতিকবিতার অন্যতম প্রাচীন শ্রেণী বলা যায় ওড (Ode)-কে। স্বীকৃত পরিভাষার অভাবে একে স্তুতি কবিতা বলা যেতে পারে, তবে ওড শব্দটি ব্যবহার করাই অধিকতর যুক্তিসংগত হবে বোধহয়।

প্রাচীন গ্রীসে ওড ছিল প্রধানত এক ধরনের সম্মেলক গান বা কোরাস, তবে একক কণ্ঠের ওডও তখন একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। পুরণো ওডে পর পর তিনটি স্তবক থাকতো। সম্মেলক গায়কগণ প্রথমে মঞ্চের বাঁদিকে ঘুরে প্রথম স্তবক গাইতেন, একে বলা হতো স্ট্রোফি (strophe) ; তারপর দ্বিতীয় স্তবকটি গাইতেন ডান দিকে ঘুরে, একে বলা হতো অ্যান্টি স্ট্রোফি (Antistrophe) ; এরপর তৃতীয় স্তবকটি গাইতেন সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, একে বলা হতো ইপোড (Epode)। কবিতা দীর্ঘ হলে স্তবকের সংখ্যা বেড়ে যেতো, কিন্তু পুরণো ওডে তিনটি বিভাগ সর্বদাই মেনে চলা হতো। প্রাচীনকালে গ্রীক ভাষার যেসব কবি সার্থক ওড রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে স্যাফো, অ্যানাক্রেওন, পিন্ডার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এইসব কবিদের রচিত ওডের বিষয় ছিল এতোই ভিন্ন যে গীতিকবিতার এই বিভাগটিকেই সমালোচক হাডসন খুব বিস্তৃত ও অস্পষ্ট মনে করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি বিষয়বৈচিত্র্য সম্বন্ধে এমন মন্তব্য করেছেন যে এর ব্যাপ্তি ছিল "from the drinking songs of Anacreon to the love songs of Sappho, and from these again to the lofty 'Occasional' poems of Pindar."

তা সত্ত্বেও অবশ্য ওড-এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে। হাডসন এর দুটি সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন, প্রথম সংজ্ঞায় বলা হয়েছে এটি—"a rimed (rarely unrimed) lyric, often in the form of an address ; generally dignified or exalted in subject, feeling and style."

নিউ ইংলিশ ডিকশনারির এই সংজ্ঞা অনুসারে তাহলে ওড প্রায়শই ছন্দোবদ্ধ এক ধরনের গীতিকবিতা যা কাউকে উদ্দেশ্য করে রচিত। বিষয়, অনুভূতি ও প্রকাশ-ভঙ্গিতে একটা মহৎ কিছু বা উচ্ছ্বাস বর্তমান থাকে এরকম কবিতায়। হাডসন দ্বিতীয় সংজ্ঞা বেছেছেন English Odes গ্রন্থের ভূমিকায় Gosse যে মন্তব্য করেছেন সেখান থেকে। Gosse-ও বলেছেন প্রায় এই একই কথা, এই কবিতা হল "any strain of enthusiastic or exalted lyrical verse, directed to a fixed purpose, and dealing progressively with a dignified theme."

এগুলির সঙ্গে সমালোচকগণ যোগ করেছেন আরো দুটি বৈশিষ্ট্য-প্রথমত, চিন্তাধারার যুক্তিসংগত বিবর্তন এবং দ্বিতীয়ত এর দৈর্ঘ্য, যা মোটামুটি পঞ্চাশ থেকে দুশো পংক্তির মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ওড কবিতায় প্রচুর বিবর্তন হলেও ধারাটি এখনও সজীব। প্রাচীন গ্রীক রীতির তিনটি বিভাগ এখনও মানা হয়, তবে জনসন তাদের নতুন নামকরণ করেছেন যথাক্রমে

turn, counter-turn এবং stand. প্রাচীন গ্রীক কবিদের মধ্যে ওড রচনার সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন পিণ্ডার। তাঁর মতো কঠিন নিয়মনিষ্ঠা দেখাতে না পারলেও মোটামুটি পিণ্ডারীয় রীতিতেই রোমান কবি হোরেস ওড রচনা করেছেন। তাঁর ওডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'টু সিনেসাস', 'কান্ট্রিলাইফ' প্রভৃতি। ইংরেজি কবিতায় কবি মিলটনের সময় থেকেই এই জাতীয় কবিতা লেখা হয়ে আসছে। বস্তুত ইংরেজি সাহিত্যে রচিত ওডের মারফতই আমরা এই কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, নতুবা বাংলা সাহিত্যে ঠিক এই রকম স্তুতি কবিতা লেখার রেওয়াজ ছিল না। অতি সমৃদ্ধ ইংরেজি সাহিত্যে যাঁরা মোটামুটিভাবে পিণ্ডারীয় রীতি মেনে কবিতা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে পুরণো কবি বলতে নাম করতে হয় জন মিলটন এবং আব্রাহাম কলি-র। পরবর্তীকালে এই ধরনের ওড রচনা করেছেন গ্রে এবং কলিন্স। গ্রে-র 'ওড অন এ ডিস্ট্যাণ্ট প্রসপেক্ট অন ইটন কলেজ' ও কলিন্স-এর 'ওড টু ইভ্নিং' 'দি প্যাশন্স্' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই ধারা অনুসরণ করে যাঁরা নিয়ম মেনে ওড রচনা করেছিলেন তাঁদের কিছু বিখ্যাত কবিতা-স্পেন্সরের 'এপিথালামিয়ন', শেলির 'ওয়েস্ট উইণ্ড'; কীট্সের 'টু এ নাইটিঙ্গেল', 'অন এ গ্রীসিয়ান আর্ন' প্রভৃতি। যাঁরা কঠিন নিয়ম না মেনে কিছু স্বাধীনতা নিয়েছিলেন তাঁদের কিছু বিখ্যাত কবিতা ড্রাইডেনের 'আলেকজাণ্ডারস্ ফীস্ট'; ওয়র্ডস্ওয়র্থের 'ওড অন দি ইণ্টিমেশন্স্ অব ইম্মরট্যালিটি'; টেনিসনের 'ওড অন দা ডেথ অব দি ডিউক অব ওয়েলিংটন' প্রভৃতি।

দেবদেবীর স্তুতি বাংলা কবিতায় মধ্যযুগে প্রচুরই লেখা হয়েছে, কিন্তু তাদের ঠিক ওড বলা যায় না, ওড আধুনিক কালের সৃষ্টি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের উদ্দেশধর্মী কবিতাকে কেউ কেউ ওড মনে করেন কিন্তু এগুলিকে উন্নত ভাবের রচনা কোনক্রমেই বলা চলে না। মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কিছু ওডের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন 'কপোতাক্ষ নদ', 'বসন্তে একটি পাখীর প্রতি', 'শ্যামা পক্ষী' প্রভৃতি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা খণ্ড কবিতাতে ওডধর্মী রচনা কিছু আছে, বিশেষত ইংরেজি কবিতার অনুবাদে। বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বঙ্গসুন্দরী' বা 'নিসর্গ সন্দর্শন' দীর্ঘ রচনা হলেও তাতে ওডের ধর্ম রক্ষিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। বাংলা সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওড লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছোট কবিতার মধ্যে তাঁর 'মহুয়া' কাব্যের 'নাম্নী' শীর্ষক কবিতাগুলিকে এই ধরনের উল্লেখযোগ্য কবিতা বলা যায়। দীর্ঘ কবিতার মধ্যে 'বসুন্ধরা', 'সমুদ্রের প্রতি', 'ক্যামেলিয়া', 'পৃথিবী' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যায়। বাংলায় পরবর্তীকালের অন্যান্য ওডের মধ্যে উল্লেখ্য যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'নবপন্থা', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বুদ্ধপূর্ণিমা', মোহিতলাল মজুমদারের 'পান্থ', জীবনানন্দ দাশের 'সুচেতনা' সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'নীলিমাকে', বিনয় মজুমদারের 'আমার ঈশ্বরীকে' প্রভৃতি।

ট. এলিজি বা শোকগীতি

এলিজি বা শোকগীতি বলতে আমরা এখন বন্ধু, আত্মীয় বা অতি নিকট-জনের বিয়োগব্যথাকে উপলক্ষ করে কবির ব্যক্তিগত শোকভাবনার প্রকাশকে বুঝে থাকি, কিন্তু বহু প্রাচীন এই গীতিকবিতার ধারা সম্বন্ধে 'প্রাইমার অব গ্রীক লিটারেচার' গ্রন্থে সমালোচক জেব বলেছেন, এর বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি অত্যন্ত বেশি। যুদ্ধবিগ্রহ, পরাধীনতার যন্ত্রণা, রাজনৈতিক ব্যঙ্গবিদ্রূপ, আদর্শ জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কবির ধারণা, উৎসবের আনন্দ, মৃতের প্রতি শোকজ্ঞাপন প্রভৃতি অনেক বিষয়েই এলিজি লেখা হতো বলে তিনি জানিয়েছেন। ব্যক্তিগত শোক এবং মৃতের উদ্দেশে রচিত কবিতাকে 'মোনোডি' নামে আখ্যাত করা উচিত বলে সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ মনে করেন। আবার সমালোচক হাডসন জানিয়েছেন, গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যে একটি বিশেষ ছন্দরূপকেই 'এলিজি' বলা হতো। প্রথমে ছমাত্রা ও পরে পাঁচ মাত্রায় সজ্জিত এই ছন্দরূপের আদর্শ যে কবি লংফেলো-র একটি কবিতায় ধরা পড়েছে তাও তিনি দেখিয়েছেন।

অবশ্য উদ্ভবকালে এলিজির বিষয়বৈচিত্র্য কতো বেশি ছিল এবং কী সুনির্দিষ্ট ছন্দরূপ মেনে এই ধরনের কবিতা রচিত হতো তা জেনে আমাদের লাভ নেই। এলিজি শব্দটি এসেছে গ্রীক Elegia শব্দ থেকে, যার অর্থ বেদনার আকুলতা এবং বর্তমানে শোকপ্রকাশক কবিতা হিসাবেই তাকে আমরা জানি। সুতরাং প্রচলিত অর্থকেই এক্ষেত্রে মেনে নিতে হবে। ইংরেজিতে শোকজ্ঞাপক ছোট এক ধরনের কবিতাকে বলে ডার্জ, তা সত্ত্বেও শোকের কবিতাকে সাধারণভাবে আমরা এলিজিই ধরে নিতে পারি।

বরং এলিজির কয়েকটি স্পষ্ট বিভাগের কথা আমাদের স্মরণে রাখা ভাল। এক ধরনের এলিজিকে বলা যায় Critical Elegy, এতে কবি-সাহিত্যিকের স্মরণে তাঁর রচনাকর্মের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করা হয়, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও করা হয়। ইংরেজি সাহিত্যে এই ধরনের এলিজির মধ্যে আর্নল্ডের 'হাইনেজ গ্রেভ', ওয়াটসনের 'ওয়র্ডসওয়র্থ'স গ্রেভ' উল্লেখযোগ্য। এলিজির অন্য এক বিশেষ বিভাগকে বলা হয় প্যাসটোরাল এলিজি বা রাখালিয়া শোকগীতি। এর বৈশিষ্ট্য হল, কবি তাঁর ব্যক্তিগত শোককে এক নিঃসঙ্গ রাখালের বেদনার সঙ্গে অভিন্ন করে তোলেন এবং রাখাল যখন তার শোকসন্তপ্ত চিত্তের পরিচয় ফুটিয়ে তোলে, তাতেই প্রকাশিত হয় কবির বেদনা। এই ধরনের এলিজির উদ্ভাবক গ্রীক কবি বিয়ন, তিনি 'ল্যামেণ্ট ফর অ্যাডোনিস' কবিতায় এই রীতির প্রথম প্রয়োগ করেন। লক্ষ করবার মতো, কবি বিয়নের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য কবি মস্কাস্ লেখেন এই একই রীতিতে 'ল্যামেণ্ট ফর বিয়ন'।

এলিজি কবিতার প্রাচীন গ্রীক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি সিসনেরমাস্,

অ্যানাক্রেয়ন ও একেসরোটাস। ল্যাটিন ভাষার কবিদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে কবি টিবিউলাস, ওভিড, ট্যাসো প্রভৃতির। ইংরেজি সাহিত্যে এলিজি রচয়িতাদের মধ্যে আছেন মিলটন (লিসিডাস), স্পেন্সার (অ্যাস্ট্রোজেল), শেলি (অ্যাডোনেইস), ম্যাথ্যু আর্নল্ড (রাগবি চ্যাপেল), হুইটিয়ার (ইন রিমেমব্রান্স অব জোসেফ স্টার্জ), ব্রাউনিং (লা সেইজিয়াজ) প্রভৃতি। টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' দীর্ঘ এলিজির উদাহরণ।

বাংলা সাহিত্যে উৎকৃষ্ট এলিজির মোটেই অভাব নেই। তবে বেশির ভাগ বাংলা এলিজিই পড়তে পারে ক্রিটিক্যাল বা সমালোচনামূলক এলিজির মধ্যে, যেমন—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' ও 'এবে কোথায় চলিলে?' নবীনচন্দ্র সেনের 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত' বা গোবিন্দ দাসের 'বঙ্কিমবিদায়' থেকে শুরু করে আধুনিক কালের মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এলিজি 'পাথরের ফুল' বা শান্ত চট্টোপাধ্যায়ের 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'। অবশ্য এ ছাড়াও বাংলা কবিতায় এই জাতীয় এলিজি আরো অনেক আছে। রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়ে দিলেও নজরুল ইসলামের 'গোকুল নাগ' ও 'রবিহারা', সজনীকান্ত দাসের 'মর্ত্য হইতে বিদায়' প্রভৃতি।

রাখালিয়া শোকগীতি বা প্যাস্টোরাল এলিজি বাংলায় বিশেষ নেই, কিন্তু ব্যক্তিগত শোক থেকে লেখা কবিতা অনেক আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বন্ধুবিয়োগ', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা', করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উদ্দেশে', রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তিনটি গুলি' প্রভৃতি। ব্যক্তিগত শোককে বা বন্ধুবিয়োগকে লঘু রীতিতে পরিবেষণের যে দুটি একটি উদাহরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বনফুলের লেখা 'পরিমল গোস্বামী'। এর প্রথম দুটি পংক্তি এইরকম—

> "পরিমল, চলে গেলে! বেশ গেছো ভাই।—
> এ জগতে বেঁচে থেকে কোন সুখ নাই।"

ব্যক্তিগত শোক কিংবা বরেণ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সাধারণ শোকাবহ ঘটনা নিয়েও বাংলা এলিজি লেখা হয়েছে, যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'কবর-ই-নুরজাহান'। তবে এলিজির চরম উৎকর্ষ আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' নামক দীর্ঘ কবিতায়। এই জাতীয় কবিতায় শোকের প্রাথমিক আঘাত কাটিয়ে যে আশার সুর শুনিয়েছেন মিলটন, যে কারণে তিনি বলতে পেরেছেন 'weep no more', কীটসের উদ্দেশে কবিতা লিখতে গিয়ে শেলি যে কারণে বলতে পেরেছেন "but the pure spirit shall flow/Back to the burning fountain whence it came," রবীন্দ্রনাথও সেই কারণেই এই কবিতায় বলতে পারেন—

> "বাধা কি গো ঘুচিল চোখের,
> সুন্দর কি ধরা দিল অনিন্দিত নন্দন-লোকের

আলোকে সম্মুখে তব, উদয়শৈলের তলে আজি
নবসূর্য বন্দনায় কোথায় ভরিলে তব সাজি
নব ছন্দে, নূতন আনন্দগানে ?"

এই বলিষ্ঠ আশাই কবিতাটিকে ভিন্নতর আস্বাদ দান করেছে।

ঠ. সনেট

গীতিকবিতার যেসব শাখা একটি বিশেষ রূপকৃতি বা শিল্পরূপের বন্ধনকে স্বীকার করে নিয়েছে এবং সেই রূপকৃতি হিসাবেই খ্যাতি লাভ করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। এখানে গীতিকবিতার আবেগকে চোদ্দ পংক্তির সীমিত আকারে এবং অন্যান্য কিছু নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হয়। সম্ভবত এই সব বন্ধনের জন্যই সিসিল ডে লুইস নামে এক কাব্য-সমালোচক মনে করেছেন, সনেট গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের খ্যাতিমান কবিগণ এই বন্ধনকে স্বীকার করেই সনেটের রূপকল্পে অসাধারণ কবিতা সৃষ্টি করেছেন। 'অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়' এই ধরনের কবিতা সম্বন্ধে ওয়র্ডসওয়র্থের বক্তব্য ঃ

"...... 't was pastime to be bound
within the sonnet's scanty plot of ground."

বাংলা সনেটের শিল্পী প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—

"ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।"

সমালোচক হাডসন বলেছেন সনেটের এই বিভাগটি করা হয়েছে 'wholly on the basis of form' এবং তাঁর অভিজ্ঞ পরামর্শ 'The theoretical system of the sonnet should, however, be carfully analysed and mastered by every student of poetic technique.' সুতরাং সেই তাত্ত্বিক খুঁটিনাটি না জেনে আমাদের উপায় নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা ভাল যে ভাবের গভীরতাই সনেটের প্রাণ, সেখানে ফাঁকি পড়লে আঙ্গিক নিষ্ঠা তাকে ধন্য করতে পারবে না।

একটি বিশেষ রূপকৃতির কবিতা হিসাবে সনেটের উদ্ভব ইটালিতে, তবে উদ্ভবের স্বল্পকালের মধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় সনেটের প্রসার ও জনপ্রিয়তা ঘটে এবং সনেটের ইতিহাসে ইটালীয় সনেটের মতই গৌরব লাভ করে ইংরেজি

সনেট। বাংলা ভাষায় এ জাতীয় কবিতার প্রচলন হয় বেশ কিছুটা পরে, 'চতুর্দশপদী কবিতা' নামে। পরে সনেট নামটিই বাংলায় গৃহীত হয়।

ইটালীয় ভাষায় 'সনেটো' শব্দের অর্থ মৃদুধ্বনি। আকারে সংহত এবং কবির আত্মকথন বলেই এই ধরনের নাম তার হতে পারে। রূপের দিক থেকে ইটালীয় সনেট বা ইটালীয় ভাষায় সনেটের পথিকৃৎ-কবি পেত্রার্কের নাম অনুসারে পরিচিত পেত্রার্কীয় সনেটের সঙ্গে ইংরেজি সনেটের কিছু পার্থক্য আছে। পেত্রার্কীয় সনেটকে ধ্রুপদী সনেটও বলা হয়। এই রীতির সনেটে মোট চোদ্দ পংক্তি থাকে এবং সেই চোদ্দ পংক্তি দুটি ভাগে বিভক্ত থাকে। প্রথম ভাগে থাকে আটটি পংক্তি, একে বলা হয় Octave বা অষ্টক। দ্বিতীয় ভাগে থাকে ছটি পংক্তি, একে বলা হয় Sestet বা ষট্‌ক। অষ্টকের সমান দুটি ভাগও কখনও কখনও দেখা যায়, চার পংক্তির এই ভাগ দুটিকে বলে Quatrain বা চতুষ্ক। সেইভাবে ষট্‌কেরও সমান দুটি ভাগ কখনও কখনও দেখা যায়, তাদের বলা হয় Tercet বা ত্রিপদিকা।

কবিতার স্থূল এই আঙ্গিক বিভাগ ছাড়াও পেত্রার্কীয় সনেটে অন্ত্যানুপ্রাস বা চরণান্তিক মিলেরও একটি মোটামুটি নিয়ম ছিল। সেখানে অষ্টকের মিল থাকতো এইরকম—কখখক, কখখক; ষট্‌কের মিল থাকতো হয় গঘঙ গঘঙ, অথবা গঘ গঘ গঘ।

ইংরেজি সনেটে কেউ কেউ অবশ্য পেত্রার্কীয় সনেটের আদর্শই অনুসরণ করেছেন, যেমন জন মিলটন ও উইলিয়ম ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ। প্রধানত শেক্‌স্‌পীয়রই সনেটের অঙ্গবিভাগ ও মিলে কিছুটা ভিন্ন রীতির প্রবর্তনা করেন। তাই পেত্রার্কীয় সনেটের সঙ্গে ইংরেজি সনেটের পার্থক্য আছে না বলে তার সঙ্গে শেক্‌স্‌পীরীয় সনেটের পার্থক্য আছে বলাই ভাল। শেক্‌স্‌পীরীয় সনেটে অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ অনেক সময়ই মেনে চলা হয়নি, কখনও আট-ছয়, কখনও আট-তিন-তিন, কখনও বা বারো-দুই বিভাগ করা হয়েছে। মিলের দিক থেকে শেক্‌স্‌পীরীয় রীতিতে বেশি দেখা যায় এই ধরনের মিল—কখ, কখ, গঘ, গঘ, ঙচ, ঙচ, ছছ।

বাংলা সনেটেও চোদ্দটি পংক্তি থাকে বলে (কখনো বা আঠারো পংক্তির সনেটও দেখা যায়) তার নাম হয়েছে চতুর্দশপদী কবিতা। এর সঙ্গে আবার প্রতি পংক্তিতেও থাকে চোদ্দটি হরফ বা বর্ণ।

অবশ্য আগেই বলা হয়েছে কেবল রূপকৃতি নয়, ভাবের দিক থেকেও সনেটের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। পেত্রার্কীয় সনেটে বিষয় হিসাবে আদর্শ ছিল প্রেম, কিন্তু পরে এই বিষয়ের অনেক বৈচিত্র্য কবিগণ সৃষ্টি করেছেন। যে ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার সেটি হল, ভাবের অখণ্ডতা, গভীরতা ও সংযম। একটি অখণ্ড ভাব নিয়েই সনেট রচিত হয়—অষ্টকে সেই ভাবের প্রস্তাবনা, ষট্‌কে তার ব্যাখ্যা বা বিস্তৃতি। ঠিক এই নিয়ম কঠিনভাবে মানা না হলেও অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যে

একটা পার্থক্যরেখা আমরা অনুভব করতে পারি, সুরের পার্থক্যও কিছু ঘটে যেতে পারে, কিন্তু উভয়ে মিলে একটি অখণ্ড ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করতে হবে।

সনেটের রূপগত ও ভাবগত এই সব বৈশিষ্ট্য চিন্তা করে সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ সনেটের পাঁচটি প্রধান লক্ষণের উল্লেখ করেছেন—

(১) সনেট সাধারণভাবে চতুর্দশ অক্ষর (অর্থাৎ চোদ্দটি হরফ বা বর্ণ) সমন্বিত চোদ্দ পংক্তির কবিতা।

(২) অষ্টক ও ষট্‌কের বিভাগ রক্ষা করাই সনাতন রীতি, যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকে এই রীতি মানেন নি।

(৩) এতে একটি মাত্র ভাবের দ্যোতনা থাকে।

(৪) এর ভাবে গভীরতা ও ভাষায় ঋজুতা থাকবে।

(৫) বিশেষ নির্মাণরীতি অনুসরণ করতে হয় বলে গীতিকবিতার অন্যান্য শাখার মত এটি স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

সনেটের জনক ইটালীয় কবি পেত্রার্ক (১৩০৪—১৩) হলেও ইটালীয় ভাষায় কবি দান্তে বা ট্যাসোও সনেটের বিশেষ সমর্থ শিল্পী ছিলেন। ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সনেট রচয়িতাদের নাম আগেই করা হয়েছে, যদিও এই ধরনের কবিতা রচনায় ওয়াট এবং সারেকে পথিকৃতের সম্মান দেওয়া যায়। পরবর্তীকালে জন কীট্‌স্‌, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতি অনেকেই প্রথম শ্রেণীর সনেট রচনা করেন।

বাংলা সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তবে এর শ্রেষ্ঠ শিল্পী নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেই কারণে মধুসূদনের কৃতিত্বকে ছোট করা যায় না। তিনি যে বাংলা সনেটের পথিকৃৎ তাই শুধু নয়, সেগুলি প্রায়ই সার্থক সনেটের আদর্শ হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সনেটগুলি পাওয়া যাবে তাঁর 'চৈতালি' ও 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে। সনেট নিয়ে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষাও তিনি করেছেন। সাধারণত তানপ্রধান বা মিশ্র কলাবৃত্ত রীতিতেই সনেট রচনা করা হয়, কিন্তু তিনি ধ্বনিপ্রধান বা কলাবৃত্ত এবং শ্বাসাঘাত প্রধান বা দলবৃত্ত রীতিতেও যে সনেট রচনা করেছেন, যথাক্রমে 'খাপছাড়া' কাব্যগ্রন্থের 'পাবনায় বাড়ি হবে, গাড়ি গাড়ি ইঁট কিনি' এবং 'আকাশ প্রদীপ' কাব্যগ্রন্থের 'অন্ধকারের সিন্ধুতীরে একলাটি ওই মেয়ে' কবিতাদুটি তার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় (দৃষ্টান্ত সংগ্রহ : শ্রীআনন্দমোহন বসু)। রবীন্দ্রনাথ পেত্রার্কীয় এবং শেক্সপীরীয় কোন রীতিই সঠিকভাবে মানেন নি, 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে কিছু আঠারো হরফের সনেটও রচনা করেছেন ; কিন্তু তাঁর হাতে সনেট যে উপভোগ্য উৎকর্ষ লাভ করেছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

রবীন্দ্রনাথের আগে ও পরেও সনেটের চর্চা হয়েছে বাংলা কবিতায় এবং উৎকর্ষের বিচারেও তার মান খারাপ নয়। দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোকগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থে

বেশ কিছু উৎকৃষ্ট সনেট আছে, অক্ষয়কুমার বড়ালের সনেটগুলিও পড়তে ভাল লাগে। রবীন্দ্রনাথের পর যাঁরা সনেট রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ' কাব্যগ্রন্থ। অন্যান্যদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

ঙ. একটি সনেটের বিশ্লেষণ

সনেটের যেসব আঙ্গিক ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল সেগুলির সাহায্যে একটি বাংলা সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা বিচার করে দেখা যেতে পারে। বাংলা চতুর্দশপদী কবিতার পথিকৃৎ মধুসূদন দত্তের একটি সনেটই আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হল।

কপোতাক্ষ নদ

সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে। ক
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ; খ
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে ক
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে খ
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে !— ক
বহুদেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে, খ
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ? খ
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে ! ক
আর কি হে হবে দেখা ?—যত দিন যাবে, গ
প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে ঘ
বারি-রূপ কর তুমি ; এ মিনতি, গাবে গ
বঙ্গজ-জনের কানে, সখে, সখা-রীতে ঘ
নাম তার, এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে গ
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে। ঘ

[মিলের সূত্র : ক = অনে, খ = অলে, গ = আবে, ঘ = ইতে।]

প্রথমে রূপকৃতির বিচার। এটি চোদ্দ পংক্তির কবিতা এবং প্রত্যেকটি পংক্তিতেই চোদ্দটি করে হরফ আছে। তানপ্রধান বা মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির কবিতা এবং

পর্ববিভাগ আট-ছয় বলে (অর্থাৎ পয়ার বলে) প্রত্যেকটি পংক্তির মাত্রাসংখ্যাও চোদ্দ।

অষ্টক এবং ষটকের বিভাগ কবি এখানে যে রক্ষা করেছেন, মিল এবং কবিতার বক্তব্য বিচার করলেই তা বোঝা যাবে। এই কবিতার প্রথম আট পংক্তির মিল এইরকম—কখকখ, কখখক এবং পরবর্তী ছয় পংক্তির মিল এইরকম—গঘ, গঘ, গঘ। অর্থাৎ মিলের দিকে লক্ষ রাখলে বলতে হয় মধুসূদন প্রধানত ধ্রুপদী রীতিই অনুসরণ করেছেন, কেবল অষ্টকের প্রথম চার পংক্তি শেক্‌স্‌পীরীয় রীতির। এখানে অবশ্য চতুষ্ক বা ত্রিপদিকার কোন বিভাগ করা হয়নি।

বক্তব্যের দিক থেকে বিচার করলে এই সনেটে পেত্রার্কীয় রীতির স্পষ্ট অনুসরণ লক্ষ করা যায়, যদিও এই কবিতার বিষয় প্রেম নয়, কবির গৃহাগত প্রাণ বা নস্টালজিয়াই এই কবিতার উপজীব্য। কবি প্রথম আট পংক্তিতে অর্থাৎ অষ্টক অংশে কপোতাক্ষ নদের কেবল প্রশংসাই করে গিয়েছেন এবং এই কপোতাক্ষ নদের তীরে নিজের জন্ম বলে যেন নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। অথচ ষটক অংশে স্পষ্ট কবির মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে, তিনি এখানে অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে এই নদের সঙ্গে আর কখনো তাঁর দেখা হবে না, তাই তিনি যেমন এই কপোতাক্ষের প্রশস্তি রচনা করছেন, তেমনি মিনতি করেছেন কপোতাক্ষ নদও যেন চিরদিন তাঁর নাম মানুষকে স্মরণ করায়।

'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় অষ্টক-ষটকের বিভাগ থাকলেও একটি অখণ্ড ভাবই সেখানে ব্যক্ত হয়েছে। যে নদীর তীরে কবির জন্ম, ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে চলে এসে তার প্রতি কবি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। একদিকে যেমন ফুটেছে এই নদের প্রতি কবির প্রগাঢ় ভালবাসা, অন্যদিকে তার প্রতি বিচ্ছেদের বেদনা—কিন্তু সব মিলিয়ে কবির প্রবাসী চিত্তের বিক্ষোভই এখানে সনেটের সংহতি লাভ করেছে।

কবিতাটিতে ভাবের গভীরতা ও আন্তরিকতা আমরা যেমন অনুভব করি তেমনি এর ভাষার ঐশ্বর্যও চোখে পড়ার মতো। কপোতাক্ষ নদ যে প্রতিক্ষণে কবির স্মৃতিকে আর্দ্র করে রেখেছে সে কথা বোঝাবার জন্য তিনি প্রথম তিনটি পংক্তিতেই প্রথমে ব্যবহার করেছেন 'সতত' শব্দটি। এ ছাড়া একটি সাঙ্গরূপক 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্ম-ভূমি-স্তনে' এবং একটি সুচারু পরম্পরিত রূপক এই কবিতার সম্পদ—'যতদিন যাবে, / প্রজারূপে রাজরূপ সাগরেরে দিতে / বারিরূপ কর তুমি ;'

একটি সীমিত আকারের বন্ধন স্বীকার করে নিয়েছেন বলে মধুসূদন এই সনেটে তাঁর নস্টালজিয়ার বেদনা বিস্তারিত করার সুযোগ পাননি এ কথা ঠিক, কিন্তু তার জন্য তাঁর মনোবেদনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এখানে ঘটেনি, এমন কথাও বলা যাবে না।

চ. অন্যান্য আকৃতিমূলক বিভাগ

প্রধানত ফরাসী সাহিত্যের অনুকরণে ইংরেজি সাহিত্যে আকৃতিমুখ্য কয়েক ধরনের কবিতার প্রচলন হয়, এদের মধ্যে **ট্রায়োলেট র‍্যঁদো, র‍্যঁদেল, ফাবলো** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলায় এই সব রূপকৃতির চর্চা বিশেষ হয়নি, কেবল ট্রায়োলেট সামান্য কিছু লেখা হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্য থেকে পাওয়া লিমেরিকও বাংলা কবিতায় জনপ্রিয় হয়েছে, সুতরাং সে দুটি প্রকারভেদের সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে। এর সঙ্গে পত্রকাব্য নামে এক ধরনের দীর্ঘ কবিতার আলোচনাও আমরা এখানে করে নিতে চাই, কারণ এখানেও আকৃতিটাই প্রাধান্য পায় এবং প্রকৃতির দিক থেকে মন্ময় হলেই তার আস্বাদ বাড়ে বেশি।

ট্রায়োলেট

ট্রায়োলেট (Triolet) বা তেপাটি মোট আট পংক্তির কবিতা। এর অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল এইরকম—কখ, কককখ, কখ। এর মধ্যে আবার চতুর্থ পংক্তিতে প্রথম পংক্তির, সপ্তম পংক্তিতে প্রথম পংক্তির এবং অষ্টম পংক্তিতে দ্বিতীয় পংক্তির প্রায় অনুবৃত্তি করা হয়। অবশ্য অন্তর্নিহিত ভাব বিশ্লেষণ করলে অনুবৃত্তিগুলিও বিভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জনা করে। বীরবল রচিত একটি তেপাটি কবিতার উদাহরণ দেওয়া হল—

উষা আসে অচল শিয়রে ক
তুষারেতে বাঁধিয়া চরণ। খ
স্পর্শে তার ভুবন শিহরে ক
উষা হাসে অচল শিয়রে ক
ধরে বুকে নীহারে শীকরে ক
সে হাসির কনক বরণ। খ
বসো সখি মনের শিয়রে ক
হিম-বুকে রাখিয়া চরণ। খ

লিমেরিক

এর কোন বাংলা নাম আমরা পাই না, যদিও আধুনিক কবিদের মধ্যে অনেকেই লিমেরিক লিখেছেন। অন্নদাশংকর রায়ের বেশ উপভোগ্য কিছু লিমেরিক আছে।

এটি পাঁচ পংক্তির ছোট কবিতা, সাধারণত রচিত হয় কোন লঘু বিষয় নিয়ে

অর্থাৎ হাস্যপরিহাসের উদ্দেশ্যেই এই কবিতা রচনা করা হয়। এই কবিতার অন্ত্যমিলের ছক এইরকম—ককখখক, অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তির মিল একরকম, তৃতীয়-চতুর্থ পংক্তির মিল অন্যরকম, আবার পঞ্চম বা শেষ পংক্তিটির মিল থাকে প্রথম পংক্তির মতই।

ইংরেজি কবিতায় প্রচুর প্রথম শ্রেণীর লিমেরিক আছে। একটু পুরণো কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'বুক অব ননসেন্স' রচয়িতা এডোয়ার্ড লিয়ার। রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া'য় এই ধরনের কিছু কবিতা আছে, সেখান থেকেই একটি উদাহরণ দেওয়া হল—

হাত দিয়ে পেতে হবে কী তাহে আনন্দ— ক
হাত পেতে পাওয়া যাবে সেটাই পছন্দ। ক
আপিসেতে খেটে মরা খ
তার চেয়ে ঝুলি ধরা খ
ঢের ভালো—এ কথায় নাই কোনো সন্দ। ক

এখনকার দিনের একটি উপভোগ্য লিমেরিকও উল্লেখ করা হল—

কঞ্জুষ বুড়ো বসে গাছে
পাখিদের বলে, 'আয় কাছে—
তোরা যদি ঠুকরিয়ে
দাড়িগুলো নিস নিয়ে,
নাপিতের খরচাটা বাঁচে।'

(সত্যজিৎ রায়)

লিপিকবিতা

লিপিকবিতা (Epistle) একটি বিশেষ আকৃতির গীতিকবিতা। কবির মনের কল্পনা পত্রাকারে প্রকাশিত হয় এতে। রোমের কবি হোরেস এই আকৃতির কবিতার উদ্গাতা বলা যায়। অবশ্য এর একটি বিশিষ্ট শাখা পত্রকাব্য রচনার পথিকৃৎ ইতালির কবি ওভিদ। তাঁর 'বীরাঙ্গনা পত্র' বা 'হেরোয়িদেস'-ই মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' প্রেরণা। এই ধরনের কাব্যে অবশ্য কাব্যগুণই যথেষ্ট নয়, তার সঙ্গে নাট্যগুণেরও প্রয়োজন হয়। সেইজন্য এই ধরনের কাব্য যেকোন ভাষাতেই খুব বেশি রচিত হয় না।

তবে লিপিকবিতা বা পত্রের আকারে লেখা কবিতা সব ভাষাতেই অল্পবিস্তর আছে। ইংরেজি সাহিত্যে পোপের 'Eloisa to Abelard' এর উল্লেখযোগ্য

উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ এরকম কিছু কবিতা রচনা করেছেন। অন্যান্যদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'পুরীর চিঠি', রাধারাণী দেবীর 'পরিণীতার পত্র' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

লিপিকবিতা বা পত্রকাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিঃসন্দেহে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। মোট এগারোটি পূর্ণ পত্র ছাড়াও কিছু অসমাপ্ত পত্র আছে এতে। প্রত্যেক পত্রেরই লেখিকা পৌরাণিক নায়িকা, যদিও তাদের অভিযোগ, অনুরাগ প্রভৃতি মধুসূদনেরই কল্পিত। রবীন্দ্রনাথের গদ্য প্রবন্ধ 'কাব্যে উপেক্ষিতা'-য় যে ধরনের কল্পনার উষ্ণতা আমরা লক্ষ করি তার সঙ্গেই এই কল্পনাঋদ্ধ উষ্ণ হৃদয়ানুভূতির তুলনা করা যায়। যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিকতায় তারা সজীব তাতে এই আঙ্গিকের সঙ্গে কবিকল্পনার মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে বলা যায়।

ক. সাধারণ শ্রেণীবিভাগ—আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বিভাগ। খ. ব্যালাড—ব্যালাডের উৎপত্তি ও রূপান্তর—ব্যালাডের কিছু প্রধান লক্ষণ—প্রাচীন ব্যালাড—আধুনিক ব্যালাড—বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক ব্যালাড। গ. আখ্যান কাব্যের কয়েকটি ধারা—মঙ্গলকাব্যের সংজ্ঞা—মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য—মঙ্গলকাব্যের গঠন। রূপক কাব্য—বাংলা রূপক কাব্য। নীতি কবিতা—ইংরেজি ও বাংলা নীতি কবিতার দৃষ্টান্ত। ব্যঙ্গ কবিতা—ব্যঙ্গ কবিতার উদ্ভব—ইংরেজি ও বাংলা ব্যঙ্গ কবিতা। ঘ. মহাকাব্য—মহাকাব্যের বিভিন্ন বিভাগ—মহাকাব্য সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলংকারিকদের আলোচনাক্রমে মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণসমূহ: তন্ময়তা, আদিমতা, জাতীয়তা, সারল্য, বিষয়বৈশিষ্ট্য, অবলম্বিত প্রধান রস, বৃত্তগঠন ও আঙ্গিক, নায়ক বিচার, ভাষাবৈশিষ্ট্য। ঙ. একটি আদি মহাকাব্যের আলোচনা—রামায়ণ মহাকাব্যের লক্ষণভিত্তিক পর্যালোচনা। চ. সাহিত্যিক মহাকাব্য—সাধারণ পরিচয়—সাহিত্যিক মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণসমূহ: বিষয়, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি, পরিশীলিত ও জটিল, চরিত্র-চিত্রণ, একক সৃষ্টি, আত্মপ্রক্ষেপ, স্বাধীনতা ও ভাষাবৈশিষ্ট্য। ছ. একটি সাহিত্যিক মহাকাব্যের বিশ্লেষণ—মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-কে সাহিত্যিক মহাকাব্যের আলোকে বিচার॥ জ. নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য—এদের পরিচয় ও পার্থক্য—কাব্যনাট্যের বিশেষ লক্ষণ ও উদ্ভবরহস্যের আলোচনা—ইংরেজি ও বাংলা কাব্যনাট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়॥ ঝ. নাটকীয় একোক্তি—এর পরিচয়—ইংরেজি ও বাংলা নাটকীয় একোক্তির কিছু দৃষ্টান্ত॥

ক. সাধারণ শ্রেণীবিভাগ

যে কোন কবিতাতেই কবির উপস্থিতি অনুভব করা যায়, অর্থাৎ কবির মানসিকতা এবং তাঁর অনুভূতির উষ্ণতাতেই তা সজীব হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও আমরা কবিতাকে যখন মন্ময় ও তন্ময় এই দুটি ভাগে বিভক্ত করি তখন সাধারণভাবে এটাই লক্ষ রাখি, কোথায় কবির অনভূতি ও আত্মময়তাই আমাদের প্রধান উপভোগ্য এবং কোথায় বিষয়ের মূল্যও মোটেই উপেক্ষা করবার নয়।

তন্ময় বা objective কবিতার প্রধান ভাগ আকৃতিগতভাবে হতে পারে দীর্ঘ কবিতা বা আখ্যানমূলক কবিতা এবং খণ্ড কবিতা; এর প্রকৃতিগত ভাগ হতে পারে বর্ণনামূলক কবিতা ও নাটকীয় কবিতা। আখ্যানমূলক কবিতার অনেকগুলি উপবিভাগ আমরা দেখতে পাই—পাশ্চাত্য সাহিত্যে ব্যালাড হিসাবে কথিত আখ্যান যেমন এর মধ্যে পড়তে পারে, তেমনি মহাকাব্যও অবশ্যই আখ্যানমূলক কবিতার শ্রেণীভুক্ত হবে। বাংলা সাহিত্যে আখ্যানমূলক কবিতার সামান্য হলেও কিছু বৈচিত্র্য আছে, কারণ সাহিত্যের মাধ্যম হিসাবে গদ্যের ব্যবহার অনেক বিলম্বে হওয়ায় আমরা মঙ্গলগাথাও যেমন পদ্যেই রচনা করেছি—ময়মনসিংহ গীতিকার মতো

লৌকিক গাথাও তেমনি লিখেছি পদ্যে, এমনকি 'চৈতন্যভাগবত' বা 'শ্রী শ্রী চৈতন্য-চরিতামৃত'-এর মত তাত্ত্বিক গ্রন্থও তাই। নাটকীয় কবিতার ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্যে সেরকম প্রাচীন নয়, তবে ঊনবিংশ শতকে নতুন করে মহাকাব্য রচনার প্রয়াস দেখা দিলে তাদের ব্যঙ্গ করে যেসব ছদ্ম মহাকাব্য লেখা হয়েছে তার মধ্যে নাটকীয়তা নিশ্চয়ই আছে।

এই ধরনের নাটকীয়তা খণ্ডকবিতাতেও আছে। কোন বিশেষ কবি বা কবিতাকে ব্যঙ্গ করে লেখা কবিতা অনেক ক্ষেত্রেই নাটকীয় হয়ে উঠেছে, অথবা কবিতায় নাট্যরস সৃষ্টির তাগিদেও কবিরা কখনও এই জাতীয় কবিতা লিখেছেন। তন্ময় খণ্ডকবিতার মধ্যে গীতিকবিতারও একটি স্থান আছে।

বাংলা তন্ময় কবিতার মধ্যে প্রধান হিসাবে বিবেচ্য হওয়া উচিত মহাকাব্য ও অন্যান্য আখ্যান কাব্য। এদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিষয়ে আমাদের আলোচনা বিশদ করা হবে, অন্যান্য রূপগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই এই গ্রন্থের পক্ষে সংগত হবে বলে মনে করি।

খ. ব্যালাড

'ব্যালাড' শব্দটি এসেছে ইতালীয় 'বালারে' শব্দ থেকে, যার মানে নাচা; কাজেই উৎপত্তির সময় অন্তত ব্যালাড-এর সঙ্গে নৃত্যের একটা সংযোগ ছিল নিশ্চয়ই। আধুনিক কালেও জনপ্রিয় নৃত্যানুষ্ঠান ব্যালে (ballet) এ থেকেই এসেছে। সুতরাং আখ্যান, নৃত্য এবং গান—এই নিয়েই ব্যালাড, অন্তত সূচনায় তাই ছিল। বাংলায় এই ধরনের আখ্যানকাব্যকে গাথাকবিতা নাম দেওয়া যেতে পারে।

সমালোচক হাডসন যেভাবে ব্যালাডের পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাকেই বলতে হয় সবচেয়ে প্রাচীন কাব্যকলা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে সমস্ত সাহিত্যে, এ কথা যদি সত্য হয় তবে একে বলতে হয় লোকসাহিত্য বা লোক-আখ্যান ধরনের কবিতা। লোকসাহিত্যের সঙ্গে নৃত্যের একটা সম্পর্ক ছিল এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাগাধুনিক যুগে সবই ছিল সংগীত, এ দুটি কথা স্মরণ রাখলে বাংলা লোকসাহিত্যকেও ব্যালাড ধরনের রচনা বলা চলতে পারে অনায়াসেই।

অবশ্য সেইসঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে 'ব্যালাড' কথাটিই এমন এক সুনির্দিষ্ট পরিভাষায় পরিণত হয়েছে যে ঠিক লক্ষণ মিলিয়ে কোন বিশেষ সাহিত্য এর অন্তর্ভুক্ত করতে যাওয়া ঠিক হবে না। আবার একই সঙ্গে পৃথিবীর

প্রাচীনতম গাথাকেও ব্যালাড বলা কিছুটা বিভ্রান্তিকর হবে।* তাই প্রথাগত ভাবে যাকে ব্যালাড বলে তাকেই ব্যালাড হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে আমাদের বলতে হবে মধ্যযুগে ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অজ্ঞাতনামা রচয়িতাদের হাতে যেসব গাথাকবিতা লেখা হয়েছিল, একই সঙ্গে নাটকীয় অথচ লিরিক অনুভূতিসম্পন্ন এইসব কবিতাকে সাধারণভাবে বলা হয় ব্যালাড। জীবনের একেবারে মৌলিক দিকগুলিই ছিল এর বিষয়বস্তু। যেমন খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হতো যুদ্ধবিগ্রহ এবং রোমাঞ্চকর কার্যকলাপের ঘটনার ওপর। উদ্ভট কাণ্ডকারখানা এবং অলৌকিক ব্যাপারের প্রতিও আগ্রহ বিশেষ কম ছিল না। অবশ্য তাই বলে প্রেম, করুণা, দুঃখ-শোক—এইসব কোমল অনুভূতিও সেখানে বর্জিত হতো না। আমাদের আজকের রুচি এবং সাহিত্যবোধ নিয়ে এইসব রচনা বিচার করতে গেলে সেগুলি হয়তো আমরা উপভোগ করতে পারবো না, কারণ জীবনের সেই সহজ-সরল ছন্দ এবং বিশ্বাসের জোর আমরা এখন অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছি। জীবন যখন মৌলিক বৃত্তিগুলির দ্বারাই চিহ্নিত হতো সেই সময়ে ফিরে যেতে না পারলে এই জাতীয় রচনা উপভোগ করা সহজ হবে না।

ব্যালাডের কতকগুলি স্থূল বৈশিষ্টা এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ রাখতে পারি। প্রথমত ও প্রধানত, ব্যালাডে থাকে এক শিশুসুলভ সারল্য—জীবনের সহজ ও মৌলিক বৃত্তিগুলিই প্রায় নির্বিচারে সেখানে স্থান পায়।

দ্বিতীয়ত, কাহিনীর নাটকীয়তা সেখানে খুব বেশি। শিশুসুলভ সারল্যের জন্যই সম্ভবত নাটকীয় উপাদান সেখানে প্রচুর ব্যবহার করা হয় এবং বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রতি বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে শ্রোতা ও পাঠক তা উপভোগ করেন। একটি নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি, তা থেকে উদ্ধার পাওয়া এবং তার পরেই আর একটি নাটকীয় উত্তেজনা—এই রকম রুদ্ধশ্বাস গতির সৃষ্টি করে কাহিনী এগিয়ে চলে।

নৈর্ব্যক্তিকতা ব্যালাডের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। যে-কোন ব্যালাডই একটি বিশেষ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করে। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের কথাও যেমন সেখানে বিশেষ থাকে না, ব্যক্তিগত মানসিকতাও সেখানে তেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। অধ্যাপক সিজউইকের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"The first and foremost quality about Ballad is not its personality, but its impersonality."

* কথাটা স্পষ্ট করবার জন্য বলা যায় দেবদেবীর মাঙ্গল্য রচনার জন্য লিখিত এক ধরনের কাব্যই বাংলায় 'মঙ্গলকাব্য' হিসাবে পরিচিত। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদা মঙ্গল' দেবী সারদারই স্তুতি এবং পাঁচ সর্গে এর কাহিনী বিন্যস্ত। তা সত্ত্বেও, এমনকি নামকরণে 'মঙ্গল' উল্লেখ করা থাকলেও, একে আমরা মঙ্গলকাব্য বলতে পারবো না, গীতকবিতাই বলবো।

ব্যালাডের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, তার ছন্দ। ব্যালাডের প্রতি পংক্তিতে থাকে সাতটি শ্বাসাঘাত, অর্থাৎ সাতবার সেখানে ঝোঁক পড়ে। অবশ্য আধুনিক ব্যালাডে এত দীর্ঘ পংক্তি রক্ষিত হয়নি—সেটি চার ও তিন শ্বাসাঘাতসম্পন্ন দুটি পংক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ইংরেজি সাহিত্যে প্রথাগত এই মধ্যযুগীয় ব্যালাড প্রচুর রচিত হয়েছিল এবং তা প্রচুর জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। এই জাতীয় প্রাচীন ব্যালাডের প্রথম উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ পার্সি-র Reliques of Ancient English poetry. এক হিসেবে এটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থও বটে। এরপরেও অবশ্য এই ধরনের সংকলনগ্রন্থ আরো প্রকাশিত হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখ করার মত অধ্যাপক এফ্. জে. চাইল্ডের বিশাল কীর্তি।

প্রথাগত ব্যালাডের আদর্শেই আধুনিককালে বেশ কিছু ব্যালাড রচিত হয়েছে। 'সাহিত্যিক মহাকাব্যের' মত তাদের আমরা সাহিত্যিক ব্যালাড হিসাবেই অভিহিত করি। মধ্যযুগীয় ব্যালাডের প্রথম সংকলক পার্সি নিজেও এই ধরনের ব্যালাড রচনা করেছেন। সমালোচকগণ বলেন, তাঁর সার কলিনকে নিয়ে লেখা আখ্যান কবি কোলরিজকে তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যিক ব্যালাড 'ক্রিস্টাবেল' রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিল। ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ এবং হার্ডি থেকে শুরু করে কোলরিজ, কীট্‌স্‌, রসেটি প্রভৃতি অনেকেই আধুনিক ব্যালাড লিখেছেন। কোলরিজের The Ancient Mariner বা Kubla Khan, কীট্‌সের La Belle Dame Sans Merci কিংবা রসেটির The King's Tragedy ব্যালাড হিসাবেও যেমন উপভোগ্য, কবিতা হিসাবেও তাই। তবে মধ্যযুগের ব্যালাডের মত নৈর্ব্যক্তিকতা এইসব দীর্ঘ কবিতায় আশা করা সংগত হবে না।

বাংলা সাহিত্যের প্রথাগত ব্যালাড 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'-র কথাই প্রথমে মনে হয়। বহু কবির মুখে মুখে রক্ষিত এইসব গাথা ও গীতিকা উদ্ধার করেন দীনেশচন্দ্র সেন। একদিকে যেমন এখানে লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ পাই, অন্যদিকে পাই নাটকীয়তা ও লৌকিক প্রেমের রোমাঞ্চ। মধ্যযুগীয় ইংরেজী ব্যালাডে রবিনহুডের যে কাহিনী পাওয়া যায়, আমাদের এখানেও সেরকম রঘু ডাকাত বা বিশে ডাকাতের কাহিনী মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। খগেন্দ্রনাথ মিত্র এইসব কাহিনী অবশ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের মধ্যে ধর্মমঙ্গলের লাউসেন-রঞ্জাবতীর কাহিনী বা নাথ সাহিত্যের মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনীও কিছুটা ব্যালাডের লক্ষণাক্রান্ত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিক ব্যালাড বলতে প্রথমেই মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী'-র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গাথা কবিতার কথা যাদের অনেকগুলির কাহিনী ছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist Literature in Nepal, সেনার সম্পাদিত 'মহাবস্তু' এবং অ্যাকোয়ার্থ সম্পাদিত Marathi

Ballads'। এছাড়া কবি নজরুল ইসলামের 'শাত্-ইল আরব', কুমুদরঞ্জন মল্লিকের "শ্রীধর', জসীমউদ্দিনের 'নক্সীকাঁথার মাঠ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গ. আখ্যান কাব্য: কয়েকটি প্রকরণ

ব্যালাড অবশ্যই এক ধরনের আখ্যান কাব্য, কিন্তু আখ্যানধর্মী কাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব ও বৈচিত্র্য মহাকাব্যের। মহাকাব্য আলোচনার পূর্বে আমরা অন্যান্য ধরনের কিছু আখ্যান কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিতে পারি।

মঙ্গলকাব্য ঃ

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক বিশাল কালপর্ব অধিকার করে আছে মঙ্গলকাব্য। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এ বিষয়ে প্রথম নিষ্ঠ গবেষক শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, "আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণীর ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য প্রচলিন ছিল, তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। বাংলার পল্লীর জনসভায় ইহার উদ্ভব হইলেও শেষ পর্যন্ত রাজসভায় ইহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।"

এই সংজ্ঞাটি পরীক্ষা করলেই আমরা মঙ্গলকাব্যের প্রায় সব কটি বৈশিষ্ট্যেরই সাক্ষাৎ পাই। প্রথমত এর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে শ্রীভট্টাচার্য যা বলেছেন তা মোটামুটি ভাবে সত্য। এর আদিসীমা ঠিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক কিনা বলা শক্ত কারণ মঙ্গলকাব্যের আদি কবি তাঁদের বলা হয় (যথা মনসামঙ্গলের কবি কানা হরিদত্ত) তাদের কারো কারো রচনা পাওয়া যায়নি, কিন্তু পরবর্তীকালে 'মঙ্গল' নামধেয় কিছু কাব্য রচিত হওয়া সত্ত্বেও 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরকেই মঙ্গল কাব্যধারার শেষ উল্লেখযোগ্য কবি মনে করা হয়।

দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মৌলিক আখ্যানকাব্য বলতে মঙ্গলকাব্যের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশি বলে আমাদের মনে হয়। অন্যান্য আখ্যান কাব্যের বেশির ভাগই ছিল অনুবাদমূলক—এ কথা রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ সম্বন্ধে যেমন প্রযোজ্য, ভাগবতের অনুবাদ সম্বন্ধেও তেমনি প্রযোজ্য।

তৃতীয়ত, মঙ্গলকাব্য যে ধর্মবিষয়ক সেকথাও অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই, কারণ দেবদেবীর স্তুতির উদ্দেশ্যেই এই ধরনের কাব্য রচনা করা হতো। তবে ঈশ্বরস্তুতি থাকলেও এদের 'ওড্'-জাতীয় রচনা হিসাবে গ্রহণ করা যায় না, কারণ উভয়ের আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক পার্থক্য। কোন কোন সমালোচক

এদের যে মহাকাব্য হিসাবে অভিহিত করেছেন সে কথাও সমর্থন করা শক্ত, কারণ মহাকাব্যের প্রকৃতির সঙ্গে এদের মিল এতই অল্প যে 'রাঢ়ের মহাকাব্য' হিসাবে মঙ্গলকাব্যকে চিহ্নিত করার মধ্যে যুক্তির চেয়ে আবেগই আছে বেশি। তাছাড়া মূলত মঙ্গলকাব্য যে সংগীত একথা ভুলে গেলেও চলবে না।

চতুর্থত, লোকসাহিত্যের মতই যে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শিষ্ট সাহিত্য বর্তমানে এই শ্রেণীর কাব্যকে গ্রহণ করেছে, কবি মুকুন্দ ও ভারতচন্দ্র যথাক্রমে ভূস্বামী এবং রাজার আনুকূল্য লাভ করেছিলেন—কিন্তু এর উদ্ভব যে লোক-গোষ্ঠীর মধ্যে তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। দেবদেবীদের উগ্র প্রকৃতি দেখলেই সে কথা বোঝা যায়। এখনও নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে সর্পপূজা (মনসা দেবী), চণ্ডীদেবীর পূজা বা ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন আছে।

মঙ্গলকাব্যের প্রধান দেবদেবী ছিলেন তিনজন—চণ্ডী, মনসা এবং ধর্ম। সেই অনুসারে চণ্ডীমঙ্গল (পরবর্তীকালে চণ্ডীদেবীর পরিবর্তিত রূপ অন্নপূর্ণা বা অন্নদাকে নিয়ে অন্নদামঙ্গল), মনসামঙ্গল (বা মনসার ভাসান) এবং ধর্মমঙ্গলের সুস্পষ্ট ধারা সৃষ্ট হয়েছে। ডঃ সুকুমার সেন 'রায়মঙ্গল' নামে আর একটি ধারার উল্লেখ করলেও তাকে মঙ্গল কাব্যের প্রধান ধারা কখনোই বলা যাবে না। মনসামঙ্গলের কবিদের মধ্যে বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব, বিপ্রদাস পিপিলাই প্রভৃতি; চণ্ডীমঙ্গলের কবিদের মধ্যে দ্বিজ মাধব, কবিকঙ্কন মুকুন্দ প্রভৃতি এবং ধর্মমঙ্গলের কবিদের মধ্যে রূপরাম, ঘনরাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রায়মঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম দাসও উল্লেখ করবার মত কবি।

মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে তার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি। প্রথমত, মঙ্গলকাব্যের গঠনে একটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। এর প্রধান খণ্ড দুটি—দেবখণ্ড ও মানবখণ্ড। দেবখণ্ডে দেবতাদের কথা থাকে এবং মানবখণ্ডে থাকে সেই দেবদেবীর মধ্যে যাঁরা শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে লীলা করছেন তাঁদের কথা। দৃশ্যত চারটি খণ্ডে মঙ্গলকাব্য বিভক্ত—বন্দনা খণ্ড, গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড এবং মানবখণ্ড। বন্দনাখণ্ডে থাকে দেবদেবীর বন্দনা—যে দেব বা দেবীর প্রশস্তি রচনা করা হচ্ছে তিনি তো বটেই, তাছাড়াও আরো অনেক দেবদেবীর। গ্রন্থোৎপত্তির কারণ খণ্ডে দেবতা বা দেবীর আশীর্বাদ ও স্বপ্নাদেশই যে কাব্যরচনার কারণ সে কথা বলা হয় এবং কবি তাঁর আত্মপরিচয়ও এখানে দান করেন। দেবখণ্ডে সেই অভিশাপের কথা বর্ণিত হয় যার জন্য দেবতা বা দেবীকে মর্তেই জন্মগ্রহণ করতে হবে। মানবখণ্ডে থাকে মর্ত্যধামে তাঁদের লীলা।

দ্বিতীয়ত, কতকগুলি বিষয় মঙ্গলকাব্যে থাকবেই, যেমন—বার মাসের দুঃখের

কাহিনী বা বারমাস্যা, চৌতিশা স্তুতি, নারীদের পতিনিন্দা, রান্না ও খাওয়ার বিস্তৃত বর্ণনা, ফুলফল ও পশুপাখির আলোচনা প্রভৃতি।

তৃতীয়ত, গ্রন্থোৎপত্তির কারণের মধ্যে কবির তৎকালীন সমাজ, তখনকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের কাছে এইসব তথ্যসূত্র অতি মূল্যবান।

চতুর্থত, মূলত দেবদেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য হলেও মঙ্গলকাব্যে মানুষের চরিত্রও অত্যন্ত সুচারুভাবে অঙ্কিত হয়েছে। ফলে চাঁদ সদাগরের দৃপ্ত ও অনমনীয় ব্যক্তিত্ব, সনকার সকরুণ মূর্তি, ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারি শীলের চাতুর্য ও খলতা প্রভৃতি অত্যন্ত ভালভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

● রূপক কাব্য

রূপক কাব্য যে খণ্ড কবিতা হতে পারে না এমন কথা নয়,. আবার রূপক যে কবিতার মাধ্যমেই সৃষ্ট হতে পারে এমনও নয়—রূপক নাট্য, রূপক কথাসাহিত্য এবং লোককথাও আমরা প্রচুর দেখতে পাই, তবে কাহিনীমূলক কাব্যের প্রায় একটি স্বতন্ত্র ধারা ইংরেজি সাহিত্যে স্বীকৃত হয়েছে। বিশেষ কাহিনীধর্মী কাব্যের একটি আপাত অর্থের অন্তরালে যখন অন্য কোন গভীর অর্থের ইঙ্গিত থাকে, তখন তাকে বলা হয় রূপক কাব্য। ইংরেজি সাহিত্যে এর বেশ কিছু বিভাগ আছে, যেমন—আধ্যাত্মিক বা ধর্মমূলক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি। প্রথম ধরনের রূপক কাব্যের মধ্যে The Hind and the Panther, দ্বিতীয় ধরনের মধ্যে Piers the Plowman এবং তৃতীয় ধরনের মধ্যে Absalom and Achitophel উল্লেখযোগ্য।

বাংলা সাহিত্যের একেবারে আদি নিদর্শন চর্যাপদ খণ্ডকবিতা হলেও তাকে অনায়াসে রূপকধর্মী কবিতা বলা যায়। ইংরেজিতে যেভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তাতে একে আধ্যাত্মিক রূপক বলাই সংগত। আধুনিককালে রচিত আধ্যাত্মিক রূপকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-এর নাম করা যেতে পারে। আমাদের বাউল গান বা সুফী সংগীতও আধ্যাত্মিক রূপকের দৃষ্টান্ত। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক রূপকের উদাহরণ হিসাবে যথাক্রমে মোহিতলাল মজুমদারের 'আহ্বান' এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংসার-সমুদ্র'-এর নাম করা যায়।

● নীতি কবিতা

যে কবিতার উদ্দেশ্য জ্ঞানগর্ভ নীতি প্রচার করা তাকে আমরা নীতিকবিতা বলতে পারি। নীতিকবিতার সঙ্গে গীতিকবিতার ধ্বনিসাদৃশ্য থাকলেও, যে

কবিতার উদ্দেশ্য শুধুই নীতির প্রচার তাকে আমরা আদৌ কবিতা বলতে পারি কিনা সে বিষয়েই সন্দেহ আছে। কিন্তু ইংরেজিতে এই ধরনের কবিতাকেও স্বীকার করা হয়েছে বলে, এবং উপযুক্ত কবির হাতে নীতিকবিতাও যে কত উচ্চাঙ্গের কবিতা হতে পারে রবীন্দ্রনাথ 'কণিকা'-য় তার প্রমাণ দিয়েছেন বলে, আমরা একেও তন্ময় কবিতার একটি ধারা হিসাবে স্বীকার করে নিতে রাজি আছি। কারণ উদ্দেশ্যমূলক হয়েও সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে, কথাসাহিত্যে এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

ইংরেজিতে নীতিকবিতার উদাহরণ Alexander Pope-এর Essay on Criticism এবং বাংলায় এই জাতীয় কবিতার উদাহরণ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সম্ভাবশতক', রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীতিকুসুমাঞ্জলি,' রজনীকান্ত সেনের 'অমৃত', সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'মাদকমঙ্গল' প্রভৃতি।

● ব্যঙ্গ কবিতা

ব্যঙ্গাত্মক কবিতার একটি বিশেষ ধারা যে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যে গড়ে উঠেছে সে কথা স্বীকার করলে এই বিশেষ শ্রেণীটিকেও আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। ব্যঙ্গ কবিতার একটি প্রধান ধারা প্যারডি, (এর প্রতিশব্দ শ্রীশচন্দ্র দাশ করেছেন লালিকা) কিন্তু তাকে স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে স্বীকার করাই বাঞ্ছনীয়, কারণ যে-কোন সাহিত্যেই এই ধারা অত্যন্ত প্রবল। বিখ্যাত কবিমাত্রেরই প্যারডি রচনা করা হয়। ওয়র্ডস্ওয়র্থের Peter Bell-এর প্যারডি করেছিলেন শেলি 'Peter Bell The Third' নামে, সাদি-র 'A Vision of Judgement'-এর প্যারডি হিসাবে বিখ্যাত বায়রণের The Vision of Judgement', মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্যারডি জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য' বা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত-উদ্ধার কাব্য', রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে রচিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্যারডি 'আনন্দ-বিদায়' প্রভৃতি এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

সাধারণভাবে বলা যায় ব্যঙ্গ কবিতা বা Satire শব্দটি ল্যাটিন Satura Lanx শব্দ থেকে উদ্ভূত। গদ্য ও পদ্যমিশ্রিত চম্পু কাব্যে শ্লেষাত্মক ভঙ্গি থাকলে তাকে স্যাটায়ার নামে অভিহিত করা হতো। ব্যঙ্গ কবিতার প্রাথমিক উদ্দেশ্য অবশ্যই পাঠককে লঘু হাস্যরস বিতরণ করা, কিন্তু এর গভীরতর উদ্দেশ্য জাতি ও ব্যক্তিমানুষের চরিত্রের সংশোধন, সমাজের নানারকম অসংগতির প্রতি আমাদের সচেতন করা এবং আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি করা। এক হিসাবে নীতি-কবিতারও সেই একই কাজ, তবে ব্যঙ্গ কবিতায় তা লঘু রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে আসে বলে এর আবেদনও অনেকটা গভীর ও অব্যর্থ। বিখ্যাত ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে

নাম করা যায় Alexander Pope-এর The Dunciad, Dryden-এর Mac Flecknoe, রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গবীর', মোহিতলাল মজুমদারের 'দ্রোণ-গুরু' প্রভৃতি।

ব্যঙ্গ কবিতার একটি প্রধান ধারা প্যারডিকে যদি স্বতন্ত্র শাখা বলে মেনে নেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে ব্যঙ্গ কবিতার মোট বিভাগ তিনটি—সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যঙ্গ কবিতা। সামাজিক ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'অনাচার', রাষ্ট্রনৈতিক ব্যঙ্গ কবিতা হিসাবে উল্লেখ করা যায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নেভার—নেভার' এবং আধ্যাত্মিক ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে নাম করা যায় রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট্'-এর।

ঘ. মহাকাব্য

তন্ময় আখ্যানকাব্যের মহত্তম বিভাগটির নাম মহাকাব্য বা Epic। রচনাকালের দিক থেকে এই বিভাগ অন্যতম প্রাচীন, দীর্ঘ আখ্যানসম্বলিত এবং বস্তুনিষ্ঠ। মহাকাব্যকে সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠ হিসাবে অবশ্য স্বীকার করেননি বঙ্কিমচন্দ্র, 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে তিনি বলতে চেয়েছেন গীতিকবিতার মন্ময়তা এবং নাটকের বস্তুনিষ্ঠা, এই দুটি ব্যাপারের সমন্বয় ঘটেছে মহাকাব্যে—"মহাকাব্যের' বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত।"

অবশ্য এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যতাত্ত্বিক অ্যারিস্টটলও যেমন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Poetics-এ মহাকাব্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন, সংস্কৃত আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজও তাঁর 'সাহিত্য-দর্পণ'-এ মহাকাব্যের লক্ষণ নিয়ে চিন্তামূলক আলোচনা করেছেন। একথা অবশ্য ঠিক যে, ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্য, এবং অন্যান্য সাহিত্যেও মহাকাব্যের ধারা স্তব্ধ হয়ে যায়নি। অর্থাৎ আধুনিককালেও মহাকাব্য রচিত হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রাচীন মহাকাব্যের লক্ষণ অনেকটাই রক্ষিত হয়নি। প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রাচীন মহাকাব্য বিশেষ একজনের নামে প্রচলিত হলেও তা কখনই একক সৃষ্টি নয়; পক্ষান্তরে আধুনিক মহাকাব্য বিশেষ একজনেরই সৃষ্টি। ইংরেজিতে আদি মহাকাব্যকে বলা হয় Epic of growth এবং আধুনিক মহাকাব্যকে Epic of art বা Literary Epic আখ্যা দেওয়া হয়। আমরা আদি মহাকাব্যকে শুধু মহাকাব্য এবং আধুনিক মহাকাব্যকে সাহিত্যিক মহাকাব্য হিসাবে অভিহিত করতে পারি। অবশ্য একে 'আধুনিক মহাকাব্য' বলাও অসংগত নয়, কারণ এদের সাহিত্যিক মহাকাব্য বললে আদি মহাকাব্যের সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করা হয়। এখন

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষিগণ মহাকাব্য সম্পর্কে যে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন তা বিশ্লেষণ করে আদি মহাকাব্য ও আধুনিক মহাকাব্যের লক্ষণগুলি জেনে নেওয়া যেতে পারে।

মহাকাব্য সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল আলোচনা করেছেন তাঁর গ্রন্থের পঞ্চম, ত্রয়োবিংশ চতুর্বিংশ ও ষড়বিংশ অধ্যায়ে। বিক্ষিপ্ত ভাবে এই সব অধ্যায়ে এর যে আংশিক সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং অন্যান্য অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির সঙ্গে এর পার্থক্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, তা থেকে আমরা মহাকাব্যের কতকগুলি লক্ষণ লিপিবদ্ধ করতে পারি :

(১) (It is) an imitation of serious subjects in a grand kind of verse…in narrative form.

(২) (It) should be based on a single action, one that is a complete whole in itself, with a beginning, middle, and end, so as to enable the work to produce its own proper pleasure with all the organic unity of a living creature.

(৩) As for its metre, the heroic has been assigned it from experience.

[অনুবাদ ইনগ্রাম বাইওয়াটারের]

এই প্রক্ষিপ্ত উক্তিগুলি থেকে মহাকাব্যের সংজ্ঞা দেওয়া যায় এইভাবে : মহাকাব্য মিতছন্দে ও বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে রচিত গুরু বিষয়বস্তু আশ্রিত ও সুনির্দিষ্ট আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত এমন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আখ্যান, যার ঐক্যসম্বন্ধ হয় জৈবিক প্রকৃতির এবং প্রচুর বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যা উদ্দিষ্ট রসানুভূতি জাগাতে পারে।

আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং দণ্ডী মহাকাব্যের অনেক লক্ষণ বর্ণনা করলেও সঠিক সংজ্ঞা দেননি। বিশ্বনাথ কবিরাজ যা বলেছেন তা স্মরণ রাখলে অবশ্য এর লক্ষণ নির্ণয় সহজ হবে, তিনি বলেছেন—

"সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়োবাঽপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ ॥
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।
শৃঙ্গার-বীর-শান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে ॥
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্।
চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলং লভেৎ ॥"

এবার মহাকাব্যের লক্ষণ নির্ণয়ে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

প্রথমত, মহাকাব্য তন্ময় কবিতা। কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা

এখানে সম্পূর্ণ বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়। একটি বিস্তীর্ণ সময় ও এক সমগ্র জাতির যথাযথ দর্পণে পরিণত হওয়া উচিত মহাকাব্যের। একটি বিশেষ যুগ ও জাতির মুখপাত্র হয়ে ওঠে একটি মহাকাব্য।

দ্বিতীয়ত, মহাকাব্য যেকোন সাহিত্যেরই প্রায় আদি সৃষ্টি। অর্থাৎ এর প্রাচীনত্বই এর প্রথম লক্ষণ বলা যেতে পারে।

সমালোচক অ্যাবারক্রম্বি মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে এই প্রাচীনত্বের কারণটি বোঝা যাবে—"...poetry which seems an immediate response to some general and instant need in its surrounding community—such poetry is Authentic epic."

তৃতীয়ত, মহাকাব্য শেষপর্যন্ত একজনের হাতে কাব্যরূপ লাভ করলেও তাকে একক সৃষ্টি বলা যায় না। বহুদিন ধরে বহু কবির সংযোজনের ফলে বহু উপকাহিনী একটি মূল কাহিনীর ধারায় এসে মেশার ফলেই মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়। এইভাবে তার উৎপত্তিরহস্য সন্ধান না করলে সাহিত্যসৃষ্টির আদিযুগে মহাকাব্যের উদ্ভব বিস্ময়কর বলেই মনে হবে। আসলে লোকজীবনে বহু আখ্যানই মানুষের মুখে মুখে ফেরে বহুদিন থেকে। অনেক লোককবি বিভিন্ন গাথাও রচনা করে গেয়ে থাকেন দীর্ঘদিন থেকে। এইসব লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং গানই যে মহাকাব্যের মধ্যে সংহত রূপ লাভ করে, সে কথা এ নিয়ে যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন। রামায়ণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন; হাডসন বলেছেন সাধারণভাবে মহাকাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে এবং সুন্দর করে বলেছেন জেমস রীভ্‌স্‌ তাঁর প্যান পাইপার সিরিজের একটি ছোট বইয়ে—"...it may be taken as a bridge between the anonymous narrative poetry (like the ballads) and poems written by poets whose names are not known."

অবশ্য এ কথা বলে মহাকাব্যের আদিকবির সম্মান কোনমতেই ক্ষুণ্ণ করা যায় না। আদিকবি বাল্মীকি বা বেদব্যাস, কিংবা গ্রীক কবি হোমারের শ্রেষ্ঠত্ব সব সময়েই স্বীকার করতে হবে। মহাকাব্যের উৎস-রহস্য যাই হোক না কেন, এর মূলে যতই লোককথা ও লোক-আখ্যান থাকুক না কেন, এই সমস্ত লোককথা এবং প্রাচীন সংগীতালেখ্য একত্র করা ও এক সূত্রে গ্রথিত করে তাকে সর্বকালের সৃষ্টিতে পরিণত করা অল্প ক্ষমতার সাধ্য নয়।

মহাকাব্যের চতুর্থ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, তার আদিম সারল্য। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে স্থূলভাবে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—বর্বর যুগ, বীর যুগ এবং সভ্য যুগ। এর মধ্যে বীর যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল অকৃত্রিম ব্যবহার ও শিশুসুলভ সারল্য। দৈহিক স্বাস্থ্যও যেমন ভাল ছিল মানুষের, শাস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ ছিল—

মানসিক স্বাস্থ্যও ছিল ভাল। উপদেশে ও আচরণে, বাক্যে ও কর্মে সংগতি ছিল। জটিলতাবর্জিত সারল্যের জন্যই একজনের বিরুদ্ধে অন্যজন উরুভঙ্গের বা বুক চিরে রক্তপানের মত ক্রিয়ায় লিপ্ত হতে পারতেন। এগুলি আজকের সভ্য যুগে চিন্তা করা যায় না, এসব কাজকে আমরা এখন চূড়ান্ত অসভ্যতা বলেই গণ্য করি। মুখে একজনের প্রশংসা করে গোপনে তার চরম সর্বনাশ করার মত কৃত্রিমতা সভ্য যুগেই সম্ভব হয়।

পঞ্চম প্রসঙ্গ মহাকাব্যের বিষয়। কী বিষয় নিয়ে মহাকাব্য লেখা হবে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন আলংকারিক ও রসবেত্তার নির্দেশ থাকলেও তাঁদের মতের কিছু ভিন্নতা দেখান যায়। হোমার বলেছেন, মহাকাব্যের বিষয় হল 'বীরপুরুষদের কথা।' আচার্য দণ্ডীর মতে, এর বিষয়বস্তু সংগৃহীত হবে কোন ঐতিহ্যসম্পন্ন কাহিনী বা পুরাণ থেকে। বিশ্বনাথ কবিরাজ ইতিহাসের কাহিনীর প্রতি বেশি উৎসাহী ছিলেন। এক্ষেত্রে মহাকবি ট্যাসো আবার আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, এর বিষয় হওয়া দরকার, ধর্মানুশাসিত ঐতিহাসিক ঘটনা, এবং তা খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী জাতির ইতিহাস হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে কাহিনী ইতিহাস, পুরাণ বা লোককথা যেখান থেকেই সংগ্রহ করা হোক, বীরত্বপূর্ণ কাহিনী এবং রণোম্মাদনা মহাকাব্যের প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ। সেই কারণে বিষয়বস্তুর অলৌকিকতা ও চমৎকারিত্ব মহাকাব্যিক বিষয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন অ্যারিস্টটল। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই, কাব্যের সত্য ও ইতিহাসের সত্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান এক মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে অসম্ভাব্য ঘটনার (Improbable possibility) চেয়ে সম্ভাব্য অঘটনও (Probable impossibility) সাহিত্যে অনেক বেশি কাম্য। অর্থাৎ বিষয় যেখান থেকেই সংগৃহীত হোক, তার সম্ভাব্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষার দায়িত্ব সর্বাগ্রে, এবং মহাকবিকে তা গ্রহণ করতে হবে।

প্রসঙ্গত মনে করিয়ে দেওয়া দরকার মহাকাব্যের প্রধান রস কী হবে এ নিয়ে বিশ্বনাথ কবিরাজ খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, শৃঙ্গার, বীর অথবা শান্ত—এই তিনটির মধ্যে একটিকে প্রধান রস হিসাবে নির্বাচন করতে হবে, অন্যান্য রস অবশ্য তার পরিপুষ্টি সাধন করতে পারে। তাঁর শ্লোক ইতোপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ প্রসঙ্গ, মহাকাব্যের বৃত্ত এবং আঙ্গিক। এ বিষয়ে বেশি স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যাবে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের কাছ থেকেই, কারণ মহাকাব্যের বহিরঙ্গ লক্ষণ নিয়েই তাঁরা বেশি উৎসাহিত ছিলেন। অ্যারিস্টটল এ বিষয়ে শুধুমাত্র বলেছেন কাহিনীটি যাতে একটি সম্পূর্ণতা পায়—আদি-মধ্য-অন্তযুক্ত এক সমগ্র আখ্যান হয়ে ওঠে, এটাই দেখা দরকার।

আচার্য দণ্ডীর মতে, মহাকাব্য শুরু করা হবে আশীর্বচন, নমস্ক্রিয়া বা

বস্তুনির্দেশের দ্বারা। মহাকাব্যের সর্গগুলি হবে নাতিদীর্ঘ কিন্তু এর পটভূমি হবে বিরাট, যাতে মহাকাব্যিক বিস্তৃতি ও ঔদার্য ফুটে ওঠে। তাই প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হিসাবে সমুদ্র, পাহাড়, ঋতু, উদ্যানক্রীড়া, জলকেলি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে মহাকাব্যের সর্গসংখ্যা আটের বেশি হতে হবে এবং নাটকের মতো সন্ধি থাকবে। নায়কের জয় এবং ধর্মের জয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে মহাকাব্যের সমাপ্তি ঘোষিত হবে। সমাপ্তি সম্পর্কে ভারতীয় আলঙ্কারিকে এই নির্দেশ অবশ্য পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকেরা মেনে নেন নি, এর পরিণতি তাঁদের মতে অশুভও হতে পারে। তবে তাঁরা এর এক অখণ্ড শিল্পসংগত রূপ এবং মহত্ত্বব্যঞ্জক গাম্ভীর্যের কথা জোর দিয়ে বলেছেন।

মহাকাব্যের নায়ক প্রসঙ্গ এর সপ্তম বৈশিষ্ট্য। এ সম্বন্ধে ভারতীয় আলংকারিকদের ধারণা, নায়ক হবেন কোন দেবতা, ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন সদ্বংশজাত কোন ক্ষত্রিয় অথবা উচ্চবংশজাত কিছু নৃপতি। এই মত থেকে বোঝা যায় নায়ক একের বেশি হলেও আপত্তি করবার কিছু নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে যেসব মহাকাব্যিক প্রয়াস আমরা দেখেছি তা থেকে মনে হয় একাধিক নায়ক মহাকাব্যের আস্বাদের ঘনত্ব নষ্ট করতে পারে। রামায়ণ ও মহাভারত কিংবা ইলিয়াড ও ওডিসিতে একটি নায়কের সংগ্রাম ও বীরত্বই আমরা দেখেছি যদিও সেখানে বীর চরিত্রের অভাব ছিল না। তাতে কাহিনীর মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। সুতরাং মহাকাব্যের নায়ক সম্বন্ধে মন্তব্য করতে হলে একাধিক নায়ক-পরিকল্পনাকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি না।

নায়ক সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় নিশ্চয়ই হতে পারেন, কিন্তু তিনি দেবতা হলে কী অসুবিধার সৃষ্টি হয় তা আমরা বাল্মীকির রামচরিত্র এবং কৃত্তিবাসের অনুবাদ পাঠ করলেই বুঝতে পারি। একটি মানুষ তার দুর্লভ চরিত্রের সাহায্যে অনেক অসাধারণ কাজ করতে পারে, বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারে, কিন্তু তাকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করলেই তার সমস্ত কৃতিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়, কারণ দেবতাকে অসাধ্যসাধনের জন্য কোন সাধনা করতে হয় না। তাই কাব্যের নায়ক দেবতা হলে আমরা সেই রস থেকে বঞ্চিত হই, একটি মহৎ কাব্য পাঠ করে যে রসের আস্বাদন আমরা করে থাকি। পাশ্চাত্য মহাকাব্যে দেবতাচরিত্র আমরা অনেক দেখেছি কিন্তু তাঁরা কেউ নায়কত্ব দাবি করেননি, দ্বিতীয়ত তাঁদের চরিত্র অনেক সময়ই মানবচরিত্রের সমতুল্য—কখনো বা মানবচরিত্রের চেয়েও হীন।

মহাকাব্যের অষ্টম ও শেষ প্রসঙ্গ, এর ভাষা। মহাকাব্যের ভাষা সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের অভিমত এইরকম যে, এটি হবে ছন্দোময় এবং সেই ছন্দের থাকবে গুরুগম্ভীর ওজস্বিতা। তিনি হেক্সামিটার ছন্দই মহাকাব্যের উপযুক্ত মনে করেছেন, অর্থাৎ যে রীতির ছন্দের প্রত্যেকটি চরণে থাকবে দুটি শ্বাসাঘাত বা

ঝোঁক। ছন্দের ব্যাপারে আচার্য দণ্ডীও সচেতন ছিলেন, তিনি বলেছেন মহাকাব্যের প্রতিটি সর্গের শেষেই ছন্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়।

আসলে মহাকাব্য এক বিরাট ও মহান সৃষ্টি বলেই তার ছন্দব্যবহার এমন হওয়া উচিত যাতে এই বিশালতার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়। অ্যারিস্টটল যে এর জন্য 'Heroic metre' সর্বোত্তম বলে মন্তব্য করেছেন, তাও এই ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য। তাছাড়া মহাকাব্যের গভীর উপমা ও নতুন নতুন শব্দচয়নও এই ছন্দেই স্ফূর্তি লাভ করে। সংস্কৃতেও অনুষ্টুভের মত গম্ভীর ছন্দই মহাকাব্য রচনার উপযোগী বলে বিবেচিত হয়েছে।

ঙ. একটি আদি মহাকাব্যের আলোচনা

আদি মহাকাব্যের যেসব লক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম সেই লক্ষণের আলোকে আমাদের দুটি মহাকাব্যের অন্যতম 'রামায়ণের' পর্যালোচনা আমরা করতে পারি।

প্রথমত, 'রামায়ণ' যে তন্ময় কাব্য এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। একটি বিস্তীর্ণ সময় এর পটভূমি এবং ভারতবর্ষীয় মানুষের আদর্শ, মানসিকতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রায় দর্পণেই পরিণত হয়েছে এই কাহিনী। তন্ময় বা বস্তুগত ভাবে দেখার ফলেই কোন বিশেষ চরিত্রের প্রতি আদিকবি বাল্মীকি বেশি সহানুভূতি দেখাবার সুযোগ পাননি। রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যে উপেক্ষিতা'* প্রবন্ধে লক্ষ্মণের স্ত্রী ঊর্মিলার প্রতি উপেক্ষার অভিযোগ করেছেন বাল্মীকির প্রতি। আসলে এটি মহাকবির প্রতি আধুনিক গীতিকবির অভিযোগ—এক্ষেত্রে মহাকবিও নিরুপায়, আবার গীতি-কবির এই অভিযোগও স্বাভাবিক। 'রামায়ণ' গীতিকবিতা নয় বলেই ঊর্মিলাকে বেশি গুরুত্বদান বাল্মীকির পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

দ্বিতীয়ত, 'রামায়ণ' মহাকাব্যের সঠিক সময়সীমা এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হলেও এটি যে সুপ্রাচীন কাব্য, এ বিষয়ে কোন সমালোচকই দ্বিমত পোষণ করেন না। রামায়ণের এই প্রাচীনত্বের জন্যই তাকে পুরাণের সম্মান জানান অনেকে। রামায়ণে বর্ণিত বিভিন্ন প্রথা, প্রায় রূপকধর্মী কাহিনী রূপায়ণ এবং সভ্যতার আদিম

* প্রবন্ধটির নাম 'কাব্যে উপেক্ষিতা' এবং 'কাব্যের উপেক্ষিতা' দুরকমই পেয়েছি। কাব্যে যাঁদের উপেক্ষা করা হয়েছে, এই অর্থে প্রথম নামটি অধিকতর সুপ্রযুক্ত মনে হয়। বিশেষ করে প্রথম নামকরণটি এত কাব্যিক ও শ্রুতিরুচিকর যে, রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় নামটি কোথাও ব্যবহার করেছেন বা পছন্দ করেছেন ভাবতে আমার কষ্ট হয়।

স্তরের সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিচয় থেকেও এর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

তৃতীয়ত, মহাভারতের তুলনায় রামায়ণ কাব্য অনেক বেশি সংহত ও কেন্দ্রীয় কাহিনীর প্রতি নিষ্ঠ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাহিনীর ধারা এসে যে রামায়ণের সঙ্গে মিশেছে এবং তাদের একত্র করেই যে রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করতে হয়েছে এ কথা বোঝা কষ্টকর নয়। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কালে কালে একটি সমগ্র জাতি যে কাব্যকে একজন কবির কবিত্বশক্তি আশ্রয় করিয়া রচনা করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকেই যথার্থ মহাকাব্য বলা যায়।"

আবার সমগ্র জাতিই রামায়ণ মহাকাব্যের স্রষ্টা বলে আদিকবি বাল্মীকির ক্ষমতাকে আমরা কোনমতেই ছোট করে দেখতে পারিনা। যে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মোহ দৃষ্টিতে সমগ্র কাব্যটিকে তিনি সুগ্রথিত করেছেন, যে নিখুঁত মনস্তত্ত্বের জ্ঞানে চরিত্রগুলিকে সজীব করে তুলেছেন এবং সীমিত সুযোগ সত্ত্বেও ভাষাশিল্পে যে প্রগাঢ় জ্ঞান ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমাদের দেশের মহাকাব্য রচয়িতা হিসাবে নয়, অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবেই তিনি স্বীকৃতি পেতে পারেন।

মহাকাব্যের চতুর্থ লক্ষণ আদিম সারল্য এবং অলৌকিকের প্রতি বিশ্বাস। আদিম সারল্য যে রামায়ণের যুগে বর্তমান ছিল তা সম্পর্কগুলির অকৃত্রিমতা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। পিতৃসত্য পালনের জন্য চোদ্দ বছরের বনবাস, লক্ষ্মণের মত ভ্রাতৃভক্তি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পাদুকাকে প্রতিনিধি করে তাঁর হয়ে রাজ্য চালানো, প্রজানুরঞ্জনের জন্য প্রাণপ্রিয় পত্নীর নির্বাসন—এ সবই এক আদর্শ পারিবারিক সম্পর্কের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে যা পরবর্তীকালে অনেক কৃত্রিম ও জটিল হয়ে এসেছে।

পঞ্চমত, রামায়ণের বিষয় মহাকাব্যিক কিনা এ সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয় অঞ্চলের সাহিত্যতাত্ত্বিকদের খুশি করার মত বিষয় অবলম্বন করেই রামায়ণ মহাকাব্য রচিত হয়েছে। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্রের বনবাস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের পর সীতা-উদ্ধার ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে মহাকাব্যের উপযুক্ত 'বীরপুরুষের কথা।' আমাদের দেশের মহান ঐতিহ্য যে এতে ধরা পড়েছে তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অনেকে বলেন এটি পুরাণ, অনেকে বলেন ইতিহাস, আবার অনেকের মতে দক্ষিণভারতে অনার্যদের ওপর আর্যের বিজয়কাহিনীই রূপকের মাধ্যমে এখানে পরিবেষিত। অলৌকিক ঘটনা রামায়ণে নেই এমন নয়—হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, রাবণের মৃত্যুবীজ প্রাসাদে লুক্কায়িত থাকা, সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভৃতি যুক্তি দিয়ে গ্রহণ করা শক্ত; কিন্তু অন্যভাবে বিচার করলে আমাদের মত আধুনিক পাঠকের কাছেও তা সহনীয় হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত ভাবতে হবে, রামায়ণ এমন সময় লেখা হয়েছিল যখন পাঠকের

যুক্তিশৃঙ্খলার বোধ আমাদের মত এত কঠিন ছিলনা—অন্তত সাহিত্যপাঠে তার এতটা আবশ্যকতা তাঁরা বোধ করতেন না।

এই কাব্যে অন্যান্য অনেক রস মূল রসের পুষ্টি সাধন করলেও, আমরা মনে করি এর অঙ্গীরস বীররস।

ষষ্ঠত, রামায়ণ বস্তুগঠনের দিক থেকে মহাকাব্যিক এবং নিখুঁত, এই ধারণাই পোষণ করেন সমালোচকগণ। মূল কাহিনী যদি রামচন্দ্রের জীবনভিত্তিক ধরা যায় তাহলে কাহিনীর আদি, মধ্য ও অন্ত অত্যন্ত স্পষ্ট এবং একে একটি সম্পূর্ণাঙ্গ কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করতেও আমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

ভারতীয় আলংকারিকদের বিচারে একটি কাণ্ড অবশ্য কম আছে রামায়ণের, কিন্তু সপ্তকাণ্ড রামায়ণ কোথাও কাহিনীধারা ক্ষুণ্ণ করে বা সংক্ষিপ্ত করে তোলে, এরকম সন্দেহ আমাদের হয় না। মহাকাব্য শুরু করার যে প্রথা—আশীর্বচন, নমস্ক্রিয়া ইত্যাদি, তা রামায়ণে রক্ষিত হয়েছে। এর পটভূমি যে বিশাল এ বিষয়েও কোন মতদ্বৈধ থাকতে পারে না। উত্তরভারত থেকে দক্ষিণভারত, এমনকি লংকা পর্যন্ত তার পটভূমি বিস্তৃত। প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হিসাবে প্রাকৃতিক দৃশ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ কবি প্রচুর পেয়েছেন এবং সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। ধর্ম ও আদর্শের জয় প্রতিষ্ঠার মধ্যেই মহাকাব্য সমাপ্ত হয়েছে।

সপ্তমত, 'রামায়ণ' মহাকাব্যের নায়ক সম্বন্ধে আলংকারিকদের কোন নির্দেশেরই ব্যত্যয় হয় নি। রামচন্দ্রই নিঃসন্দেহে এই মহাকাব্যের নায়ক এবং তিনি যে 'ধীরোদাত্ত' ও 'সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়' সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। কেবল কৃত্তিবাসের অনুবাদ পাঠ করে সন্দেহ যে বিষয়ে জাগে তা হল, রামচন্দ্র মানুষ অথবা দেবতা। বাল্মীকির মহাকাব্যে রাম ছিলেন একজন মানব, কিন্তু অতিমানব; সেই জন্যই তাঁর চরিত্র আমাদের মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করতো। শুধু রামচন্দ্র নয়, সমস্ত চরিত্রই সেখানে মানব-অনুভূতিতে সঞ্জীবিত। সীতা সেখানে তেজস্বিনী জনক-দুহিতা। রামচন্দ্র মারীচের সন্ধানে গিয়ে বিলম্ব করলে লক্ষ্মণের সেখানে না যাওয়ার কারণ হিসাবে নিতান্ত প্রাকৃতজনের মত সীতার ভর্ৎসনা, কিংবা লক্ষ্মণের সামনে সীতাকে নিজের প্রশংসা করতে দেখে রামের বলা—'তুমি এরকম কোরনা, কারণ ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষগণ স্ত্রীলোকের মুখে অন্য পুরুষের গুণগান শুনতে ভালবাসেন না'—চরিত্রের মানবীয় আস্বাদই স্পষ্ট করে। বাল্মীকির এই চরিত্রগুলিকে দেব-দেবীতে রূপান্তরিত করে তাদের কী ক্ষতি যে কবি কৃত্তিবাস করেছেন, দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'রামায়ণী কথা'-য় সে কথা স্পষ্ট করেই বলেছেন। রামচন্দ্রের যাবতীয় পৌরুষ, কোমলতা, দৃঢ়তা, সমস্ত চারিত্রিক গুণ মূল্য হারায় যদি তিনি 'পতিতের ত্রাতা', 'অনাথের নাথ' ঈশ্বর হয়ে যান। অথচ যে রাবণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হিসাবে রামচন্দ্রের অকালবোধন যজ্ঞের পৌরোহিত্য করেছিলেন, সেই রাবণকেও

মৃত্যুকালে কৃত্তিবাস রামের কাছে ঈশ্বর-বন্দনায় হাতজোড় করিয়েছেন। অবশ্য অনুবাদের জন্য মূল রচনার কবিকে দোষারোপ করে কোন লাভ নেই।

আদি মহাকাব্যের শেষ লক্ষণটি সম্বন্ধে বলা যায়, 'রামায়ণ' মহাকাব্যের ভাষা তার সম্পদ। পৃথিবীর আদি ছন্দ হিসাবে স্বীকৃত অনুষ্টুভ্ ছন্দে এই কাব্য রচিত যার প্রথম শ্লোক—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্ব—
মগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক—
মবধীঃ কামমোহিতম্ ॥"

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অবশ্যই অনুষ্টুভ্ আদি ছন্দ নয়, বৈদিক ভাষার অন্যতম ছন্দ মাত্র; এবং বৈদিক ভাষাকে অপৌরুষেয় আখ্যা দেবার জন্যই মনুষ্যকৃত ছন্দের মধ্যে একে প্রথম বলা হয়েছে। তা সত্ত্বেও আমরা মনে করি এক বিশাল পটভূমি-সম্পন্ন মহৎ ব্যঞ্জনার মহাকাব্য অনুষ্টুভ্ ছন্দে তার যোগ্য মাধ্যম খুঁজে পেয়েছে।

সুতরাং সমস্ত লক্ষণভিত্তিক বিচারে রামায়ণ মহাকাব্যকে আমরা অবশ্যই সার্থক মহাকাব্য হিসাবে স্বীকৃতি জানাতে পারি।

চ. সাহিত্যিক মহাকাব্য

সাহিত্যক মহাকাব্য বা আধুনিক মহাকাব্য আধুনিক কালে রচিত আধুনিক কবির মহাকাব্যিক প্রয়াস। একেই ইংরেজিতে বলা হয়েছে Literary Epic বা Epic of art'। সাহিত্যক মহাকাব্য একক প্রয়াসেই সৃষ্ট এবং মন্ময়তার লক্ষণ তাতে অনেকটাই ফুটে উঠতে পারে। সেই হিসাবে আদি মহাকাব্যের তুলনায় কাব্যিক উৎকর্ষ তাতে বেশি থাকাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, একটি সার্থক সাহিত্যক মহাকাব্য একদিকে যেমন আদি মহাকাব্যের কিছুটা আভাস দেয়, অন্যদিকে আধুনিক মহাকাব্যেরও একটি আদর্শ সৃষ্টি করে। যেমন 'রামায়ণ' মহাকাব্যের অংশবিশেষ অবলম্বন করে মধুসূদন দত্ত রচনা করলেন 'মেঘনাদবধ কাব্য', কিন্তু রচনার সৌকর্যে তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণা হয়ে থাকল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য' বা নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক'-'কুরুক্ষেত্র'-'প্রভাস' —এই ত্রয়ীকাব্যের। এই ভাবেই ভার্জিলের Aeneid মিলটনের Paradise Lost শিল্পসৃষ্টির অসাধারণ দৃষ্টান্ত হয়েই তাদের মূল্য হারায় নি, তারা প্রেরণা হয়ে থেকেছে অন্যান্য অনেক সাহিত্যক মহাকাব্যের, যাদের মধ্যে আছে ট্যাসো-র Gerusalemme Liberata বা ক্যামোয়েন্স-এর Lusiadas থেকে ম্যাথু আর্নল্ডের Sohrab and Rustum পর্যন্ত।

স্বাভাবিকভাবেই আদি মহাকাব্যের সঙ্গে সাহিত্যিক মহাকাব্যের কিছু সাদৃশ্য আছে, কারণ আদি মহাকাব্যের প্রতি দৃষ্টি রেখেই আধুনিক যুগের মহাকাব্য গড়ে ওঠে। আবার সময়, মানসিকতা ও যুগরুচির কারণে তাদের মধ্যে ভিন্নতাও কম নয়। এইসব সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সূত্রাকারে এই ভাবে দেখানো যেতে পারে।

এক ॥ সাহিত্যিক মহাকাব্য সাধারণত বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে আদি মহাকাব্য, প্রাচীন বীরগাথা কিংবা লোকগাথা থেকে। আদি মহাকাব্যের গঠন অনুসরণ করেই তার কাব্যদেহ গঠিত হয়। কিছু কিছু অতিপ্রাকৃত উপাদানও তা গ্রহণ করে থাকে, আধুনিক মহাকাব্য হলেও।

দুই ॥ পুরাণ বা প্রাচীন ইতিহাস থেকে উপাদান সংগৃহীত হলেও সেই প্রাচীন উপাদান সাহিত্যিক মহাকাব্যে আর পুরাতত্ত্ব থাকে না, কবির আধুনিক মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে তা সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি হয়ে ওঠে। কখনো কবি সেই কাহিনীর মধ্যে আবিষ্কার করেন সমগ্র জাতির সুপ্ত চেতনা, কখনো আধুনিক তাৎপর্যে তা এমন অভিনব হয়ে ওঠে যে এক নতুন জীবনদর্শন সেখানে আমরা খুঁজে পাই, মানুষ তার ভবিতব্যকে খুঁজে পায় সেখানে। কবি অ্যাবারক্রম্বি এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—

"There is only one thing which can master the perplexed stuff of epic material into unity, and that is, an ability to see in particular human experience some significant symbolism of man's general destiny."

তিন ॥ একই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে, আদি মহাকাব্যের পৌরাণিক উপাদানের মধ্যে যে উদ্দাম জীবনবোধ, যে অকৃত্রিম সারল্য আছে, তার তুলনায় সাহিত্যিক মহাকাব্য অনেকটাই স্তিমিত, পরিশীলিত পুরাতত্ত্বের চর্চা মনে হতে পারে। সমালোচক হাডসন এই জন্যেই সম্ভবত মন্তব্য করেছেন—"...the epic of growth is fresh, spontancous, racy, the epic of art is learned, antiquarian, bookish, imitative."

চার ॥ চরিত্রচিত্রণে এই দুই সময়ের মহাকাব্যের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। আদি মহাকাব্যে দেবতাও নায়কত্ব পেতে পারেন, এমন কথা তাত্ত্বিকগণ স্বীকার করেছেন। দেবতা না হলেও দেবকল্প ক্ষমতার অধিকারী মানুষ ছিল আদি মহাকাব্যের নায়ক। কিন্তু সাহিত্যিক মহাকাব্যে মানুষ এবং একমাত্র মানুষই নায়কত্ব করতে পারে। তার নায়ক হবার জন্য দেবোপম গুণেরও কিছু প্রয়োজন হয় না, সাধারণ মানবিক গুণ নিয়েই সে নায়ক হতে পারে। যখন দেবতাই হয়ে ওঠেন সাহিত্যিক মহাকাব্যের নায়ক—নবীনচন্দ্র সেনের ত্রয়ী কাব্যে তা হয়েছে, তখনও কিন্তু তাঁকে দেবতা হিসাবে নায়কত্ব দান করা হয় না, মানুষ

হিসাবেই সে মর্যাদা তিনি পান। ত্রয়ী কাব্যের উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে 'মহাভারত' থেকে, কিন্তু মহাভারতের তাৎপর্যই সেখানে পালটে গিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আদৌ কোন দেবতা নন—একজন দক্ষ ও কূট রাজনীতিবিদ্‌মাত্র, যাঁর উদ্দেশ্য ছিল খণ্ড খণ্ড রাজ্যে রাজ্যে বিভক্ত হীনবল ভারতবর্ষে একটা বিরাট যুদ্ধ বাধিয়ে তাদের এক রাজার অধীনে এনে সংহত করা, খণ্ডিত ভারতবর্ষকে এক মহা ভারতে পরিণত করা।

পাঁচ ॥ আদি মহাকাব্য একজন কবি রচনা করলেও তাকে আমরা বহু লোক-কবির যৌথ কীর্তি আখ্যা দিতে পারি, কাব্যটিকেও বলতে পারি জাতীয় মহাকাব্য। কিন্তু সাহিত্যিক মহাকাব্য একক কবির রচনা, তার নিন্দা-প্রশংসার সব কিছুই কবি একা আত্মসাৎ করতে পারেন, অন্য কেউ নয়। কাব্যটিকে আমরা তাঁরই সৃষ্টি-সম্পদ বলি, জাতীয় সম্পদ নয়।

ছয় ॥ বস্তুধর্মিতা মহাকাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ হলেও আদি মহাকাব্য তা নয়—কবিকে আমরা পরোক্ষভাবে প্রায় সর্বত্রই খুঁজে পাই তাঁর কাব্যে।

সাত ॥ সাহিত্যিক মহাকাব্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলংকারিকদের বিধিবিধান মেনে চলে না, ফলে সেইসব নিয়মের প্রেক্ষিতে তার বিচার অনেক ক্ষেত্রেই সুবিচার হবে না। অবশ্য কবিরা যে সেসব নিয়মের কথা জেনেই মহাকাব্য রচনায় অগ্রসর হন তার প্রমাণ তাঁদের মহাকাব্যে খুঁজে পাওয়া যায়।

আট ॥ ভাষার উৎকর্ষ সাহিত্যিক মহাকাব্যেও প্রবলভাবেই থাকে। বরং ব্যক্তিগত কীর্তি বলে সেদিকে কবি অধিকতর যত্নবান হন।

ছ. একটি সাহিত্যিক মহাকাব্যের বিশ্লেষণ

শ্রীমধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বক্তব্যে, মানসিকতায় ও উপস্থাপনায় আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, দুটি পর্যায়ে—প্রথমে পাঁচ সর্গ ও পরে চার সর্গ: ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীরঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' থেকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীনবীনচন্দ্র সেনের 'প্রভাস' কাব্য পর্যন্ত সময়সীমা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কৃত্রিম মহাকাব্যের যুগ' হিসাবে পরিচিত। আমরা মনে করি এই সময়েই কিছু সাহিত্যিক মহাকাব্য রচিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিঃসন্দেহে 'মেঘনাদবধ কাব্য'। সেই কারণে একটি সাহিত্যিক মহাকাব্যের বিশ্লেষণের জন্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' গ্রন্থটিকেই আমরা নির্বাচন করলাম। সাহিত্যিক মহাকাব্যের যেসব লক্ষণ আমরা উল্লেখ করেছি, তার আলোকেই এই

কাব্যের বিচার করা হবে, যদিও এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি যে, মহৎ প্রতিভা কোন নিয়মের কাছেই নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করে না। নতুন সৃষ্টির ক্ষমতা আছে বলেই কবি অনেক সময় স্বাধীন বৃত্তিকে সংহত করেন না এবং সেই অভিনব আলোকেই সমালোচকগণ পরবর্তীকালে সৃষ্টি-লক্ষণ স্থির করেন। অতঃপর কাব্যবিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

এক ॥ কবি 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্য থেকে। রাবণের বীরপুত্র মেঘনাদকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ঢুকে লক্ষ্মণ অন্যায়-রণে কীভাবে হত্যা করেন, সেই অংশই কবি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেছেন। সুতরাং কাব্যের বিষয় মহাকাব্যের উপযোগী সন্দেহ নেই। আধুনিক যুগের কাব্য হলেও দেবদেবীর অলৌকিক লীলা এবং তাঁদের মন্ত্রণা ও ষড়যন্ত্রের চিত্রও তিনি উপস্থিত করেছেন। এতে প্রাচীন বিষয়ের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে—মূল কাহিনীকে তা প্রভাবিত করতে পারেনি।

দুই ॥ কবি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন রামায়ণ মহাকাব্য থেকে, কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে উঠেছে এবং সবচেয়ে বড় কথা তা এক মৌলিক ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছে। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং বাল্মীকির 'রামায়ণ' সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতার কাব্য বলে মনে হয়। বাল্মীকির মহাকাব্যে পাপের পরাজয় এবং ধর্মের জয়ই বড় হয়ে উঠেছে, পক্ষান্তরে মধুসূদনের কাব্যে বড় হয়ে উঠেছে স্বদেশিকতা। প্রথম সর্গে চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ এবং সমগ্র চতুর্থ সর্গের অতীতকথন বাদ দিলে কাব্যটি পাঠ করলে মনে হয় রাবণ যেন এক স্বাদেশিক রাজা, নিজের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যিনি আপ্রাণ সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। দৈবশক্তিতে বলীয়ান রাজা রামচন্দ্র অযোধ্যা থেকে এসেছেন তাঁর রাজ্য আক্রমণ করতে, রাবণের তা প্রতিহত করার প্রয়াসে 'একে একে নিবিছে দেউটি'—তা সত্ত্বেও তিনি পরাজয় স্বীকার করে নিজের দেশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে রাজি নন, এই ধরনের একটি ধারণা পাঠকের হতে পারে। আমরা একটু সচেতন হলেই স্মরণ করতে পারবো, ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'কৃত্রিম মহাকাব্য যুগ' নামে যে সময়টি চিহ্নিত, সেই কালপর্বে রচিত বেশির ভাগ কাব্যেরই অন্তর্নিহিত সুর ছিল স্বদেশচেতনা। সুতরাং রাবণকে কোথাও স্পষ্টভাবে দেশপ্রেমিক বলা না হলেও সমগ্র কাব্যটির প্রতীতিতে রাবণকে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ নৃপতি বলেই মনে হয় এবং মেঘনাদের করুণ অপমৃত্যুও দেশভক্তির জন্য আত্মোৎসর্গ হিসাবেই পাঠক গ্রহণ করতে পারেন।

তিন ॥ সাহিত্যিক মহাকাব্যে জীবনের দুর্মর আবেগ ও আদিম প্রবৃত্তি যে অনেকটা সংহত হয়ে আসে, 'মেঘনাদবধ কাব্যে' তার নিদর্শন আমরা পাই। রামায়ণে অশ্বমুনির দুর্বার ক্রোধ, কৈকেয়ীর অনাবৃত ঈর্ষা বা লক্ষ্মণের প্রতি সীতার

পরুষ বচন প্রভৃতির যে দৃষ্টান্ত আমরা পাই, 'মেঘনাদবধ কাব্য' তার তুলনায় অনেক সংযত। রাবণের ক্ষুব্ধ অসহায়তা ও দুর্দম ক্রোধ আমরা এখানে পেয়েছি বটে তবে তা অনেক পরিশীলিত। বীরত্বের আবেগ প্রমীলার মধ্যেও আমরা লক্ষ করি, তবে তা কতোটা স্বতোৎসারিত এবং কতোটা কাব্যিক আদর্শজাত সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। চতুর্থ সর্গে সরমার কাছে পূর্বজীবনের বর্ণনায় সীতা রীতিমতো রোম্যান্টিক হয়ে উঠেছেন।

চার ॥ আদি মহাকাব্যের মতো 'মেঘনাদবধ কাব্যেও' দেবতার আধিপত্য বেশ কিছুটা দেখা গিয়েছে। প্রথম সর্গেই রাজলক্ষ্মীর জন্য বারুণীর উতলা মনোভাব আমরা দেখেছি, রাজলক্ষ্মী লঙ্কাত্যাগ করবার জন্য কতো অস্থির তাও আমরা লক্ষ করেছি। দ্বিতীয় সর্গের প্রায় সম্পূর্ণটাই দেবদেবী ষড়যন্ত্র ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে বিস্তারিত। কাব্যের পরিণতিতে দেবদেবীদের এই সক্রিয়তা একটা প্রধান ভূমিকা নিয়েছে এ কথাও সত্য। তবে তা সত্ত্বেও এই কাব্যে এসব বহুগুণে অতিক্রম করে গিয়েছে মানবিক আবেদন এবং মানুষের যন্ত্রণাজর্জর হৃদয়। রাম ও রাবণ পৌরাণিক মানুষ—এবং পৌরাণিক মানুষের দেবোপম গুণাবলী থাকতে পারে এ কথা আমরা জানতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, তবু বলবো যে-গুণে রাবণ ও মেঘনাদ আমাদের অভিভূত করে তা লোকোত্তর গুণ বা ঐশ্বর্য নয়, একান্তই মানবিক গুণ। যে রাবণকে রামায়ণে আমরা পেয়েছি আত্মগর্বী মহাশক্তিমান এক পাপাচারের জীবন্ত বিগ্রহ হিসাবে, এখানে তাকে পাই একটি মানুষ হিসাবে। মানুষটি পত্নীর বেদনায় সান্ত্বনা দেয়, বীরপুত্রকে উদ্বুদ্ধ করে, সুপুত্রের বিয়োগে যন্ত্রণায় ভেঙে পড়ে, আবার দেশের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজের বীরত্ব ও পরাক্রমকে জাগিয়ে তোলে। রামায়ণে মেঘনাদের ভূমিকা কেবল শৌর্যের, এখানে তাকে অনেকগুলি ভূমিকায় আমরা দেখি—বীরপুত্র, প্রেমিক স্বামী, বংশমর্যাদায় ঐশ্বর্যবান রাজপুত্র। এর পাশে বরং দৈবশক্তিধর পুরুষ রাম-লক্ষ্মণই ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আসলে রবীন্দ্রনাথের এরকম মনে হবার কারণ, রাম ও লক্ষ্মণ দৈবশক্তির ওপর নির্ভরতায় আদি মহাকাব্যের চরিত্রই থেকে গিয়েছেন, রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ মানবিক অনুভূতির সৌজন্যে অনেকখানি মানুষ হয়ে উঠেছেন। মধুসূদন পরবর্তীকালে যেভাবে তাঁর 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'-র পৌরাণিক নায়িকাদের মানবিক অনুভূতিসম্পন্ন নারী করে তুলেছেন, সেই ভাবেই এখানে চরিত্রগুলিকে মানবিক করে তুলতে পেরেছিলেন এবং সেটাই এই কাব্যের প্রতি আধুনিক পাঠকের আকর্ষণের প্রধান কারণ।

পাঁচ ॥ 'মেঘনাদবধ কাব্য' নিঃসন্দেহে একক সৃষ্টি। এটি যে শুধু মধুসূদন দত্তের লেখা তাই নয়, এ কাব্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং এই কাব্য তিনি ছাড়া আর কেউ রচনা করতে পারতেন না—এরকম একটি বোধও সচেতন ও মনস্ক পাঠকের মধ্যে গড়ে ওঠে।

ছয় ॥ মহাকাব্যকে তন্ময় কবিতার অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই objectivity বা তন্ময়তা আদি মহাকাব্যের মধ্যে পুরোপুরি বর্তমান থাকে, সাহিত্যিক মহাকাব্যে কিন্তু কবির মন্ময়তাও আমরা একটু সচেতন হলেই লক্ষ করতে পারি। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' কেবল যে রাম-লক্ষ্মণ অপেক্ষা রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতি মধুসূদন বেশি দৃষ্টি দিয়েছেন তাই নয়, তাঁর সহানুভূতি যে অত্যন্ত বেশি রয়েছে রাবণ ও ইন্দ্রজিতের প্রতি, এই মনোভাব কাব্যে তিনি গোপনও করতে পারেননি। রাবণের বর্ণনায় তাঁর লেখনী যেমন বলিষ্ঠ, ইন্দ্রজিতের নিষ্পাপ সারল্য বর্ণনা করতে গিয়েও তেমনি তিনি পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়েছেন। কবি তাঁর এই মানসিকতা যে গোপন করার চেষ্টা করেননি, তাঁর চিঠিপত্রগুলিই তার সাক্ষ্য দেবে। তিনি একদিকে লিখেছেন, 'I despise Ram and his rabble', অন্যদিকে রাবণ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য, 'He was a grand fellow. ইন্দ্রজিত সম্বন্ধে তিনি যে অনুভূতিপ্রবণ চিঠিতে বারবার তার উল্লেখ আছে। একবার লিখেছেন, 'I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit', অন্য চিঠিতে লিখেছেন—'It cost me many a tear to kill him.' অন্য আর-একটি চিঠিতে পাই, 'He was a noble fellow and but for that scoundrel Bivishan could have kicked the monkey-army into the sea.' সুতরাং কবি এই কাব্যে সর্বত্রই ধরা দিয়েছেন।

সাত ॥ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলংকারিকগণ মহাকাব্য সম্বন্ধে যেসব বিধিবিধান নির্দিষ্ট করেছেন, খুব সংগত কারণেই তার পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বিচার করা যুক্তিযুক্ত হবে না। কারণ তাঁর এই কাব্যকে মহাকাব্য আখ্যা দিতেই রাজি ছিলেন না তিনি। একটি চিঠিতে বলেছেন—'you must not, my deer fellow, judge of the work as a regular Heroic Poem. I never meant it such.' তিনি এই কাব্যকে কী করে তুলতে চেয়েছেন এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য—'Let me write a few Epiclings and thus acquire a pucca fist.' অর্থাৎ যথার্থ মহাকাব্য লেখার আগে হাত পাকাবার জন্য এটি একটি খণ্ড-মহাকাব্য বা Epicling. তিনি যে পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকের কোন নির্দেশের প্রতি অবিচল থাকবেন, এ কথা তিনি কখনো বলেননি, তবে এ কথা তিনি বলেছিলেন যে তিনি এমন করে লিখতে চেষ্টা করবেন 'as a Greek would have done.' সংস্কৃত আলংকারিকদের সম্বন্ধেও তাঁর প্রায় একই কথা—"I will not allow myself to be bound by the dicta of Mr. Viswanath of Sahitya Darpan."

অবশ্য কবির মন্তব্য নয়, কাব্য বিচারই আমাদের লক্ষ্য। সেদিক থেকে দেখলে নিয়ম যে তিনি কিছুই মানেননি এমন কথা বলা যাবে না। কাব্যটি নটি সর্গে বিভক্ত, অর্থাৎ অষ্টাধিক সর্গ এখানে আছে। সংস্কৃত আলংকারিকদের নির্দেশ

অনুযায়ী শৈল, সমুদ্র, প্রভাত, সন্ধ্যা, যুদ্ধ ইত্যাদির বর্ণনা এখানে সুকৌশলে করা হয়েছে। মহাকাব্যের অঙ্গীরস হিসাবে যেগুলি অবলম্বনের নির্দেশ আছে কবির প্রস্তাবনায় তা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি আছে—'গাইব, মা, বীররসে ভাসি,/ মহাগীত'; কিন্তু সমালোচকগণ মনে করেন কাব্যটির অবলম্বন করুণরস, বীররস নয়। যেসব ক্ষেত্রে সংস্কৃত আলংকারিকগণের নির্দেশ মধুসূদন মান্য করতে পারেননি তার মধ্যে প্রধান, তাঁর কাব্য বিয়োগান্ত অথচ মহাকাব্য সর্বদাই মিলনাত্মক হওয়াটাই রীতিসম্মত। এক্ষেত্রে তাঁর কাব্যের শেষ পংক্তি—'সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে ।।' প্রায় আলংকারিক নির্দেশের প্রতিবাদ বলা যায়।

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র নায়ক কে, সে সম্বন্ধে সুচিন্তিত বিশ্লেষণ না করেও বলা যায়, রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ ছাড়া এই সম্মান অন্য কাউকে বোধ হয় দান করা সম্ভব নয়। এই দুজনের কাউকেই আলংকারিকের নির্দেশ মতো সদ্বংশজাত ও ধীরোদাত্ত গুণসম্পন্ন বলা চলবে না।

আট ॥ ভাষার উৎকর্ষ 'মেঘনাদবধ কাব্যে' আছে এবং বিপ্লবাত্মক ভাবেই আছে। মহাকাব্যিক নির্দেশমতো মধুসূদন বিভিন্ন সর্গে বিভিন্ন ছন্দের ব্যবহার করেননি বটে, কিন্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ উপযোগী অমিত্রাক্ষর নামে যে যুগান্তকারী ছন্দরীতির প্রবর্তন করেন, কেবল সেই জন্যই তিনি দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই ছন্দে তিনি প্রয়োগ করেছেন বিষয়ের মর্যাদা অনুযায়ী ব্যঞ্জনাময় ধ্বনিসমৃদ্ধ অপ্রচলিত তৎসম শব্দ যথা—

"দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে !"

এই ভাষার সঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দেই লেখা কবির 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করলে, তিনি ভাব অনুযায়ী ভাষার কী পরিবর্তন করেছেন বোঝা যাবে—

"কি লজ্জা ! কেমনে তুই, রে পোড়া লেখনি,
লিখিলি এ পাপ কথা,—হায়রে, কেমনে ?
কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোরে !"

সুতরাং সাহিত্যিক মহাকাব্যের বিভিন্ন লক্ষণের আলোকে মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে সম্ভবত সার্থক সৃষ্টি হিসাবে স্বীকৃতি দান করা যায়।

জ. নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য

এই প্রকরণটি তন্ময় কবিতা অথবা মন্ময় কবিতা, কোন্ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে, এও যেমন একটি সমস্যা, তেমনি সমস্যা এটি নাটক অথবা কবিতা—

এই দুই প্রধান গোত্রের কার বেশি আত্মীয়। সমস্যা দুটি পৃথক নাম নিয়েও; কাব্যনাটক হিসাবেই যাকে অভিহিত করা যেতো এবং হয়তো সমীচীনও হতো, তাকে নাট্যকাব্য ও কাব্যনাট্য নাম দিয়ে দুটি পৃথক শ্রেণী হিসাবে নির্দেশ করার বিভ্রান্তি বেড়েছে বই কমেনি। পার্থক্যের সূত্র কীভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে একটা ইঙ্গিত অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার তাঁর 'সাহিত্যের রূপ-রীতি' গ্রন্থের পাদটীকায় দিয়েছেন—"কাব্যনাট্য বলতে যদি কাব্যপ্রধান নাট্য বোঝায় তাহলে বেশি পরিমাণ কাব্যনির্ভর নাটককেই বলবো কাব্যনাট্য। অনুরূপভাবে নাট্যপ্রধান কাব্য হলো নাট্যকাব্য। কিন্তু কাব্যনাট্য বলতে যদি কাব্যমিশ্রিত নাট্য বুঝি তাহলে সেখানে নাট্যগুণ বেশি বুঝতে হবে। অনুরূপভাবে নাট্যকাব্যেও কাব্যগুণ বেশি বুঝতে হবে।"

মন্তব্যটিকে একটু ভাষা-ব্যাকরণের সাহায্য নিয়ে বললে এরকম দাঁড়াবে যে, দুটি সমাসবদ্ধ পদকেই যদি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় ধরি তাহলে তার মানে দাঁড়ায় একরকম, আবার যদি তাকে ধরি সাধারণ কর্মধারয় তাহলে অর্থ হবে আর এক রকম। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে নাট্যকাব্য হবে মূলত কাব্য, নাট্যস্বভাব তার বিশেষণ মাত্র; এবং কাব্যনাট্য হবে মূলত নাট্য, কাব্যস্বভাব তার বিশেষণ। সমস্যা আরো বাড়ে যখন কেউ কেউ একে দ্বন্দ্বসমাস হিসাবে গ্রহণ করতে চান, অর্থাৎ তা নাটক ও কাব্যের সংমিশ্রণ। সুতরাং কথাটা আর একটু ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার বলে মনে করি।

প্রথমেই মনে রাখা দরকার পদ্য এবং কবিতা এক জিনিস নয়, উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধ এবং নাটকও এক জিনিস নয়। মধ্যযুগে সবই পদ্যে লেখা হতো, কিন্তু পদ্যে লেখা বলেই বৈষ্ণব তত্ত্বগ্রন্থকে আমরা কবিতা বলি না, ঠিক একই কারণে উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধে লেখা হলেও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' নাটক নয়। আসলে পদ্য একটা মাধ্যম, কবিতা এক পৃথক সাহিত্য-প্রকরণ—তাই কবিতা পদ্যমাধ্যমেও লেখা হতে পারে, গদ্যমাধ্যমেও লেখা হতে পারে। কবিত্ব নির্ভর করে বিশেষ গুণের ওপর। ঠিক তেমনি নাটকের নাটকীয়ত্ব নির্ভর করে বিশেষ গুণের ওপর, উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধ একটি প্রস্তুত আঙ্গিক কৌশল—শুধু তার ওপর নির্ভর করে কোন সাহিত্যসৃষ্টি নাটক কিনা সে বিচার করা যায় না।

আজ যখন কাব্যনাট্য বা নাট্যকাব্য সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক এতো আগ্রহী, তখন এই দুটি নামকরণের মধ্যে কোনটি বেশি সংগত সে বিচারে কালক্ষেপ না করে একে কোন পৃথক গোত্রের শিল্প বলা যায় কিনা সেটাই ভেবে দেখা উচিত। কাব্যনাট্য বলতে যদি আমরা বুঝতাম verse drama তাহলে কথাটা বোঝা অনেক সহজ হতো, কিন্তু কাব্যনাট্য verse drama নয়। পদ্যমাধ্যমে লেখা নাটক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকের সংগ্রহে অনেক আছে। বস্তুত গ্রীক সাহিত্যের অবিস্মরণীয় নাটকগুলি পদ্যমাধ্যমেই লেখা, ইংরেজি সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম

নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃত শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকও পদ্যমাধ্যমেই রচিত—অথচ গ্রীকনাটক বা শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক নিশ্চয়ই কাব্যনাট্য হিসাবে আখ্যাত হবে না, অথবা তাই যদি হতো তাহলে নতুন করে কাব্যনাট্য নামে নতুন এক শ্রেণীর উদ্ভবের কথা ঘোষণা করতে হতো না।

কাব্যনাট্য বলতে যদি বুঝি poetic drama এবং নাট্যকাব্য বলতে dramatic poetry, তাহলেও সমস্যা বাড়ে বই কমে না। নাটকে কাব্যগুণের তারতম্য নিয়ে বা কাব্যে নাটকীয়তার অনুপ্রবেশ চিন্তা করে এরকম বিভাগ নির্দেশ করতে গেলে রীতিমত অসুবিধায় পড়তে হবে। রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকে কাব্যগুণের অভাব নেই, রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকেই তাই। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ নিজে 'বিসর্জন' নাটকে লিরিকের বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে স্বকপোলকল্পিত অভিযোগ তুলেছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়র একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন এবং নাটকে কবিত্বগুণ অনুপ্রবেশের মাত্রা তিনি বুঝতেন ও তার যথেষ্ট সুযোগ নিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই কারণেই কি আমরা রবীন্দ্রনাথের বা শেক্‌স্‌পীয়রের কিছু নাটককে কাব্যনাট্য বলবো! রবীন্দ্রনাথের কাহিনীধর্মী কিছু কবিতার মধ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে, উদাহরণ হিসাবে 'পুরাতন ভৃত্য,' 'দুই বিঘা জমি', 'পতিতা', 'স্বর্গ হইতে বিদায়' প্রভৃতি কবিতার কথা আমাদের মনে পড়বেই। কী বলবো তাহলে আমরা এদের—নাট্যকাব্য! আসলে এইভাবে কাব্যিক ও নাটকীয় গুণের মাত্রা সন্ধান করে বা কাব্য ও নাটকের সমন্বয় মিশ্রণ হিসাবে গ্রহণ করে এই শ্রেণীটির প্রকৃত স্বরূপ বোঝা যাবে না। কারণ যখন একটা নতুন ধরনের চিন্তাভাবনা দেখা দিতে থাকে, একটি নতুন মানসিক আন্দোলন গভীরতা লাভ করতে থাকে—তা প্রকাশ্য হোক অথবা অপ্রকাশ্যই থাকুক, তখন সঠিক কী মানসিকতার প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটতে শুরু করে সেটা জানাই বেশি দরকার। অন্য দৃষ্টিতে তাকে বিচার করলে অর্থাৎ প্রেক্ষিতহীন বিচার করতে গেলে এই ধরনের বিভ্রান্তি জাগাই সম্ভব।

প্রথমত, কাব্যনাট্য উদ্ভবের নেপথ্যে আছে একটি সাহিত্যিক আন্দোলন যা পরিচিত হয়েছে সুর-রিয়ালিস্ট বা অধিবাস্তবতাবাদী আন্দোলন হিসাবে। এই আন্দোলনের উদ্ভব বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে যা উদ্ভূত হয়েছিল ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং গুস্তাভ ফ্লবেয়ারকে যার পথিকৃৎ মনে করা হয়। বাস্তবতাবাদী নাট্য-আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ইবসেন বা জর্জ বার্নার্ড শ সমাজসমস্যামূলক বা বাস্তব জীবননির্ভর যে নাটক-রচনা করেছেন তার প্রতিক্রিয়াতেই পরবর্তীকালের নাট্যকারগণ খুঁজেছেন জীবনের প্রতীকী রূপ, বাস্তব ঘটনাবাহুল্য তাতে লক্ষণীয়ভাবে স্তিমিত হয়ে এসেছে—প্রাধান্য পেয়েছে জীবনের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। কাব্যিক অনুভূতি বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের সময় রূঢ়ভাবে

বর্জন করা হয়েছিল, এখন তার প্রতিক্রিয়াতেই নাটক অনেক কাছাকাছি চলে এলো কবিতার।

দ্বিতীয়ত, এই ধরনের নাটকে ধরতে চাওয়া হল জীবনকে সমগ্রভাবে। কাব্যনাট্যের যাঁরা পথিকৃৎ তাঁরা মনে করেন, সাধারণ নাটকে জীবনের তাৎক্ষণিক রূপ ও সাময়িক সমস্যাকে ধরা হয়, পূর্ববর্তী যে-কোন নাটকেই তাই হয়েছে। নাটক হিসাবে গ্রীক নাটক এবং শেক্‌স্‌পীরীয় নাটক নিশ্চয়ই সফল, কিন্তু জীবনের যে এক সামগ্রিক রূপ আছে, মানুষের চিরকালীন সমস্যা বলে যে সমস্যাগুলি আছে, তার প্রতি নাটক এতদিন সুবিচার করেনি। বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের প্রধান নাট্যফসল যিনি উপহার দিয়েছেন, সেই বার্নার্ড শ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়—সমস্যা যতটা তাৎক্ষণিক ও আংশিক, ততোটা সামগ্রিক নয়।

তৃতীয়ত, এই জাতীয় নাটকের কালচেতনাও লক্ষ করবার মতো। গ্রীক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল নাটকের আলোচনায় যে তিনটি ঐক্যের কথা বলেছেন, তার মধ্যে কালগত ঐক্যও একটি। তিনি ট্র্যাজেডি নাটকের ঘটনাকালের এক সময় সীমাও নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কাব্যনাট্যের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা বলতে চাইলো জীবনের এমন কিছু সমস্যা আছে যাকে কালসীমায় বাঁধা যায় না—তা অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে; সুতরাং নাট্যঘটনার কাল এই বিশাল পরিসরে পরিব্যাপ্ত না হলে জীবনের ও সমস্যার পূর্ণরূপ বোঝা যাবে না।

চতুর্থত, মূলত কবিরাই এগিয়ে এলেন কাব্যনাট্য রচনা করতে। এঁরা যদিও প্রায় সকলেই বলে থাকেন, যে জিনিস তাঁরা রচনা করছেন তা নাটক—জীবনের অন্তর্নিহিত নাটক, তবু কবি না হলে এই ধরনের নাটকের উপজীব্য সমস্যার প্রকৃতি সঠিকভাবে ধরতে পারা সম্ভব নয়, তাই কবিরাই এই নতুন ধরনের বা নতুন শিল্পগোত্রের নাটকের জন্মদাতা হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

পঞ্চমত, এই ধরনের নাটকে প্লট বা বৃত্ত রচনার গুরুত্ব অনেক কমে এসেছে। কারণ, জীবনের সামগ্রিক সত্য ও আত্মিক অনুসন্ধানই যেখানে মুখ্য ব্যাপার সেখানে বানানো ছকের প্রতি আনুগত্য আশাই করা যায় না।

ষষ্ঠত, এই ধরনের নাটকের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে একটা কথা বোঝা দরকার। প্রাথমিকভাবে নাটক ছিল পদ্যমাধ্যমনির্ভর, কিন্তু নাটককে জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসতে যে কথ্যমাধ্যম বা গদ্যমাধ্যমের শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন, গ্রীক নাটকের প্রতিভাবান স্রষ্টারা সে কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন। শেক্‌স্‌পীয়রও অবশ্যই সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন, নতুবা এতদিন ধরে নাটকগুলি আমাদের চিত্তবিনোদনে সমর্থ হতো না। পদ্য এক ধরনের নির্দিষ্ট সময়ান্তর ছন্দস্পন্দ মেনে চলে, গদ্যে সেই নির্দিষ্ট সময়ান্তর ছন্দস্পন্দ না থাকলেও ছন্দস্পন্দ একটা আছে—যদিও তা অনিয়মিত। আমাদের কথাবার্তাতেও অনেক সময়ই সেই অনিয়মিত ছন্দস্পন্দ থাকে। আগেকার দিনে পদ্য সংলাপাশ্রয়ী সমর্থ নাট্যকারগণ

কথ্যভাষার সেই অনিয়মিত ছন্দস্পন্দ বা Rhythmকে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁদের নাটকের ভাষায়, ফলে তা জীবনের অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের সময় এবং গদ্যমাধ্যমের প্রতিষ্ঠার পর নাটকে কঠিন ও কঠোর গদ্য এসে গেল মাধ্যম হিসাবে। এতে জীবনের আংশিকতা বা সাময়িক উত্তেজনা ফুটিয়ে তুলবার মাধ্যম একটা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু বহির্জীবনের সঙ্গে অন্তর্জীবনের যে অন্তর্লীন সমস্যার যোগফলে এক সমগ্র জীবননাট্যের সৃষ্টি হয় তার রূপ ধরবার ক্ষমতা সে ভাষায় থাকলো না। এর জন্য প্রয়োজন সংকেতময় ব্যঞ্জনাধর্মী একরকম গভীর ভাষা—উচ্চস্তরের কবিপ্রতিভাই যে ভাষা সৃষ্টি করতে পারে।

সপ্তমত, কাব্যনাট্যের স্রষ্টারা যে কথা বলেননি কিন্তু নিষ্ঠ পাঠক যে কথা বুঝতে পারেন তা হল, সাহিত্যধর্মে এরা ততোটা নাটকীয় নয়, যতোটা কবিতা। জীবনের দৃশ্য ও অভিনেয় রূপ, জীবনের 'বক্তব্য' অনুভূতি অপেক্ষা তার অন্তর্লীন রূপ, কিছু 'অবাক্তব্য' অনুভূতিই কাব্যনাট্যকার আশ্রয় করতে চান। ফলে অনুভূতিশীল একক পাঠকের মনে তারা যে সংবেদন জাগায়, অত্যন্ত স্পর্শকাতর একদল দর্শককেও তার অভিনয় দেখিয়ে ততোটা অভিভূত করতে পারে না। এই কারণেই সমালোচকগণ এ নিয়ে এখনও বিবাদ করছেন যে কাব্যনাট্যকে আমরা closet drama কিম্বা Reading drama বলবো না কেন—একাকী নির্জন পাঠেই তো তা বেশি উপভোগ্য!

কাব্যনাট্যের সজীব সম্ভাবনাকে বাস্তবতার দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইংরেজি সাহিত্যে টি. এস্. এলিয়ট, এ কথা প্রায়ই বলা হয় এবং সে কথা অনেকটাই ঠিক। কবি এলিয়ট কাব্যের আসর ত্যাগ করে নাটকের মঞ্চে এসেছিলেন সচেতন ভাবেই, তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল আয়াম্বিক ছন্দস্পন্দের ভাষা। মঞ্চে এসেছিলেন বলাটা একটু ভুল হল বোধ হয়, তিনি এসেছিলেন গীর্জায়—তাঁর 'মার্ডার ইন দি ক্যাথেড্রাল' অবশ্যই ধর্মীয় নাটক। তবে প্রতিষ্ঠার আগেও একটা প্রস্তুতির পর্ব থাকে এবং তারও আগে থাকে বোধহয় সম্ভাবনার অস্তিত্ব। সপ্তদশ শতকের কবি জন মিলটন প্রাচীন গ্রীক নাটক অনুসরণ করে লিখেছিলেন যে নাটক 'স্যামসন অ্যাগনিস্টেস' তার সঙ্গে এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথেড্রাল'-এর খুব একটা পার্থক্য বোধহয় নেই। ভিকটোরীয় যুগে কবি সুইনবর্ণও প্রায় একইভাবে লিখেছিলেন 'অ্যাটলান্টা ইন ক্যালিডন'। এলিয়টের ঠিক আগে ইয়েটসের ভাবগভীর নাটকগুলিও সার্থক কাব্যনাটক হিসাবেই বিবেচিত হতে পারে এবং এই একই সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে মেটারলিঙ্ক এবং সিঞ্জের নাম।

ইংরেজি নাটকের ক্ষেত্রে কাব্যনেট্যের প্রধান পুরুষ হিসাবে যেমন স্বীকার করা হয় এলিয়টকে তেমনি প্রায় এক ধরনের সম্মানই পেয়ে থাকেন স্পেনের লোরকা,

ফ্রান্সে ক্লোদেল ও কক্‌তো, ইটালিতে দানুনৎসিও এবং জার্মানিতে হফমানস্থাল প্রভৃতি।৭

বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাট্য এখনও বিশেষভাবে পরিণত, এ কথা বলা শক্ত। সার্থক কাব্যনাট্য রচয়িতা হিসাবে বুদ্ধদেব বসুর নাম আমরা করতে পারি। তাঁর 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' 'অনাম্নী অঙ্গনা,' 'প্রথম পার্থ', 'সংক্রান্তি' এবং 'কাল সন্ধ্যা' কাব্যনাট্যের সূচনারেখা নির্দেশ করবে বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' বা 'বিদায় অভিশাপ' কিম্বা 'গান্ধারীর আবেদন' জাতীয় রচনাকে কাব্যনাট্য বলা ঠিক হবে কিনা এ বিষয়ে সমালোচকদের যতোই সংশয় থাক, প্রকৃত কাব্যনাট্যের বীজ যে এদের মধ্যেই নিহিত আছে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।৮

কাব্যনাট্যের চর্চা বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে একেবারে তুচ্ছ করার মতো নয়। বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে এর সফল মঞ্চরূপ আমরা দেখেছি। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'অ্যাবসার্ড' নাটকও অভিনয়-সাফল্য লাভ করেছে। রাম বসু, আলোক সরকার, পূর্ণেন্দু পত্রী, কৃষ্ণ ধর প্রভৃতি কাব্যনাট্য রচনায় এখন উল্লেখযোগ্য নাম।

ঝ. নাটকীয় একোক্তি

ইংরেজি কাব্যের প্রভাবে বা দৃষ্টান্তে বাংলা কবিতায় যেসব বৈচিত্র্য দেখা গিয়েছে তাদের অন্যতম, নাটকীয় একোক্তি বা Dramatic Monologue। মধুসূদন দত্তের পত্রকাব্য 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' যেমন একক পত্রের মাধ্যমে এক-একটি পৌরাণিক নারী নিজেদের প্রণয় বা অন্যান্য অনুভূতি ব্যক্ত করেছে, এই ধরনের কবিতাতেও কোন চরিত্র অন্য কারো কাছে নিজের মনোভাব প্রকাশ করে। আত্ম-ভাষণ বা soliloquy-র সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, আত্মভাষণে অন্য চরিত্রের উপস্থিতি ছাড়াও কোন ব্যক্তি নিজের মনে স্বগত সংলাপ উচ্চারণ করতে পারে। কিন্তু নাটকীয় একোক্তিতে একজনের অনুভূতি প্রকাশের সময় আমাদের অন্য চরিত্রের উপস্থিতি সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহ উপস্থিত হয় না। এমনকি একথাও বলা যেতে পারে যে, অনেক সময় অন্য চরিত্রের জন্যই বা অন্যচরিত্র কর্তৃক উদ্বুদ্ধ এবং প্ররোচিত হয়েই এই চরিত্র একোক্তি করে যায়। মনে রাখতে হবে, নামে নাটকীয় একোক্তি হলেও আসলে এটি কাব্যিক ব্যাপার। নিজের মনের অনুভূতি ব্যক্ত করা হয় বলে একে হয়তো মন্ময় কবিতা বলাই শোভন হতো, কিন্তু যেহেতু এর মধ্যে একটি নাটকীয় সজ্জা আছে—অর্থাৎ অন্য চরিত্রের প্ররোচনা বা উপস্থিতি এবং আত্মকথনের পরিবর্তে অন্য কারো প্রতি সংলাপ, সেজন্য একে তন্ময় কবিতার একটি শাখা হিসাবে গ্রহণ করাই সংগত হবে বলে মনে হয়।

ইংরেজি সাহিত্যে নাটকীয় একোক্তির বেশ কিছু ভালো নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে রবার্ট ব্রাউনিং-এর বেশ কিছু কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যথা 'দি লাস্ট রাইড টুগেদার', 'ফরফিরিয়াজ লাভার', 'মাই লাস্ট ডাচেস' প্রভৃতি। এলিয়টের 'জেরোনেশন' কবিতাটিও একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এই জাতীয় কবিতার শ্রেষ্ঠ শিল্পী যে ব্রাউনিং, সে কথা প্রায় নির্দ্বিধায় বলা যায়। বাংলায় এই ধরনের কবিতার সংখ্যা অল্প, তবে একেবারে সেই এমন কথা বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে', যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'চাষীর ঘরে', মোহিতলাল মজুমদারের 'নাদির শাহের শেষ' প্রভৃতি বাংলা কবিতায় নাটকীয় একোক্তির উদাহরণ।

তন্ময় কবিতার সূক্ষ্ম বিভাগ বর্ণনা করতে গেলে আরো যে কিছু শ্রেণীর সন্ধান পাওয়া যাবে না এমন নয়, তবে সাহিত্যের প্রবেশিকা-গ্রন্থের পক্ষে তা আত্যাবশ্যক নয় বলে আমরা অতঃপর সাহিত্যের অন্যতম প্রধান প্রকরণ নাট্য-সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি।

পঞ্চম অধ্যায় নাটক

ক. সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে নাটকের বিশেষ গুরুত্ব—নাটকের দ্বন্দ্বময়তা—নাটকের বস্তুধর্মিতা—নাটকের দৃশ্যত্ব বা অভিনেয়ত্ব: এ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণা—নাটককে সম্মিলিত শিল্পকলা বলার কারণ—অভিনয়ের ওপর নাটকের শিল্পসাফল্য নির্ভর করে কেন॥ খ. নাটকের উৎস ও প্রাচীনত্ব—এ বিষয়ে প্রাচ্য ধারণা—এ বিষয়ে পাশ্চাত্য ধারণা—গ্রীক নাটক থেকে ইংরেজি নাটকের বিবর্তন॥ গ. বাংলা নাটকের জন্ম—সংস্কৃত নাটকের আদর্শ—বাংলা নাটকে সংস্কৃত আদর্শ রক্ষিত হয়েছে কিনা—মধ্যযুগীয় যাত্রা ও পালাগান—যাত্রাগানের সঙ্গে বাংলা নাটকের সম্পর্ক—বাংলা নাটকের সঙ্গে পাশ্চাত্য থিয়েটারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ কিনা—পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ: ত্রিবিধ ঐক্য—ত্রিবিধ ঐক্য এবং গ্রীক, ইংরেজি ও বাংলা নাটক। ঘ. নাটকীয়তা কাকে বলে—অতিনাটকীয়তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ—নাট্যশ্লেষ বলতে কী বোঝায়॥ ঙ. নাট্যিক দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বিচার—বাহ্যিক দ্বন্দ্ব—দৈব, রাজশক্তি বা সমাজশক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তির একক সংগ্রাম—দুটি একক মানুষের দ্বন্দ্ব—দুটি ভাব বা আদর্শের দ্বন্দ্ব—ব্যক্তির অভ্যন্তর দ্বন্দ্ব। চ. নাটকের বৃত্তগঠন সম্বন্ধে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়: নাটকের পরিমিত আয়তন—পূর্ণাঙ্গ নাটকের বিভাগ-বণ্টন—গ্রীক নাটকের অঙ্গবিভাগ—সংস্কৃত নাটকের অঙ্ক বিভাগ—ইংরেজি নাটকের অঙ্ক বিভাগ—ইংরেজিতে সনাতন পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ নাটকের অঙ্ক বিভাগের বিস্তৃত প্রকৃতিব্যাখ্যা: Exposition—Rising action—Climax—Falling action—Catastrophe—বাংলা ও ইংরেজি নাটক সহযোগে এইসব অঙ্কের প্রকৃতিব্যাখ্যা—নাট্যবৃত্তের পিরামিড-গঠন—এই গঠনের সমালোচনা ও ব্যতিক্রম—সমান্তর ও বিপ্রতীপ বৃত্তগঠন॥ ছ. নাটকের চরিত্রসৃষ্টি—'চরিত্র' সৃষ্টির মূলকথা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শ—চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য: সংহতি—অপ্রয়োজনীয় আচরণ ও সংলাপ বর্জন—নৈর্ব্যক্তিক মনোভঙ্গি—অ্যারিস্টটলের ধারণা—সংস্কৃত আলংকারিকদের নির্দেশ—নায়ক ও নায়িকা চরিত্র—খলনায়কের চরিত্র—হাস্যরসাত্মক চরিত্র—পার্শ্ব-চরিত্র। জ. নাটকের সংলাপ—ভাষারীতির বৈশিষ্ট্য দৃষ্টান্তসহ—স্বগতোক্তি॥ ঝ. নাটকের বিভিন্ন প্রকৃতির বিভাগ॥ ঞ একাঙ্ক নাটকের সাধারণ পরিচয়—বাংলা নাটকে এর পূর্বাভাস—একাঙ্ক নাটকের লক্ষণ—একটি একাঙ্ক নাটকের পরিচয়॥ ট. ট্র্যাজেডির সাধারণ পরিচয়—ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডি নেই কেন—ট্র্যাজেডির লক্ষণ: অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা—বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডি—একটি বাংলা ট্র্যাজেডির বিশ্লেষণ॥ ঠ. কমেডির লক্ষণ—কমেডির বিভিন্ন বিভাগ—বাংলা কমেডি—একটি বাংলা কমেডির ব্যাখ্যা। ড. ঐতিহাসিক নাটকের সাধারণ পরিচয়—এ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের অভিমত—ঐতিহাসিক নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ—একটি বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের বিশ্লেষণ।। চ পৌরাণিক নাটক—পৌরাণিক নাটকের বিশিষ্ট লক্ষণ—একটি বাংলা পৌরাণিক নাটকের বিচার॥ ণ. সামাজিক নাটকের সাধারণ পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য—একটি বাংলা সামাজিক নাটকের বিশ্লেষণ।। ত. লোকনাট্য—লোকনাট্যের কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ।। থ. রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক—এই দুই ধরনের নাটকের পার্থক্য—বাংলায় রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক—একটি বিশুদ্ধ রূপক নাটকের বিচার—একটি বিশুদ্ধ সাঙ্কেতিক নাটকের বিচার।। দ. নাট্য-আন্দোলন—নাট্য-আন্দোলনে উদ্ভূত কিছু বিশিষ্ট শ্রেণীর নাটক।

ক. সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে নাটক

সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে সম্ভবত নাটকই একমাত্র প্রকরণ যার সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি এবং প্রায় সর্বজনস্বীকৃত শিল্পরূপ বা art-form আছে। শিল্পরূপের বৈচিত্র্য আছে অনেক রকম, স্বাধীনতাও কিছু আছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তাকে প্রাথমিকভাবে উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধ হতে হবে—এই প্রাথমিক শর্ত এখনও পর্যন্ত কেউ ভঙ্গ করেননি। অর্থাৎ উপন্যাস রচনায় যেমন বিভিন্ন শিল্পরূপের পরীক্ষা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে একালের সুবোধ ঘোষ পর্যন্ত যেমন সংলাপের অংশ কখনও কখনও নাটকের মতো উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধেই রচনা করেছেন—নাটক সেভাবে কখনও সামান্যতম অংশেও সংলাপ বর্জনের দুঃসাহসিকতা দেখাতে পারেনি। অবশ্য তা বলে একথাও সত্য নয় যে নাটকের শিল্পরূপ বজায় রাখলেই, অর্থাৎ উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধে রচনা করলেই, তা নাটক হবে। সাহিত্য-প্রকরণের একমাত্র আশ্রয় সংলাপ, সেখানে সংলাপের গুরুত্ব যে কতো বেশি সে কথা উপযুক্ত স্থানে ব্যাখ্যা করা যাবে।

নাটকের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব কাকে দেওয়া যেতে পারে এ বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। অনেকেই মনে করেন নাটকের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তার দ্বন্দ্বময়তা। জীবন যখন শান্ত ও নির্দ্বন্দ্ব, তখন সেই জীবনের অনুভূতি নিয়ে কবিতা লেখা যায়, উপন্যাসও লেখা যেতে পারে, কিন্তু যে জীবন দ্বন্দ্বময় নয় তা নাটকের বিষয় হতে পারে না। এই দ্বন্দ্ব অবশ্য স্থূল ও বাস্তব সংগ্রামের না হয়ে ভাবগত বা আদর্শগত হতে পারে—আধুনিক নাটকে সেটাই আমরা আশা করি, কিন্তু নাটকের পক্ষে দ্বন্দ্ব অপরিহার্য।

অনেকে মনে করেন নাটকের প্রধান গুণ তার objectivity বা বস্তুধর্মিতা। কবিতায় কবি তাঁর মনের অনুভূতি স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারেন, উপন্যাসেও লেখক নিজে উপন্যাসের পটভূমি বর্ণনা করতে পারেন, চরিত্রগুলির মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পারেন—কিন্তু নাট্যকারের অধিকার অনেক সীমিত। তাঁর হাতে থাকে কেবল কিছু চরিত্র, তাঁর যাবতীয় বক্তব্য প্রকাশ করতে পারে সেই চরিত্রগুলিই। কিন্তু এক্ষেত্রেও নাট্যকার তাঁর নিজের বক্তব্য চরিত্রগুলির মাধ্যমে যেমন খুশি প্রকাশ করতে পারেন না, কারণ চরিত্র একবার সৃষ্টি হয়ে গেলে চরিত্রগুলির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও তৈরি হয়ে যায়। কাজেই তারা কী বলতে পারে বা কী আচরণ করতে পারে তার একটা ধারণা আমাদের মনে তৈরি হয়ে যায়। কোন চরিত্র তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কথা না বললেই তা আমাদের অসংগত লাগে। এই জন্যই নাট্যকারকে বস্তুধর্মী দৃষ্টি বজায় রাখতে হয়, দর্শকের যেন কখনই মনে না হয় যে চরিত্রগুলি নাট্যকারের হাতের পুতুলমাত্র—নাট্যকারের কথাই তারা বলে যাচ্ছে। কবির বিভিন্ন কবিতা পড়ে তাঁর সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমরা লাভ করতে পারি কিন্তু নাট্যকার তাঁর কোন নাটকেই নিজেকে ধরা দেবেন না, এটাই তাঁর

সাফল্যের অন্যতম উপায়। এই গুণেই শেক্‌স্‌পীয়র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং সে কথা ম্যাথু আর্নল্ড তাঁর একটি কবিতায় উল্লেখও করেছেন।

অবশ্য নাটকের সঙ্গে অন্যান্য সাহিত্য-প্রকরণের একটা প্রধান পার্থক্য, এবং তাকে নাটকের বিশিষ্ট প্রকৃতিও বলা যায়, নাটকের দৃশ্যত্ব বা অভিনেয়ত্ব। এই প্রধান লক্ষণটিকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, প্রাচীন-আধুনিক সমস্ত সমালোচকই সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। সংস্কৃত আলংকারিকেরা নাটককে অন্যান্য প্রকরণ থেকে পৃথক করবার জন্য একে আখ্যা দিয়েছেন 'দৃশ্যকাব্য'। আধুনিককালে বঙ্কিমচন্দ্রও নাটকের বিষয়গত পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, জীবনের যে অনুভূতি দৃশ্য— অর্থাৎ কথায় ও আচরণে যা অন্যের কাছে ব্যক্ত হতে পারে, একমাত্র তাই নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত হওয়া উচিত। গ্রীক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল নাটক বলতে প্রধানত গুরুত্ব দিয়েছেন ট্র্যাজেডিকে এবং ট্র্যাজেডির যে সংক্ষিপ্ত গভীর আলোচনা করেছেন তাঁর ক্ষুদ্রায়তন 'পোয়েটিকস্' গ্রন্থে, তাতে অভিনেয়ত্বকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর উল্লিখিত নাটকের ছটি অঙ্গের মধ্যে তিনটি অঙ্গ হল দৃশ্যসজ্জা, বাচন এবং সংগীত—যাদের দৃশ্যত্ব সৃষ্টি করার উপাদান হিসাবেই ভাবা যেতে পারে। এই তিনটি উপাদান ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল যা বলেছেন তার ইংরেজি ভাষান্তর পড়লেই এ কথা বোঝা যাবে—"The spectacle (or stage-appearance of the actors) must be some part of the whole,···Here by 'Diction' I mean merely this' the composition of the verses ; and by 'Melody' what is too completely understood to require explanation,"

আসলে উৎকৃষ্ট কবিতা একাকী পাঠ করেই নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়, ভালো উপন্যাস বা ছোটগল্প সম্পর্কেও সেই একই মন্তব্য করা যায় কিন্তু, কোন কোন নাটক পড়তেও ভালো লাগে, একথা মেনে নিয়েও বলতে হবে অভিনয়ের সাফল্যের ওপরই নাটকের উৎকর্ষ নির্ভর করে। এই কারণেই নাটককে performing art, composite art ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে ওয়ার্স্‌ফোল্ডের মন্তব্য: "The drama is thereore, a composite art in which the author, the actor and the stage manager all combine to produce the total effect." অনেক সময় অভিনয়ের দিক থেকে অনেক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের নাটকও তেমন সফল হয় না যেমন সাফল্য লাভ করে অপেক্ষাকৃত কম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের নাটক এবং সেই ঘটনার উল্লেখ করে অনেক সমালোচক নাটকের দৃশ্যত্বের বা অভিনেয়ত্বের ব্যাপারটাকে লঘু করতে চান। অভিনয়ের ব্যর্থতা যদি অভিনেতাদের ব্যর্থতা না হয় তবে কিন্তু তাকে নাটকেরই ব্যর্থতা বলতে হবে, তার প্রাথমিক কারণ নাটক অভিনীত হবার জন্যই লেখা হয়— পাঠ করবার জন্য নয়, হলে তাতে মঞ্চনির্দেশ থাকতো না। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ

কারণ হল, অভিনয়ে ব্যর্থ হওয়া মানেই চরিত্রগুলি দর্শকের কাছে তাদের আচরণে ও সংলাপে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি, কাহিনী তাঁদের আকর্ষণ করেনি এমনও হতে পারে। বিষয়বস্তু নির্বাচনে নাট্যকার যথেষ্ট যত্নবান হননি, চরিত্রের সংলাপ যাতে চরিত্রের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক হয় সে কথা ভাবেননি, অথবা নাটকের বস্তুধর্মিতা বজায় রাখবার ব্যাপারে বেশি উৎসাহ দেখাননি—ইত্যাকার বহুবিধ কারণেই এ ব্যাপার ঘটতে পারে; কিন্তু অভিনয় আকর্ষণীয় না হলে সে ত্রুটি নাট্যকারেরই—এ কথা নাট্যকার যতো বেশি মনে রাখবেন ততোই তাঁর এবং নাটকের মঙ্গল। আধুনিককালের পাশ্চাত্য সমালোচকগণ এই কারণেই নাটকের অভিনেয়ত্ব বা দৃশ্যত্বের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। এলিজাবেথ ড্রু-এর মতে—"Drama is the creation and representation of life in terms of the theatre." মার্জারি বোলটনের মত, "It is a literature that walks and talks before our eyes."

অভিনয়কে সংস্কৃত আলংকারিগণও যে অত্যন্ত মূল্য দিতেন তা এই প্রকরণের 'দৃশ্য কাব্য' নাম থেকেই বোঝা যায়। তাছাড়া নাট্যাচার্য ভরত যে নাট্যসৃষ্টিকে 'রূপক' আখ্যা দিয়েছেন তার মূলেও এর অভিনেয়ত্ব। অভিনেতা এখানে অন্যের রূপ গ্রহণ করে অভিনয় করেন বলেই একে বলা হয়েছে রূপক। অভিনয় সম্বন্ধে সংস্কৃত আলংকারিদের বিশেষ নির্দেশেও বোঝা যায় একে নাটকের পক্ষে কতো তাৎপর্যপূর্ণ তারা মনে করতেন। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুযায়ী চার রকম অভিনয়ের কথা তারা বলেছেন—আঙ্গিক (অর্থাৎ আচার-আচরণ ও অঙ্গবিক্ষেপের দ্বারা অভিনয়), বাচিক (বাক্য দ্বারা অর্থাৎ সঠিক সংলাপের উচ্চারণের দ্বারা অভিনয়), আহার্য (সাজসজ্জার দ্বারা মায়া সৃষ্টি করা) এবং সাত্বিক (অভিনয়ের দ্বারা অনুভূতি সৃষ্টির প্রতি সজাগ থাকা)।

খ. নাটকের উৎস

মহাকাব্যের মতো নাটকও এক সুপ্রাচীন সাহিত্য-প্রকরণ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসই বহু প্রাচীন। নাটকের সঠিক উৎস অর্থাৎ তার জন্মের প্রথম শুভক্ষণের' সন্ধান দেওয়া অসম্ভব। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত একে বলেছেন 'পঞ্চম বেদ', অর্থাৎ বেদের মতোই প্রাচীন। গ্রীক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল তাঁর পোয়েটিক্স্ রচনা করেছিলেন খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে, তখনই তিনি শ্রেষ্ঠ গ্রীক নাট্যকারদের নাটক পর্যালোচনার সুযোগ পেয়েছেন।

নাটকের উদ্ভব ঠিক কতোটা প্রাচীন, সে কথা বলা না গেলেও নাট্যসৃষ্টির আদিতে যে আছে নৃত্য এবং সংগীত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পুরাণ

অনুযায়ী ভারতীয় নাটকের আদি অভিনয় হয়েছিল দেবলোক। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয় উপলক্ষে মঙ্গলসূচক কিছু শ্লোকের পর যুদ্ধের কয়েকটি দৃশ্য অভিনীত হয়। এরপর ব্রহ্মার আদেশে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা একটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করলে বিভিন্ন বেদের অংশ সেখানে গীত ও অভিনীত হতে থাকে।

পুরাণের অলৌকিক তথ্যাদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও, আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানতে পারি এ দেশের অনার্য সম্প্রদায়ও নৃত্যগীতে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে নৃত্য এখনও অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং নৃত্যশিক্ষা অনেক পরিবারে আবশ্যিক বলেই গণ্য হয়। মনে হয় আর্যগণ ক্রমে এইসব নৃত্য ও সংগীত নিজেদের সমাজে গ্রহণ করেছিলেন এবং পরে কিছু সংলাপ যোজনা করে একে নাট্যের আকৃতি দিয়েছিলেন। এ বিষয়ে উৎসাহী গবেষকগণ মনে করেন ঋগ্‌বেদের অন্তর্গত যম-যমী, অগস্ত্য-লোপামুদ্রা, পুরুরবা-উর্বশী প্রভৃতি সূক্ত ভারতীয় নাটকের আদি উৎস। উপনিষদে এরকম নাটকীয় কাহিনী অবশ্য অনেক আছে, এদের মধ্যেও নাট্যবীজ আবিষ্কারের চেষ্টা করা যেতে পারে।

পাশ্চাত্য নাটকের জন্মভূমি যে গ্রীস এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে প্রাচীন গ্রীস পৃথিবীর শ্রেষ্ঠভূমিতে পরিণত হয়েছিল। পাণ্ডিত্যে ও দর্শনে যেমন তাঁরা অত্যন্ত অগ্রবর্তী ছিলেন, শিল্পসাহিত্যেও তাদের উন্নতি ঘটেছিল বিস্ময়কর ভাবে। অন্যান্য গ্রীক শিল্পকলার মতোই গ্রীক নাট্যকলারও প্রচুর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল প্রাচীনকালেই। গ্রীক নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বলেছেন, সমবেত সংগীত বা Choral song থেকেই নাটকের উৎপত্তি। ডায়োনিসাস দেবতার উদ্দেশে যখন কোন পূজাপাঠ হতো, তার অঙ্গ হিসাবেই নাটকের অভিনয় হতো। সমবেত সংগীত থেকে একক সংগীত-নির্ভর সংলাপ কীভাবে গ্রীক নাটকে আত্মপ্রকাশ করে এবং তারপর সংলাপ বলা অভিনেতার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, তার আভাস দিয়েছেন অ্যারিস্টটল।

খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রাচীনকালে ধর্মের সঙ্গে নাটকের সংযোগ ছিল অচ্ছেদ্য। মধ্যযুগে দক্ষিণভারত ও অন্যান্য স্থানে যেসব দেবমন্দির নির্মিত হয় তার সম্মুখ ভাগে একটি করে নাট্যমন্দিরও স্থান পায়। পূর্ব ভারতেও এই প্রথা ছিল। বাংলায় পুরণো যাত্রাপালা, কথকতা ইত্যাদিরও বিষয় প্রধানত ধর্মাশ্রিতই হতো, তবে বিদ্যাসুন্দর-নির্ভর লৌকিক পালাও কিছু দেখা যায়।

ইংরেজি নাটকের ইতিহাস খুব বেশিদিনের নয়। গ্রীক ও লাতিন ধ্রুপদী নাটকের আদর্শে মূলত শেক্‌স্‌পীয়রের হাতেই ইংরেজি নাটকের জয়যাত্রা শুরু, অবশ্য তার আগেও যে ইংরেজি ভাষায় নাট্যপ্রয়াস দেখা যায় না এমন নয়। উপযুক্ত পূর্বসূরীর অভাব সত্ত্বেও শেক্‌স্‌পীয়র শুধু যে ইংরেজি সাহিত্যে নাটকের প্রতিষ্ঠা ঘটালেন তাই নয়, নিজেই এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলেন। তিনি গ্রীক নাট্যকলা থেকে স্বতন্ত্র এক নাট্যাদর্শের সৃষ্টি করলেন যা ইংরেজি নাট্যাদর্শ বা শেক্‌সপীরীয়

রীতি নামে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। শেক্‌স্‌পীয়রের পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের শেরিডান ও গোল্ডস্মিথের নাম করা যেতে পারে। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই বাস্তবতাবাদী আন্দোলন ইংরেজি নাটকের এক দিক্‌-পরিবর্তন সূচিত করে। এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত উল্লেখযোগ্য নাট্যকারদের মধ্যে আছেন জন গল্‌স্‌ওয়ার্দি, জর্জ বার্ণার্ড শ, অস্কার ওয়াইল্ড প্রভৃতি।

গ. বাংলা নাটকের জন্ম এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ

বাংলা নাটকের জন্মলগ্ন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ, হেরাশিম লেবেডফ নামে এক রুশ নাট্যরসিক দুটি নাটকের বাংলা অনুবাদ তখন মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৌলিক বাংলা নাটকের জন্ম আরো অনেকদিন পরে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'-কেই বাংলা নাট্যচর্চার সূত্রপাত বলা চলে। অবশ্য মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি সমর্থ নাট্যকারদের আবির্ভাবে অল্পদিনের মধ্যেই বাংলা নাটক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাটকের মধ্যে কী ধরনের নাট্যাদর্শ নিয়ে বাংলা নাটক সৃষ্ট হয়েছে সে কথা জানা থাকলে বাংলা নাটকের বিচার ও সেই বিচারের একটা মানদণ্ড নিরূপণ আমাদের পক্ষে সহজ হতে পারে।

সংস্কৃত নাটকে একটি বিশেষ ক্রম ও আঙ্গিক—এবং সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলবার ব্যাপার আছে। এই ক্রমানুসারে প্রথমে থাকে মঙ্গলাচরণ, তারপর সভাপুজো, অতঃপর কবিসংজ্ঞা বা নাটকের বিষয় সম্বন্ধীয় কথা ও প্রস্তাবনা। মঙ্গলাচরণের সূত্রধার অবশ্যই একজন অভিনয়দক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হবেন এবং অভিনয় যাতে নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয় সেজন্য নান্দীপাঠ করবেন। অন্য দুটি ক্রম উপস্থাপিত হবার পর আরম্ভ হয় মূল নাটক। সংস্কৃত নাটকের ভাষা গদ্য বা পদ্য, অথবা পদ্যমিশ্রিত গদ্যও হতে পারে। তবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত নাটকেও সংস্কৃত বলবার অধিকার ছিল শুধু বিদ্বান পুরুষ চরিত্রের, মহিলা ও অন্যান্য পুরুষ চরিত্র সাধারণভাবে প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করতেন। নাটকের বিষয় সম্বন্ধে নির্দেশ ছিল তা পুরানখ্যাত বা কোন প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত হবে, অবশ্য কল্পিত কাহিনীর প্রতি কোনরকম নিষেধাজ্ঞা ছিল না। নাটকের নায়ক কেমন হবেন সে সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, তাঁরা হবেন চার শ্রেণীর—ধীরোদাত্ত, ধীরললিত, ধীরপ্রশান্ত অথবা ধীরোদ্ধত। 'কাব্যনির্ণয়' গ্রন্থে এই শ্রেণীগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে "যে নায়ক আত্মশ্লাঘা করে না, হর্ষবিষাদে অভিভূত হয় না, বিনয় দ্বারা গর্বকে প্রচ্ছন্ন রাখে ও

যাহা অঙ্গীকার করে তাহা নির্বাহ করে, তাহাকে ধীরোদাত্ত বলে। যথা—যুধিষ্ঠির ও রামচন্দ্র। যাহার নায়কসামান্য অনেক গুণ আছে, তাহাকে ধীর প্রশান্ত কহে। যথা ললিতমাধবাদিতে মাধবাদি। মায়াবী, উদ্ধত, চঞ্চল, অহংকার ও দর্পে পরিপূর্ণ ও আত্মশ্লাঘাপরায়ণ ব্যক্তি ধীরোদ্ধত। যথা—ভীমসেন। যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত, নম্র এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্ত, তাহাকে ধীরললিত বলে। যথা—রত্নাবলীতে বৎস রাজাদি।" নাটকের প্রধান রস হবে শৃঙ্গার বা বীর, বিকল্পে শান্ত রসও থাকতে পারে; কিন্তু করুণ রস কখনই থাকবে না। পূর্ণাঙ্গ নাটকে পাঁচটি থেকে দশটি অঙ্ক থাকতে পারে, অবশ্য প্রত্যেকটি অঙ্কে কটি গর্ভাঙ্ক থাকবে তার কোন স্পষ্ট নির্দেশ নেই।

বাংলা নাটক একেবারে সূচনায়, কিংবা বলা যেতে পারে অপ্রস্তুত সূচনা-পর্বে সংস্কৃত নাটকের আদর্শ মনে রাখার চেষ্টা করেছিল এবং তার ফলে তা আড়ষ্ট ও কৃত্রিম হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই সূচনা-পর্বের শক্তিশালী নাট্যকার মধুসূদন জানিয়েছিলেন যে তিনি 'সাহিত্য দর্পণ'-এ প্রদত্ত আচার্য বিশ্বনাথের নির্দেশ মেনে চলবেন না। পরবর্তীকালের বাংলা নাটকে কিছুদিন পর্যন্ত 'প্রস্তাবনা' নামে একটি পৃষ্ঠা উৎসর্গ করার প্রথা শুধু রক্ষিত হয়েছে, আর কিছু নয়।

যাত্রা ও পালাগানের একটা ঐতিহ্য অবশ্য বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে চিন্তা করা যায়। কারণ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক থেকেই পালাগানের প্রচলন গবেষক লক্ষ্য করেছেন। তবে লৌকিক পালাগান এবং নিম্নতর সমাজে মনসা, ধর্মরাজ বা শিব-ঠাকুরের পালা গাওয়ার রীতি আরো পূর্বের হতে পারে। উচ্চতর সমাজে কৃষ্ণ-বিষয়ক ও রামায়ণবিষয়ক পালা প্রচলিত ছিল। রামায়ণ অবশ্য পাঁচালি হিসাবেই গীত হয়ে আসছে—কৃত্তিবাস নিজেও ছিলেন পাঁচালি গায়ক। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' প্রভৃতিও নাট্য লক্ষণাক্রান্ত রচনা। সপারিষদ শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণলীলার অভিনয় দেখতেন, এ উল্লেখ আমরা পেয়েছি। এগুলিকে অবশ্য নাটগীতের পর্যায়ভুক্ত বলাই ভালো। এ থেকেই পালায় বাঁধা যাত্রার উদ্ভব ঘটে, কিন্তু তাতেও গানের সংখ্যা নিতান্ত কম থাকতো না বলে এগুলি পালাগান বা যাত্রাগান নামেই পরিচিত।

বাংলা মঞ্চনাটকের সঙ্গে মধ্যযুগে প্রচলিত তিনদিক খোলা প্রাঙ্গনে (অনেক সময় চারদিকই খোলা) উচ্ছ্বসময় সংগীতবহুল যাত্রাগানের সম্পর্ক অত্যন্ত কম। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দৃশ্যের সংখ্যা অনেক কমিয়ে এবং দৃশ্যসজ্জার ওপর একেবারেই গুরুত্ব আরোপ না করে বাংলা নাটককে যাত্রাগানের ঐতিহ্যে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যাত্রাগানের সঙ্গে বাংলা মঞ্চনাটকের যে বিশেষ কোন সংযোগ নেই এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

আসলে বাংলা নাটক থিয়েটার অর্থাৎ ইংরেজি নাটকের আদর্শেই যে গড়ে উঠেছে, এ কথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। নাটকের গঠনে, প্রয়োগে ও

আদর্শে ইংরেজি নাটক বা শেক্‌স্‌পীরীয় নাটকের দৃষ্টান্তই যে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে বরাবর, এ কথা রবীন্দ্রনাথ 'মালিনী' নাটকের ভূমিকায় বলেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতো সফল নাট্যকার ও সমর্থ নাট্যপ্রযোজক সুযোগ পেলেই তাঁর দলের নটনটীদের শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের অভিনয় দেখাতেন। করুণ রসের নাটক সংস্কৃতে ছিল নিষিদ্ধ সুতরাং করুণ রসাত্মক নাটক বা ট্র্যাজিক সংবেদনের বোধই আমরা পেয়েছি ইংরেজি নাটক থেকে। অবশ্যই কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রীক নাটকের ধারণা বা সনাতনপন্থী ধারণা কিছু বাংলা নাটকে রক্ষিত হয়েছে। যেমন গ্রীক নাটকের আদর্শ ত্রিবিধ ঐক্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে।

এই ত্রিবিধ ঐক্যের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেছেন অ্যারিস্টটল। তিনি বলেছেন আদর্শ নাটক রচনার জন্য তিনটি বিষয়ের ঐক্য বজায় রাখা দরকার—ক) কালগত ঐক্য বা Unity of Time, (খ) স্থানগত ঐক্য বা Unity of Place এবং (গ) ঘটনাগত ঐক্য বা Unity of Action. প্রথম ঐক্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে সমগ্র নাটকের ঘটনাকাল যেন চব্বিশ ঘণ্টার (single revolution of the sun) বেশি না হয়। স্থানগত ঐক্য বলতে বোঝায়, এমন দূরত্বের স্থান যেখানে ওই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নাটকের পাত্রীপাত্রীরা যাতায়াত করতে পারে। ঘটনাগত ঐক্য বলতে বোঝায়, নাটকটি যেন আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত একটি নিটোল কাহিনী হয় এবং এমন কোন সুর তাতে যেন না থাকে যাতে নাটকের মূল উদ্দিষ্ট সুর কেটে যায়।

গ্রীক নাটক, বলা বাহুল্য, এই ত্রিবিধ ঐক্য মেনে চলার চেষ্টা করেছে, ইংরেজি নাটক করেনি। উপন্যাসিক সমালোচক হাডসন বলেছেন, শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর দুটি-মাত্র নাটকে এই ঐক্য মেনে নিয়েছেন—The Tempest এবং The Comedy of Errors নাটকে। বাংলা নাটকে, এবং ইংরেজি নাটকেও, ঘটনাগত ঐক্যের ওপর কিন্তু সর্বদাই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে—যেখানে তা লঙ্ঘিত হয়েছে সেখানে রসবোধেরও হানি ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের উল্লেখ করা যায়। কৃষ্ণকুমারীর করুণ আত্মহননই এই নাটকের প্রধান ঘটনা এবং সেই কারণে এই নাটকের উদ্দিষ্ট করুণ রস, অথচ মদনিকা ও ধনদাসের উপাখ্যানগুলি দর্শকের মনোহরণ করবে বুঝতে পেরে নাট্যকার মাত্রাজ্ঞান রাখতে পারেননি—বেশি মাত্রায় এই হাস্যরস পরিবেষণ করতে গিয়ে ট্র্যাজিক সংবেদন কিছুটা ক্ষুণ্ণ করেছেন। সাধারণভাবে স্থানগত ঐক্য বাংলা নাটকে মানা হয় না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই ঐক্য মেনে চলেছেন। অন্যান্য আরো অনেক দিকে পাশ্চাত্য নাটকের সঙ্গে নাটকীয় ধারণা ও আদর্শের সঙ্গে বাংলা নাটকের কতো মিল তা পরবর্তী আলোচনাক্রম থেকেই বোঝা যাবে।

ঘ. নাটকীয়তা, অতিনাটকীয়তা ও নাট্যশ্লেষ

নাট্যধারণার সঙ্গে যুক্ত কোন ঘটনা বা অনুভূতির পরিচয় পেলেই তাকে আমরা নাটকীয় বলে অভিহিত করি, আসলে তখন ব্যাপারটা আর নাটক থাকে না, হয়ে ওঠে একটা গুণ। দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ, যখন কোন উপন্যাসে সেই দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে ওঠে বা অসম চরিত্রের সাক্ষাৎজনিত একটি আসন্ন দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, আমরা বলি উপন্যাসে নাট্যগুণ দেখা দিয়েছে বা এই অংশ 'নাটকীয় সংঘাতপূর্ণ' হয়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা যখন শ্যামাসুন্দরীর জন্য গভীর রাতে বনে যায়, পুরুষ বেশী মতিবিবির সঙ্গে তার দেখা হয় এবং সে দৃশ্য নবকুমার দেখে ফেলে, আমরা বলি এই অংশ নাটকীয় উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আবার ডিহরিতে বিপর্যস্ত অচলা যে মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি বিহ্বল, তখন সকলকে নিয়ে মৃণালের সেখানে আসার ব্যাপারটাও চরম নাটকীয়।

অতিনাটকীয় বা Melodramatic কথাটি এখন নাটকের একটি ত্রুটি বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ উচ্চস্তরের কমেডি না হলে, মোটা দাগের হাসির নাটক হলে যেমন তাকে আমরা বলি ফার্স, তেমনি উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজেডি হয়ে না উঠলে সেই ব্যর্থতার জন্য নাটকটিকে আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি অতিনাটক বা মেলো-ড্রামা। আদিতে কিন্তু কথাটির অর্থ তা ছিল না। গ্রীক ভাষায় 'মেলো' শব্দের অর্থ গান, ফলে সংগীতসমৃদ্ধ সব নাটককেই বলা হতো মেলোড্রামা, অপেরাকেও। এখন সাধারণত ট্র্যাজেডি নাটকে যখন আমরা খুব চড়ামাত্রার চরিত্র দেখি—অর্থাৎ যে ভালো সে খুব ভালো, যে খারাপ সে খুব খারাপ, আমরা তাকে মেলোড্রামা বলি। যখন ঘটনা ঘটতে থাকে একের পর এক অনেকটা অবিশ্বাস্যভাবে, তাকেও আমরা মেলোড্রামা আখ্যা দিই—যেমনটি ঘটেছে 'নীলদর্পণ' নাটকের শেষের দিকে। এছাড়া যখন সাধারণ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা চলে না এমন কোন কাকতালীয় ঘটনা ঘটে—যথা কোন ঘটনা বা চরিত্রের আকস্মিক সাক্ষাৎকার, তখন তাকে আমরা মেলোড্রামা হিসাবে অভিহিত করি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে নিরঞ্জন যে বিনোদিনীকে খুঁজে পাবে এ কথা আমরা কেউই ভাবতে পারি না, অথচ তাদের সাক্ষাৎ ঘটে একেবারে অবিশ্বাস্য ও অযৌক্তিক উপায়ে। ঋত্বিক ঘটকের অসাধারণ ছবি 'সুবর্ণরেখার' উল্লেখও এখানে করা যায়। জীবনকে উপভোগের জন্য ভাই আসে রাতে ফূর্তি করতে, সে যে-কোন মেয়ের কাছেই যেতে পারতো—কিন্তু তা সে যায় না, তাকে পাঠানো হয় তার অত্যন্ত আদরের বোনের কাছেই। এই জাতীয় অবিশ্বাস্য যোগাযোগকেও আমরা মেলোড্রামা হিসাবে অভিহিত করি।

নাট্যশ্লেষ বা dramatic irony বলা হয় তাকে, যেখানে একটি ঘটনা শ্লেষের

মতোই দুটি অর্থ ব্যঞ্জিত করে। সাধারণত হয় কি, পূর্বে বলা একটি কথা ভবিষ্যতে সত্য হয়ে যায়, যা কোন মতেই সত্য হবার সম্ভাবনা ছিল না। একে সাধারণভাবে 'ভাগ্যের পরিহাস'-ও বলে থাকি আমরা। কৌতুক ও বিষণ্ণতা উভয়বিধ সংবেদন সৃষ্টির জন্যই নাট্যশ্লেষ ব্যবহার করা হয়। 'চিরকুমার সভা' নাটকে যখন চরিত্রেরা শৈলকে পুরুষ মনে করে অথচ দর্শক তার আসল সত্তা জানে, তখন সকৌতুক নাট্যশ্লেষ তৈরি হয়, আবার 'ওথেলো' নাটকে ডেসডিমোনা যখন তার সকল দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী ইয়াগো-কে সম্বোধন করে 'Good friend, Iago' হিসাবে, দর্শক শ্লেষের জ্বালা অনুভব করে, যদিও ডেসডিমোনা এ কথা বলে সরল বিশ্বাসেই।

ঙ. নাট্যিক দ্বন্দ্ব

দ্বন্দ্বই যে নাটকের প্রাণ, এ কথা পূর্বে একবার বলা হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে ঊনবিংশ শতকে বাস্তবতাবাদী নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ বার্ণার্ড শ অবশ্য দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন, নাটক মানেই 'Discussion, discussion and discussion only', কিন্তু পরবর্তীকালে ভাবপ্রধান ও সমস্যামূলক নাটকে এই মতবাদ টেঁকেনি। পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রীক নাটক থেকে শুরু করে শেক্স্পীরীয় নাটক এবং আধুনিক নাট্যসৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে দ্বন্দ্বহীন জীবন নাটকের বিষয়বস্তু হতেই পারে না, যদিও তার প্রকৃতি প্রাচীনকাল থেকে এখন পর্যন্ত অনেক পালটে গেছে, দ্বন্দ্বের তীব্রতা সম্বন্ধে লেখক ও পাঠকের ধারণারও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় গ্রীক নাটকের দ্বন্দ্ব ছিল মূলত বাইরের ব্যাপার। অর্থাৎ তার প্রকৃতি বাইরে থেকেও বেশ ভালো ভাবেই বোঝা যেতো, 'যদি জানতেম তোমার কিসের ব্যথা' গোছের একটা অতলশায়ী ও দ্বিধাদীর্ণ যন্ত্রণার ব্যাপার ছিল না; মানুষ তার পুরুষকারে একটা কিছু সম্ভব করবেই এবং অদৃশ্য দৈবশক্তি নিয়তিবিধান ও নিয়মশৃংখলা ভঙ্গ করে তাকে জয়ী হতে দেবে না—এই তপ্ত লড়াইটা গ্রীক নাটকে প্রায় সর্বদাই চলেছে। অনেকটা এ যুগের 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নায়ক রাবণের মতো লড়াই, 'একে একে নিবিছে দেউটি' জেনেও যিনি বিধাতার বরপুত্র রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইটা ছাড়তে পারেন না। এই লড়াই সেদিন যেমন দেখিয়েছে 'অয়দিপাউস', এযুগে দেখিয়েছে গিরিশচন্দ্রের মানসকন্যা জনা।

পরবর্তীকালে এই দৈবশক্তির বিরুদ্ধে একক ব্যক্তির সংগ্রাম এবং সেকারণে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়েছে। এক সময়ে রাজশক্তি ও শাসকশক্তি দৈবশক্তির বিকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তি বা পরিবারের সংগ্রাম উৎকৃষ্ট নাটকের বিষয় হয়েছে। 'নীলদর্পণ' নাটকে রাজশক্তির প্রতিভূ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে গোলোক বসুর পরিবার। রাজশক্তির

পরিবর্তে বৈশ্যশক্তি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন একক বা অসংগঠিত একাধিক মানুষের অস্পষ্ট প্রতিরোধের সংগ্রাম বাধতে পারে তাদের সঙ্গে, নবনাট্য আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নাটক 'নবান্ন' বা 'ছেঁড়া তারের' উল্লেখ করতে পারি আমরা এই প্রসঙ্গে। সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ব্যক্তির সংগ্রামেরই আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব। ঊনবিংশ শতকের ইংরেজি নাটকে বার্নার্ড শ এবং অন্যান্য নাট্যকারের রচনায় এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

নাটকীয় দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ পৃথক একটি দিক, দুটি একক মানুষের দ্বন্দ্ব। একটি মানুষের সঙ্গে অন্য এক মানুষের দ্বন্দ্বও বিভিন্ন কারণে হতে পারে—ক্ষমতালাভের দ্বন্দ্ব, খ্যাতিলাভের দ্বন্দ্ব, অর্থলাভের দ্বন্দ্ব। জুলিয়াস সীজারের সঙ্গে ব্রুটাসের দ্বন্দ্ব (জুলিয়াস সীজার), ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে রাজসিংহের দ্বন্দ্ব (আলমগীর), জাহাঙ্গীরের সঙ্গে নুরজাহানের বিচিত্র দ্বন্দ্ব (নুরজাহান), রমেশের সঙ্গে যোগেশের দ্বন্দ্ব (প্রফুল্ল)—সবই এই ধরনের ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের পর্যায়ে পড়তে পারে।

অবশ্য ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব যখন আদর্শের দ্বন্দ্ব হয়ে দাঁড়ায় তখন তার প্রকৃতিও কিছুটা বদলে যায়। সংগ্রামটা তখন ব্যক্তিগতই থাকে বটে আপাতত, কিন্তু তার প্রকৃতি হয় ব্যাপ্ত। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি পরস্পরের বিরুদ্ধে তীব্র সংঘাতেই লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে ক্ষমতালাভ, খ্যাতিলাভ বা অর্থলাভ—কোনটাই এর কারণ নয়, এর কারণ দুটি ভিন্ন আদর্শ। এখানে লড়াই দুটি ভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে। 'মালিনী' নাটকে দুই প্রিয় বন্ধু সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর যে একের বিরুদ্ধে অন্যে বিশ্বাসভঙ্গ করেছে, তারও কারণ এই আদর্শগত সংঘাত। আদর্শের মতোই দুটি ভিন্ন ভাবের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে—উপন্যাসে ও নাটকে যার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিনিয়ত পেয়ে থাকি, অন্তত আধুনিক সাহিত্যে।

দ্বন্দ্বের সবশ্রেষ্ঠ দিক হল ব্যক্তির আভ্যন্তর দ্বন্দ্ব। এখানে লড়াইটা ব্যক্তির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির নয়, লড়াইটা তার নিজের : এবং লড়াইয়ের প্রকৃতিটা এখানে 'রক্তকরবী'-র রাজার মতো এতো স্পষ্টও নয়। নিজের সঙ্গে নিজের লড়াই কতো তীব্র হতে পারে তার দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রায় প্রবাদ হয়ে আছে হ্যামলেটের স্বগতকথন :

> To be, or not to be—that is the question ;
> Whether 'its nobler in the mind to suffer
> The slings and arrows of outrageous fortune,
> Or to take arms aqainst a sea of troubles,
> And by opposing end them ?

হ্যামলেটে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সর্বোচ্চ স্তরে উঠেছে, কিন্তু এই দ্বন্দ্ব ম্যাকবেথের মধ্যেও ছিল, ইবসেনের নোরার মধ্যেও ছিল (এ ডলস্ প্লে), রবীন্দ্রনাথের বিক্রমদেব (রাজা

ও রানি) বা জয়সিংহের (বিসর্জন) মধ্যেও ছিল। বস্তুত অন্তর্দ্বন্দ্ব-বিক্ষত চরিত্রই আধুনিক নাটকের চরিত্র এবং ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্বই আধুনিক দর্শকের কাছে সবচেয়ে আস্বাদ্য নাটকীয় দ্বন্দ্ব।

চ. নাটকের বৃত্তগঠন

নাটকের শিল্পরূপ সুনির্দিষ্ট বলে নাটকের প্লট বা বৃত্তগঠনের নিয়মকানুনও মোটামুটিভাবে সংবদ্ধ। এ ব্যাপারে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের বিধিনিষেধের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যই আমরা লক্ষ করি। অবশ্য আধুনিককালে বিভিন্ন নাট্য-আন্দোলনের ফলে নাট্য-আঙ্গিকের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। এ ব্যাপারে উৎসাহী মানুষকে আধুনিক নাট্য-আন্দোলনসংক্রান্ত তথ্যাদির সংবাদ রাখতে হবে, সাহিত্য-প্রকরণের এই প্রাথমিক গ্রন্থের ওপর নির্ভর করাটা খুব যুক্তিযুক্ত হবে না।

নাটকের বৃত্তগঠনের নিয়ম যে নির্দিষ্ট, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে, নাটকের একটা পরিমিত আয়তন আছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা একেবারেই নেই, তা অনায়াসেই হতে পারে 'লা মিজারেবল' বা 'ওয়র এ্যাণ্ড পীসের মতো বিশাল, 'গোরা'-র মতো মহাকাব্যিক বা এ যুগের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর মতো বিশাল-কলেবর। বস্তুত আধুনিক উপন্যাসেই একটা দীর্ঘতা সৃষ্টির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তা করা সম্ভব সেটি পাঠ্য বলে, নাটক যেহেতু দৃশ্য এবং একেবারেই তা দেখে শেষ করতে হয়—অতএব কলেবর বৃদ্ধি তার পক্ষে সম্ভবও নয়।

নাটক কতো বড়ো হতে পারে সে সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের সুস্পষ্ট মত আছে। 'মহাকাব্যিকে পরিকল্পনা নিয়ে নাট্যরচনা'-র ঘোর বিরোধী ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালের নাট্যকার এবং নাট্যতাত্ত্বিকগণও নাটকের আয়তন সম্বন্ধে স্পষ্ট মতই ব্যক্ত করেছেন। শেক্‌স্‌পীয়র তাঁর বিভিন্ন নাটকের ভূমিকায় অভিনয়কাল দু-ঘণ্টা হওয়া বিধেয় বলে আভাস দিয়েছেন—দৃষ্টান্ত হিসাবে 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' বা 'হেনরী দা এইট্‌থ্' নাটকের উল্লেখ করা যায়। অবশ্য শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক দু-ঘণ্টায় মঞ্চস্থ করা সম্ভব কী না, সে কথা নাট্য-প্রযোজকরাই ভালো বলতে পারবেন।

নাট্যতাত্ত্বিক ফ্রেতাগের মতে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের পংক্তির সংখ্যা কখনোই দু হাজারের বেশি হওয়া উচিত নয় এবং কোন অঙ্কের পংক্তিসংখ্যাই হওয়া উচিত নয় পাঁচশোর বেশি। শেক্‌স্‌পীয়রের দুঘণ্টার হিসাব মনে রাখলে এটাই নাটকের আদর্শ মাপ হওয়া উচিত, অথচ তাঁর নিজেরই বিখ্যাত নাটকগুলির বেশির ভাগের আয়তন অন্তত এর দেড়গুণ। যেমন 'ওথেল্লো'-র পংক্তিসংখ্যা ৩৩১৭,

'কিং লিয়ার'-এর ৩৩৩২, আর 'আণ্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা'-র পংক্তিসংখ্যা ৩৯৯১।

এইভাবে পংক্তি দিয়ে বা সময় দিয়ে নাটকের আয়তন একেবারে গাণিতিক সূত্রের মতো স্থির করা না গেলেও, দর্শকনির্ভর শিল্প বলেই নাট্যাকারকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয় এর পরিমাপ সম্পর্কে। মুখ্যত সেইজন্যই সমগ্র কাহিনীকে তিনি বেশ কিছু দৃশ্যে বিভক্ত করে নেন। এই নির্বাচিত দৃশ্যাবলীর মধ্যে কেমন করে তিনি সমগ্র নাট্যকাহিনী উপস্থাপিত করবেন সেকথা তাঁকে চিন্তা করে নিতে হয়। অবশ্য এলোমেলোভাবে দৃশ্যগুলি তিনি সাজাতেও পারেন না, পূর্ণাঙ্গ নাটকে সাধারণত থাকে পাঁচটি প্রধান ভাগ বা অঙ্ক—সেই পাঁচটি অঙ্কে দৃশ্যগুলিকে তিনি বিন্যস্ত করেন। এইভাবে পাঁচ অঙ্কে এবং প্রতিটি অঙ্কের অন্তর্ভুক্ত কিছু দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কে সজ্জিত করার ব্যাপারটাকেই বলা যেতে পারে নাটকের 'প্লট কনস্ট্রাকশন' বা বৃত্তগঠন। নাটকের ক্ষেত্রে এই বৃত্তগঠনের প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন বলেই অ্যারিস্টটল নাটকের প্রধান ছটি উপাদানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন একে। কারণ, কেবলমাত্র কিছু দৃশ্যে নাট্যবস্তুকে সুসংহত করা নয়, পাঁচটি অঙ্কে তাদের সাজিয়ে দেওয়াতেই নাট্যকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না—কোন্ অঙ্কে নাটক ঠিক কতখানি অগ্রসর হবে এবং প্রতিটি অঙ্কের সঠিক গুরুত্ব কতোখানি, নাট্যকারকে তাও সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে। এইভাবেই নাট্যগঠনের পরিচয় তুলে ধরা যাক।

গ্রীক নাটকই সর্বপ্রাচীন বলে গ্রীক নাট্যকাহিনীর গঠনই আগে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। গ্রীক নাটক মোটামুটিভাবে চারটি অংশে বিভক্ত—প্রোলোগ, এপিসোড, এক্সোড এবং কোরাস। কোরাস আবার বিভক্ত থাকে দুটি বা তিনটি অংশে—প্যারোড অর্থাৎ কোরাসের প্রথম স্থিতি, কোরাসসংগীত বা স্ট্যাসিমন, কমোস (বা কোরাস) ও অভিনেতার বিলাপ। গঠন অনুযায়ী বর্ণনা করলে বলতে হবে—গ্রীক নাটক, অথবা আরো ঠিকভাবে বলতে গেলে গ্রীক ট্র্যাজেডি মূলত পাঁচটি ভাগেই বিভক্ত—একটি প্রোলোগ, তিনটি এপিসোড এবং একটি এক্সোড বা এক্সোডাস।

ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রকারদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য নাট্যাচার্য ভরত। পূর্ণাঙ্গ নাটকের অঙ্ক সংখ্যা তাঁর মতে পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত হতে পারে। তবে নাটকের বিভিন্ন অবস্থা এবং সেই অনুযায়ী যে সন্ধিগুলির কথা তিনি বলেছেন তাতে বোঝা যায়, নাটকের মূল গঠনে পাঁচটি অঙ্কই তাঁর অভিপ্রেত ছিল। যে-কোন নাটকের পাঁচটি প্রধান অবস্থা তাঁর মতে—আরম্ভ, প্রযত্ন, প্রত্যাশা, নিয়তাপ্তি এবং ফলাগম। এই পাঁচটি অবস্থা দেখাবার জন্য নাটকের পাঁচটি সন্ধির নামকরণ করেছেন তিনি যথাক্রমে মুখ বা উন্মেষ, প্রতিমুখ বা উন্নয়ন, গর্ভ বা সর্বোন্নয়ন, বিমর্ষ বা অবনয়ন এবং নির্বহণ বা সমাপ্তি। যেহেতু সংস্কৃত নাটক অপেক্ষা ইংরেজি নাটকের আদর্শই বাংলা নাটকে

বেশি গৃহীত হয়েছে, সংস্কৃত নাটকের এই সন্ধিগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করে ইংরেজি নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগের প্রতি আমরা কিছুটা বেশি উৎসাহ দেখাবো।

ইংরেজি নাটকের আদর্শ বলতে মূলত শেক্‌স্‌পীরীয় নাটকের আদর্শই বোঝায়, কিন্তু কোন নাটকের বিকাশই মূলহীন এবং নিরাশ্রয় নয়। ইংরেজি নাটকেরও মূল হিসাবে ধরতে হবে লাতিন নাটককে। বস্তুত লাতিন সাহিত্যে সেনেকার মহৎ ট্র্যাজেডিগুলি রেনেসাঁস-পর্বের ইংরেজি নাটককে, এবং শুধু ইংরেজি নাটক নয়—ইতালীয় ও ফরাসী নাটককেও, দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইংরেজি নাটকে যে পঞ্চাঙ্ক বিভাগকে স্বীকার করে নেওয়া হয় তার মূলে লাতিন কমেডিগুলির প্রভাব থাকাও অস্বাভাবিক নয় যেখানে ষোড়শ শতকেই তাদের পাঁচ অঙ্কের বিভাগ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য গ্রীক ট্র্যাজেডিও যে প্রকৃতিগত ভাবে পাঁচটি বিভাগই মেনে নিয়েছে, সেও এর আগে আমরা দেখেছি।

ইংরেজি নাটকের পঞ্চাঙ্ক বিভাগের সঙ্গে নাটকের নিজস্ব একটা অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, সেই সঙ্গে আছে নাটকের সুনির্দিষ্ট গতিবেগ। প্রত্যেক নাটকই আশ্রয় করে একটি দ্বন্দ্বকে—সে দ্বন্দ্ব শারীরিক, মানসিক, ভাবগত, আদর্শগত, সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত যাই হোক না কেন। মানুষের যুদ্ধ রাজা অয়দিপাউস বা রাণা ভীম সিংহের মতো ('কৃষ্ণকুমারী') অদৃষ্টের সঙ্গে হতে পারে, অথবা হ্যামলেট, ম্যাকবেথ বা জয়সিংহের ('বিসর্জন') মতো তাদের নিজেদের সঙ্গেও হতে পারে। নাটকের প্রথম অঙ্কে আমরা সেই দ্বন্দ্বের পরিচয়টি পেতে চাই, অন্তত তার সুস্পষ্ট আভাস, এবং সেই সঙ্গে মোটামুটিভাবে পরিচিত হতে চাই দ্বন্দ্বের দুই পক্ষের প্রধান চরিত্রগুলির সঙ্গে। যেমন 'ম্যাকবেথ' নাটকের প্রথম অঙ্কেই আমরা জেনে ফেলেছি সরল ও বলিষ্ঠ বীর ম্যাকবেথের সঙ্গে অপরিমিত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় মোহগ্রস্ত লেডি ম্যাকবেথের দ্বন্দ্বের আভাস। 'বিসর্জন' নাটকের প্রথম দৃশ্যেই রানী গুণবতীর একটি প্রাণকণিকা লাভের জন্য দেবীর কাছে প্রতি বছর চারশো প্রাণ বলি দেবার মানত থেকে এই দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। এই দ্বন্দ্ব যে প্রথাধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের, তার আভাস আমরা পেয়ে যাই এবং তা আরো স্পষ্ট হয় রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যের বিরোধে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'নূরজাহান' নাটকেও প্রথম অঙ্কেই জাহাঙ্গীরের রূপতৃষা এবং তার শিকার নূরজাহানের প্রতিহিংসার নারকীয় সংকল্পে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেখানে এই দ্বন্দ্ব স্পষ্টতা পায় না, শক্তিমান নাট্যকার হলেও সেখানে নাটক পুরোপুরি রসোত্তীর্ণ হতে পারে না, যেমনটি ঘটেছে শেক্‌স্‌পীয়রের 'হেনরী দা ফিফ্‌থ্‌' কিম্বা 'টেম্পেস্ট' নাটকে, কিম্বা দীনবন্ধু মিত্র-র 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে। প্রথম অঙ্কে নাটকের মূল দ্বন্দ্বটি উন্মোচিত হয় বলে একে বলা হয় Exposition বা উন্মোচন, তবে এই অঙ্ককে সাধারণভাবে প্রারম্ভ বা Inital Incident-ও আখ্যা দেওয়া হয়।

নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের সর্বজনপরিচিত নাম Rising action বা উত্তুঙ্গ ঘটনাক্রম। এর অন্য কয়েকটি প্রচলিত নাম Growth বা বৃদ্ধি এবং Complication বা জটিলতা সৃষ্টি। এরকম নামকরণের কারণ, প্রথম অঙ্কে যে বিরোধ উন্মোচিত করা হয়, দ্বিতীয় অঙ্কে উত্তরোত্তর তার জটিলতা বৃদ্ধি হতে থাকে, সমস্যার সমাধান ক্রমশ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে—অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনাক্রম সমস্যাটিকে জটিল থেকে জটিলতর করতে থাকে। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, ঘটনাক্রম অগ্রসর হবে অনিবার্য গতিতে কার্যকারণ-শৃঙ্খল মেনে। কারণ জৈবিক গঠনের জন্যই তার অনিবার্যতা দরকার এবং নাটক বা উপন্যাস যে-কোন কিছুর প্লট হতে গেলেই কার্যকারণ-শৃঙ্খল বজায় রাখতেই হবে, কেন না সেটাই প্লটের প্রাথমিক শর্ত। উদাহরণ হিসাবে আমরা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' স্মরণ করতে পারি। প্রথম অঙ্কের চারটি দৃশ্যে আমরা মূল দ্বন্দ্বের আভাস পেয়ে যাই। মগধের রাজপুত্র চন্দ্রগুপ্ত বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের দ্বারা বিতাড়িত ও নির্বাসিত হয়ে গ্রীক সম্রাট সেকেন্দর শাহের সৈন্যদলে গোপনে যোগ দিয়েছিলেন যুদ্ধ ও কূটকৌশল শেখার জন্য। নন্দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি পান আর এক নির্যাতিত ব্রাহ্মণ চাণক্যের আশীর্বাদ এবং মলয়রাজ চন্দ্রকেতুর সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ দ্বন্দ্ব এবং তার আসন্ন প্রাবল্যের ইঙ্গিত আমরা এখানে পেয়ে যাই। দ্বিতীয় অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে আমরা অনিবার্য গতিতেই দ্বন্দ্বটিকে জটিলতর এবং ভিন্ন মাত্রায় ঘনীভূত দেখতে পাই। সেখানে একদিকে যেমন চন্দ্রগুপ্ত নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে দুর্বল হয়ে পড়েছেন, অন্যদিকে চাণক্য তাঁর মাতা মুরাকে দিয়ে তাঁকে উদ্দীপ্ত করিয়ে যুদ্ধ করিয়েছেন এবং প্রায় পরাজয়ের মুখ থেকে ফিরে এসে চন্দ্রগুপ্ত নন্দকে বন্দী করেছেন। এই সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি ছায়ার আকর্ষণ এবং অ্যান্টিগোনসের প্রতি হেলেনের ঘৃণা সমস্যার মাত্রা বৃদ্ধি করে।

নাটকের তৃতীয় অঙ্কটির সাধারণ নাম Climax বা চরমোন্নতি। এই অঙ্ককে Crisis বা চরম সঙ্কট এবং Turning point বা পরিবর্ত-সীমাও বলা হয়ে থাকে। নাটকীয় দ্বন্দ্ব দ্বিতীয় অঙ্কে জটিলতর হবার পর তৃতীয় অঙ্কে তা চরম অবস্থায় পৌঁছয়। এই ব্যাপারে সমালোচকের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। কেউ কেউ চরমোন্নতিকে নাটকের চরমতম ঘটনা ভেবে নেওয়ার ফলেই এই মতভেদ দেখা দিয়েছে। একটা নাটকের চরমতম ঘটনা অনেক সময়ই নাটকের মাঝখানে ঘটতে পারে না, কারণ তাহলে নাটকটির আর বিশেষ কোন আকর্ষণই থাকে না। দর্শকদের কৌতূহলবৃত্তি শেষপর্যন্ত ধরে রাখার কথা নাট্যকারকে ভাবতেই হবে। আসলে একটি দ্বন্দ্ব ক্রমশ বাড়তে থাকলে একটা চরম অবস্থা আসবেই যখন তার পরিণতি কী হতে পারে তার একটা আভাস আমরা পেয়ে যাই, আমরা বুঝতে পারি এমন একটা অবস্থায় আমরা পৌঁছে গিয়েছি যেখান থেকে অন্য কোন পরিণতি আর সম্ভব নয়। সেই পরিণতি প্রদর্শন নয়, পরিণতির সেই চমকিত ঘটনার অভিনয়

নয়—আমরা তৃতীয় অঙ্কে নিঃসন্দেহ হয়ে যাই সেই অপরিবর্তনীয় পরিণতির আশঙ্কা সম্বন্ধে। আমরা বুঝতে পারি ঘটনাধারা এমন চরমে পেঁাচেছে যে অনিবার্যভাবেই এখন সমস্ত লক্ষণ একটি পরিণতির দিকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত করছে।

নাটকের চরম ঘটনা তৃতীয় অঙ্কে ঘটতে পারবে না এমন কোন কথা নেই, নাট্যকারের বস্তুগঠনের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্যের ওপরই তা নির্ভর করে। শেক্‌স্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকে সীজারের হত্যার মতো চমকিত ঘটনা তৃতীয় অঙ্কেই ঘটেছে, কিন্তু মনে রাখতে হবে এই হত্যা যতোই বীভৎস ঘটনা হোক' সমস্যার সমাপ্তি সেখানে ঘটে না—তা শুধু ভিন্ন দিকে মোড় নেয়। সুতরাং তাকে নাটকের পরিবর্ত-সীমা আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি, চরম কৌতূহলের নিবৃত্তি নয়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে শেক্‌স্‌পীয়রের 'কিং লীয়র' নাটকে তো চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটেছে একেবারে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে', কিন্তু নাটকের বস্তু তো তাতে বিপর্যস্ত হয়ে যায়নি! তার একটাই কারণ, সেই ঘটনাতেই দ্বন্দ্বের সূচনা ঘটে এবং সেই দ্বন্দ্বই এই নাটকের আশ্রয়।

কথাটা আরও ভালোভাবে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের কথা স্মরণ করলে। প্রথাধর্মের সঙ্গে মানবধর্মের বিরোধই এই নাটকের মূল অবলম্বন, এই বিরোধের প্রধান দুটি পক্ষ হিসাবে দেখি যথাক্রমে রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যকে। দ্বিতীয় অঙ্কে রঘুপতির কিছু হীন কার্যকলাপ এবং রানী গুণবতীর অন্যায় রোষ গোবিন্দমাণিক্যকে মানবধর্মের প্রতি আরো দৃঢ়চিত্ত করে তোলে। বিরোধ এইভাবে অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়লে এর সমাধান কীভাবে হতে পারে ভেবে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। একই সঙ্গে জয়সিংহ নামক একক ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বও চলে সমান্তরাল গতিতে। পালকপিতা রঘুপতি জয়সিংহের কাছে সর্বস্ব, আবার মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যও তার জীবনে আদর্শ পুরুষ। এই দুই ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে কার পক্ষ অবলম্বন করা উচিত, ভেবে পায় না সে। 'বিসর্জন' নাটকের সবচেয়ে চমকিত ঘটনা জয়সিংহের আত্মহনন; তা ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই নাটকের উপান্তে। কিন্তু জয়সিংহের এই পরিণতিই যে ঘটতে চলেছে, এবং এই উপায়েই যে সমস্যার সমাধান ঘটবে তার স্পষ্ট আভাস আমরা পেয়ে যাই নাটকের তৃতীয় অঙ্কে। এই অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে জয়সিংহের সঙ্গে অপর্ণার একটি কোমল-করুণ সাক্ষাৎকার আছে। অপর্ণার কাছে মন্দির ছেড়ে চলে আসার আমন্ত্রণ শুনে জয়সিংহ বলে—

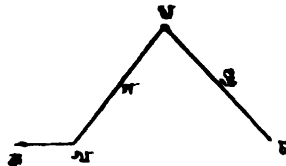
"যাব যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব। হায়রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে।
তবু, যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ করে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব।"

রাজকর পরিশোধ করার ব্যাপারটা যে তার আত্মহত্যা, তার রক্তপাতের মধ্যেই যে বিরোধের প্রকৃত অবসান ঘটবে, সে কথা আমরা অনুমান করে নিতে পারি।

নাটকের চতুর্থ অঙ্কের সাধারণ নাম Falling Action বা অবনয়ন। এর যে নামান্তরগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল Resolution বা সিদ্ধান্ত এবং Denouement বা গ্রন্থিমোচন। তৃতীয় অঙ্কের সঠিক তাৎপর্য মেনে নাটক লেখা হলে সেখানে আমরা পরিণতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে যাই বা তার একটা আভাস পাই। পরবর্তী অঙ্কের সজ্জিত দৃশ্যগুলি সেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে, নাটকে জটিলতার বন্ধনগুলি সমাধানের লক্ষ্যে সরলীকৃত হতে থাকে। যেমন 'বিসর্জন' নাটকে ক্ষিপ্ত রঘুপতি তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে নীচত্বের শেষতম বিন্দুতে চলে যান, গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' নাটকে সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবার চরমতম আয়োজন সম্পূর্ণ হয়, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে আমরা প্রস্তুত হয়ে যাই একটি পরিবারের বিষন্ন করুণ পরিণতি দেখবার জন্য।

পূর্ণাঙ্গ নাটকের সর্বশেষ অঙ্কের নাম Catastrophe বা সমাপ্তি; একে Conclusion বা উপসংহারও বলা হয়। এই স্তরে সমস্ত জটিলতার অবসান এবং যে দ্বন্দ্ব নাট্যকার অবলম্বন করেছিলেন তার বিশ্বাসযোগ্য পরিণতি তাঁকে ঘটিয়ে দিতে হয়। পরবর্তীকালে এ প্রশ্ন অবশ্য উঠেছে যে জীবনেরই যখন সুস্পষ্ট পরিসমাপ্তি নেই, এবং নাটক যেহেতু জীবননির্ভর শিল্প, নাটকের অতিনিরূপিত ছেদচিহ্ন থাকা উচিত কী নয়। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, নাটক এক বিশিষ্ট শিল্পপ্রকরণ, সুতরাং শিল্পের নিয়মই তার পক্ষে প্রযোজ্য, জীবনের নয়।

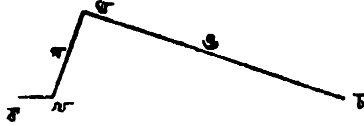
নাটকের এই পঞ্চাঙ্ক বিভাগ বা সুনির্দিষ্ট গঠনকে প্রসিদ্ধ নাট্যতত্ত্ববিদ গুস্তাভ ফ্রেতাগ তাঁর 'নাটকের শিল্পরূপ' নামক একটি গ্রন্থে (Die Technik des Dramas) এক পিরামিডের গঠনের দ্বারা প্রতীকায়িত করেছেন। তাঁর এই প্রতীক ব্যবহার করার পর সাধারণত নাটকের সনাতনপন্থী গঠন দেখাবার জন্য এই পিরামিড-আকৃতি আমরা ব্যবহার করি। চিত্রটা হয় এইরকম—



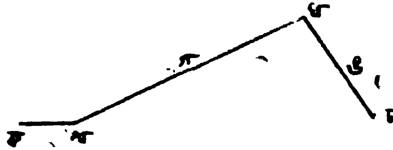
এখানে ক-কে বলা যেতে পারে উন্মোচন, খ-কে বলা যায় সেই প্রাথমিক ঘটনা, যেখান থেকে নাটকীয় গতিবেগ শুরু হয়, গ-কে বলতে হবে চরমোন্নতির জন্য ঘটনার অগ্রগতি, ঘ হল সেই পরিবর্ত-বিন্দু, ঙ-কে বলতে পারি গ্রন্থিমোচন এবং চ-কে নাটকের পরিসমাপ্তি। নাটকের কাঠামো ও পিরামিডের গঠনকে সন্নিহিত

মনে করলে এভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় যে নাটকের প্রথম অংক উন্মোচন হল ক-খ, দ্বিতীয় অঙ্কের উত্তুঙ্গ ঘটনাক্রম হল খ-গ, তৃতীয় অংক বা চরমোন্নতি হল গ-ঘ, চতুর্থ অংক বা অবনয়ন হল ঘ-ঙ এবং পঞ্চম অংক বা উপসংহার হল ঙ-চ।

Climax বা চরমোন্নতিকে ঘটনার উত্তুঙ্গ চমক মনে করে সমালোচক হাডসন বলতে চেয়েছেন, এই পিরামিড-গঠন নাটকের অন্যতম গঠন হিসেবে না গেলেও এর বাইরে অন্য বহুরকম গঠন থাকতে পারে যেখানে চরমক্ষণ নাটকের তৃতীয় অংকে আসে না, আসে অন্যত্র। দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন শেকস্‌পীয়রের 'কিং লীয়র' এবং 'ওথেলো' নাটকের কথা। 'কিং লীয়র' নাটকে যেহেতু চরম ঘটনা ঘটে প্রথম অংকেই, তার গঠন এইভাবে দেখিয়েছেন তিনি—



আবার, 'ওথেলো'র গঠনের রেখাচিত্র এইরকম হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করেন—



এখানে আমাদের বক্তব্য আমরা আগেই বলেছি, Climax কে চরমতম 'ঘটনা' না মনে করে তাকে নাটকীয় দ্বন্দ্বের পক্ষে চরমক্ষণ বা পরিণতির প্রথম স্পষ্ট আভাস অথবা নাটকের পরাবর্তবিন্দু হিসাবে স্বীকার করে নিলে এইভাবে গঠন পরিবর্তনের, কথা ভাবার কোন প্রয়োজনই হয় না।

অবশ্য আধুনিক কালে আর এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই, কারণ বাস্তবতাবাদী নাট্য-আন্দোলনের সময় থেকে প্রথাগত পঞ্চাংক বিভাগ এবং বিভিন্ন দৃশ্যের মালা সাজিয়ে এক-একটি অংক গঠনের পদ্ধতি নাট্যরচনায় অপসারিত হতে থাকে। এই আন্দোলনের পথিকৃৎ জর্জ বার্নার্ড শ বেশির ভাগ নাটকই লিখেছেন তিন অংকে, তবে প্রকারান্তরে পিরামিড-গঠন তিনিও বজায় রেখেছেন বলতে পারি, কারণ প্রথম অংকে প্রস্তাবনা, দ্বিতীয় অংকে চমকিত ঘটনা এবং তৃতীয় অংকে টানটান উত্তেজনার মধ্যে পরিসমাপ্তি—এই তাঁর সাধারণ ছক। সেই সময়ে বলিষ্ঠ নাট্যকার ইবসেন তাঁর বেশির ভাগ নাটক লিখেছেন চার অংকে।

বাংলা নাটকে অবশ্য প্রধানুগত্যই বেশি দেখা যায়, ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ। প্রথমদিকে তিনিও পঞ্চাংক বিভাগ অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু পরে যেমন বেশির ভাগ রীতি অতিক্রম করেছেন, গঠনের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার দেখা যায়। 'মালিনী' নাটক শুধু চারটি দৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ, 'মুক্তধারা' বা 'রক্তকরবী'-র মতো উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ নাটকেও দৃশ্যের সংখ্যা কেবল এক। বাংলা নাটকে গঠনের পরিবর্তন এবং এ ব্যাপারে স্বাধীনতা গ্রহণের ব্যাপক দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে নবনাট্য বা গণনাট্য আন্দোলনের সময় থেকে। বিজন ভট্টাচার্য বা তুলসী লাহিড়ীর নাটকগুলি স্মরণ করলেই সে কথা বোঝা যাবে।

নাটকের বস্তুগঠন সম্পর্কে আর একটি কথা বলবার আছে, এটিকে সমালোচক, হাডসন উল্লেখ করেছেন 'Principles of Parallelism and Contrast' অর্থাৎ সমান্তর ও বিপ্রতীপ উপকাহিনী গঠনের রীতি হিসাবে। উপন্যাসে যেমন জটিল প্লট রচনা করা হয়, নাটকেও তেমনি মূল কাহিনীর পাশাপাশি উপকাহিনী সৃষ্টি করা হয়। উপন্যাসে উপকাহিনী থাকে, হয় মূল কাহিনীর বক্তব্য জোরদার করবার জন্য, অথবা বৈপরীত্য সৃষ্টি করে মূল বক্তব্য স্পষ্টতর করে তোলার জন্য। নাটকের উপকাহিনী সৃষ্টি করা হয় মূল কাহিনীর উদ্দেশ্যকে সমান্তরভাবে পুষ্ট করার জন্য অথবা বিপ্রতীপ কাহিনীর দ্বারা তাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য। উপন্যাসে দুটি ব্যাপার একই সঙ্গে ঘটেছে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে—সেখানে নগেন্দ্র-কুন্দ-র মূল কাহিনীর সমান্তর ধারায় এসেছে দেবেন্দ্র-হীরার পদস্খলনের ভয়াবহ বৃত্তান্ত এবং বৈপরীত্য সৃষ্টি করার জন্য এসেছে শ্রীশচন্দ্র-কমলমণির বিপ্রতীপ উপকাহিনী। বাংলা নাটকে সমান্তর ধারায় উপকাহিনী সৃষ্টির প্রচেষ্টা অনেক হয়েছে যেমন 'নীলদর্পণ' নাটকে গোলোক বসুর পরিবারের বিপর্যয়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আমরা দেখতে পেয়েছি সাধুচরণের পরিবারের দুর্ভোগ। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মূল কাহিনীর সঙ্গে ধনদাস-মদনিকা উপকাহিনীর সম্পর্ক কিছুটা বিপ্রতীপ ধরনের বলা যেতে পারে।

ছ. নাটকের চরিত্রসৃষ্টি

বস্তু এবং চরিত্রসৃষ্টি নাটকের দুটি বিশিষ্ট উপাদান হিসাবে স্বীকৃত হলেও, খুব সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে কিন্তু এ দুটিকে স্বতন্ত্র উপাদান মনে করাই সম্ভব নয়—অন্তত এই দুটি উপাদান যে প্রথম শ্রেণীর নাটকে বা উপন্যাসে প্রায় অভিন্ন হয়ে পড়ে, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। নাট্যকার কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেন বা কিছু চরিত্রের পরিকল্পনা করেন যাদের সুনির্দিষ্ট মানসিকতা আছে, অনুভূতি আছে, লক্ষ্য আছে এবং সেই সঙ্গে আছে সীমাবদ্ধতা। চরিত্র যদি সেইভাবে

নাট্যকারের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলেই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পড়লে বা অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটলে একটি বিশেষ চরিত্র কী আচরণ করবে তা অভ্রান্ত ভাবে বোঝা যায়। সুতরাং বস্তু তখন চরিত্রের প্রকৃতি অনুযায়ীই গঠিত হয়, তাকে অন্যরকম ভাবে গঠন করা সম্ভব হয় না। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস রচনার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তাই বলেছিলেন, তিনি প্রথমে কতকগুলি চরিত্র স্থির করে নেন, তারপর যে-কোন ঘটনার সম্মুখীন হলে তারা কী আচরণ করবে তা স্পষ্টই বোঝা যায়—সুতরাং গল্প সম্বন্ধে তাঁকে পৃথক করে ভাবতে হয় না।

চরিত্রসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং নাটকীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ অনেক কথা বলেছেন। সেসব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করবার আগে একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন মনে করি। নাটকে কোন চরিত্রের উপস্থিতি থাকলেই থাকে আমরা 'চরিত্র' মনে করে থাকি; কিন্তু নাট্যজগতেই হোক বা বাস্তব জগতেই হোক, শুধু উপস্থিতি দ্বারা কোন মানুষ চরিত্র হতে পারে না। বাস্তব জগতে যেমন রাস্তাঘাটে দেখা যে-কোন মানুষ আমাদের কাছে 'চরিত্র' হয়ে ওঠে না, বিশেষ চারিত্র দ্বারা সে আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হলে তবে তাকে চরিত্র বলে গণ্য করি, নাটকেও তেমনি নাট্যপ্রক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকলে এবং আমাদের অনুভূতির কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই তাকে আমরা বলতে পারি 'চরিত্র'। অর্থাৎ উপযুক্ত সজীবতার দ্বারাই নাটকে একটি চরিত্র 'চরিত্র' হয়ে উঠতে পারে। এই সজীবতা সৃষ্টির উপায় অবশ্যই সাধারণভাবে নাট্যকারের সহানুভূতি এবং বাস্তব সংসারে ওই ধরনের চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা; সেই সঙ্গে দরকার নাট্যক্রিয়ায় চরিত্রটির অনিবার্য ভূমিকা—কেবল বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য উপস্থাপিত অভিনেতা চরিত্রের সম্মান পেতে পারে না।

সমালোচক হাডসন অবশ্য এই প্রসঙ্গটি অনেক বিস্তারিত করেছেন এবং বিশেষ করে নাটকীয় চরিত্রসৃষ্টির জন্য নাট্যকারের যেসব বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন তার উল্লেখ করেছেন। নাটকের বস্তু গঠনের মতোই, সংহতি তার চরিত্রসৃষ্টিরও প্রধান গুণ বলে তিনি মনে করেন। উপন্যাসের মতো বিস্তারের অবকাশ নেই বলেই অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে, চরিত্রটি প্রতিষ্ঠিত করবার সচেতন উদ্দেশ্য নিয়ে কেবল প্রয়োজন অনুসারেই চরিত্রের ব্যবহার নাট্যকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই বিষয়ে সবচেয়ে আদর্শ দৃষ্টান্ত হতে পারে শেক্‌স্‌পীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটক, অনেক সমালোচকই এই ধারণা পোষণ করেন। ম্যাকবেথের মতো একটি যুগোত্তীর্ণ রচনা কোন সফল নাট্যকারও খুব বেশি রচনা করতে পারেন না। অথচ সমালোচক ব্যারেট ওয়েণ্ডেল তাঁর 'উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়র' গ্রন্থে দেখিয়েছেন এই নাটকের দুটি অমর চরিত্র লেডি ম্যাকবেথ এবং ম্যাকবেথকে কথা বলবার সুযোগ দিয়েছেন নাট্যকার যথাক্রমে প্রায় ষাটবার ও দেড়শোবার—কোন কোন ক্ষেত্রে সংলাপগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ঠিক এইভাবে সমালোচনার রীতি বাংলাতে নেই, তবু আদি

যুগের বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণ' থেকে আমরাও এই ধরনের একটি হিসাব গ্রহণ করতে পারি। দীনবন্ধু মিত্রের এই নাটকের নায়ক নিশ্চয়ই বলতে হবে নবীন-মাধবকে। নবীন মাধব 'নীলদর্পণ' নাটকে কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে মোট তেত্রিশবার—প্রথম অঙ্কে সাতবার, দ্বিতীয় অঙ্কে ছ-বার, তৃতীয় অঙ্কে চোদ্দবার এবং চতুর্থ অঙ্কে ছ-বার। পঞ্চম অঙ্কে তার উপস্থিতি আছে, কিন্তু কোন সংলাপ নেই। নাটকীয় চরিত্রের সংহতি বোঝাবার পক্ষে এই দৃষ্টান্তও উপেক্ষা করবার মতো নয়।

এই একই কথা একটু অন্যভাবে ভাবা যেতে পারে। স্থানের অভাব নাটকে এতো বেশি এবং অপব্যয়ের সুযোগ সেখানে এতো কম যে চরিত্রসৃষ্টিতেও প্রতি মুহূর্তে আমাদের সাবধান থাকতে হবে প্রয়োজনের বেশি একটি কথাও যেন কোন বিশেষ চরিত্র না বলে। এই প্রয়োজন প্রধানত দুটি—নাটকের প্লট বা বৃত্ত অথবা তার ঘটনাধারা পরিস্ফুট করতে গেলে যেটুকু ক্রিয়াশীলতা ও সংলাপ চরিত্রের পক্ষে অপরিহার্য সেটুকু, এবং দ্বিতীয়ত নাটকের স্বার্থে চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, সেই বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা। এর বাইরে যদি নাটকীয় চরিত্র কোন আচরণ করে বা সংলাপ উচ্চারণ করে তাহলে আমরা সেখানে 'over-characterisation' বা চরিত্রসৃষ্টিতে বাড়াবাড়ির অভিযোগ আনতে পারি। এরকম অভিযোগ বিখ্যাত নাট্যকারদের সম্বন্ধেও আনা সম্ভব। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বলিদান' নাটকে ঘটনাক্রমের দ্বারাই করুণাময় চরিত্রের প্রতি দর্শকের যথেষ্ট সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারতেন, করুণাময় চরিত্রের এতোবেশি সংলাপ থেকে মনে হয়, নাটকের প্রয়োজনের চেয়ে চরিত্রটিকে আলাদাভাবে সজীব করার প্রতিই নাট্যকারের উৎসাহ ছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে। চারদিকের বিশৃঙ্খল অবিচার থেকে আমরা স্পষ্টই বৃদ্ধ সম্রাট সাজাহানের অসহায়ত্ব বুঝতে পারি, সেজন্য নিরন্তর তাঁর প্রলাপ এবং দীর্ঘ সংলাপ ব্যবহারের অপরিহার্যতা ছিল না। তা সত্ত্বেও যখন তা ঘটে তখন আমাদের সন্দেহ হয়, নাটক নয়—চরিত্রটির প্রতিই বোধহয় নাট্যকার বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। এমন অভিযোগ শেক্‌স্‌পীয়রের বিখ্যাত নাটক 'হ্যামলেট' সম্বন্ধেও আনা যায় এবং বস্তুতই তা উঠেছে। হাডসন সেই কারণেই মন্তব্য করেন—"There is undoubtedly more in the character of Hamlet, for example, than is actually required to account for his part in the plot."

নাটকীয় চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে আর একটি যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যর কথা বলেছেন হাডসন, আমরা নাটকের বৈশিষ্ট্য হিসাবেই তার উল্লেখ করেছি—সে বৈশিষ্ট্য হল নাটকের বস্তুধর্মিতা বা নাট্যকারের নৈর্ব্যক্তিকতা। যে নৈর্ব্যক্তিকতা কাহিনী-গ্রন্থনে নাট্যকারকে বজায় রাখতে হয়, চরিত্র নির্মাণ করতে গিয়ে তা তাঁকে গভীর-

ভাবে স্মরণ করতে হবে। এখানেই উপন্যাসের সঙ্গে নাটকীয় চরিত্রচিত্রণের পার্থক্য। মানুষের জীবনের প্রেম ও প্রেমহীনতা, প্রবৃত্তি ও জিতেন্দ্রিয়তা, তার সমস্ত রকম চিত্তবৃত্তির ব্যাখ্যা উপন্যাসে থাকতে পারে, উপন্যাসে তা আশা করতে পারেন নিষ্ঠ সমালোচক, কিন্তু নাট্যকারের পক্ষে তা ব্যাখ্যা করার কোন রাস্তা খোলা নেই। তিনি চরিত্রগুলিকে শুধু উপস্থিত করতে পারেন, কিছু আচরণ ও সংলাপের মাধ্যমে তার মানসিকতার কিছু বিশেষ দিক পরিস্ফুট করার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু জীবন ব্যাখ্যার সচেতন উৎসাহ তাঁকে সম্বরণ করতেই হবে, পাঠক যদি তা বুঝে নিতে পারেন, সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

নাটকীয় চরিত্র নিয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য আলোচনা অ্যারিস্টটলের। তিনি অবশ্য আলোচনা করেছেন মূলত ট্র্যাজেডি সম্বন্ধেই। তাঁর মতে নাটকীয় চরিত্র মানেই কিছু নৈতিক গুণ ও অপগুণের সমষ্টি। তা অবশ্য প্রকাশ পায় চরিত্রের আচরণ ও সংলাপ থেকে। এই গুণাবলীর মধ্যে আমরা চারটি বৈশিষ্ট্য সন্ধান করতে পারি। প্রথমত, চরিত্রটি হবে না-অতি-ভালো, না-অতি-মন্দ অর্থাৎ মাঝামাঝি ধরনের। দ্বিতীয় গুণটিকে বলা যায় যাথাযাথ্য বা appropriateness, অর্থাৎ চরিত্রটি যেমন ঠিক সেই ভাবেই তাকে প্রকাশ করতে হবে। তৃতীয় গুণটিকে বলতে পারি বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতার অর্থ হল আমাদের মনের বাস্তবৰোধ চরিত্রচিত্রণ দেখে যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। চতুর্থ গুণটি হল consisteney বা সংগতি, অর্থাৎ চরিত্রটি আগাগোড়া যেন সুসংগত হয়; কারণ তা না হলে চরিত্রটি বিশ্বাস্যতা হারায়। কোন চরিত্র বিশ্বাসযোগ্যতা হারালে তাকে আর নাটকীয় চরিত্র হিসাবে আমরা গ্রহণই করতে পারি না।

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে অবশ্য নায়কের বৈশিষ্ট্যগুলি একেবারে সুনির্দিষ্ট এবং এ বিষয়ে বিধিবিধানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। মহাকাব্যের নায়কপ্রসঙ্গে এইসব বিধান ও নির্দেশের কথা বলা হয়েছে। সংস্কৃতে নাটকও যেহেতু কাব্য, দৃশ্যকাব্য-সুতরাং নায়কের ব্যাপারে এখানে পার্থক্য বিশেষ করা হয়নি, তবে বলা হয়েছে নায়ককে বিবিধ গুণের অধিকারী হতে হবে। এই গুণের তালিকার মধ্যে অনুপস্থিত প্রায় কোন গুণই নেই, যথা—সুদর্শন, উদার, বিনয়ী, কলারসিক, বাগ্‌পটু, কুশলী, বীর, বলিষ্ঠচিত্ত প্রভৃতি আরো অনেক কিছু। এতো গুণের সমাবেশ ঘটলে তাকে আর সাধারণ মানুষ বলা চলে কিনা, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে; কিন্তু এ প্রশ্ন আধুনিক পাঠকের। অ্যারিস্টটল মাঝারি মাপের মানুষকে নায়কত্বের সম্মান দিয়েও বলেছিলেন, তাঁকে হতে হবে অধ্যবসায়ী এবং উন্নতিকামী (Illustrious and prosperous)। তাছাড়া নায়ককে বিত্তবান, প্রতিপত্তিশালী ও বিখ্যাত হতে হবে—এ কথাও অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, যদিও আধুনিক নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ করেছে অত্যন্ত 'কমন ম্যান'-ও নাটকের নায়ক হতে

পারে, এমনকি একটি জনগোষ্ঠীও-সেদিনকার 'ছেঁড়াতার' বা 'নবান্ন' থেকে আজকের 'মাধব-মালঞ্চী কইন্যা' পর্যন্ত তার উদাহরণ।

আমাদের এ যাবৎ আলোচনা থেকে ভুল করবার অবকাশ আছে যে নাটকীয় চরিত্র বলতে বোধহয় নায়ককেই বোঝায়, অথবা নায়ক ছাড়া অন্যান্য চরিত্র বোধ হয় অকিঞ্চিৎকর। এ কথা কখনোই সত্য নয়, নায়ক-নায়িকা ছাড়া অন্যান্য পার্শ্বচরিত্র তো বটেই, দু'টি একটি সংলাপ নিয়ে যে চরিত্র মঞ্চে প্রবেশ করে তার প্রতিও নাট্যকারের যথেষ্ট দায়িত্ববোধ থাকা দরকার। নায়ক প্রসঙ্গেই নায়িকার আলোচনা সেরে ফেলা দরকার। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকদের কোন বিশেষ নির্দেশ নেই, কিন্তু সংস্কৃত আলংকারিকগণ এ বিষয়েও নির্দিষ্ট মন্তব্যই করেছেন। নায়িকার শ্রেণী-নির্ণয় তাঁরা করেছেন নায়কের সঙ্গে তার সম্পর্ক হিসাবে। বিভাগটি এই রকম-অনূঢ়া অর্থাৎ অবিবাহিতা নায়িকা, স্বকীয়া অর্থাৎ নায়কের বৈধ স্ত্রী হিসাবেই নাটকে যে উপস্থিত এবং পরকীয়া অর্থাৎ নায়কের কাছে যে পরস্ত্রী। তবে যে শ্রেণীরই নায়িকা হোক, তাকে রমণীয় এবং নৃত্যগীতে পারদর্শিনী হতে হবে। নায়কের প্রতি মনোভাব এবং আচরণ অনুযায়ী নায়িকাদের শ্রেণীভেদ আট রকমের, যে মানসিকতার প্রায় প্রত্যেকটিরই দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করি বৈষ্ণব পদাবলীর নায়িকা রাধার আচরণে। শ্রেণীবিভাগগুলি এই—বাসকসজ্জিকা, অভিসারিকা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতপ্রিয়া এবং স্বাধীন-পতিকা।

নায়কের মতো খলনায়কের ভূমিকাও নাটকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, বিশেষত যেখানে খলনায়ককে মূর্তিমান শয়তান হিসাবে না দেখিয়ে ভালো ও মন্দ প্রবৃত্তির মিশ্রণে বেশ খানিকটা জটিল করে তোলা হয়। যেমন বলা যেতে পারে লেডি ম্যাকবেথের চরিত্র। রাজা ডানকানকে হত্যা করে ক্ষমতা দখলের জন্য তিনিই স্বামীকে প্ররোচিত ও উত্যক্ত করেন, অথচ নিজে সে কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হন-মৃত পিতার কথা তাঁর মনে পড়ে যায়। 'বিসর্জন' নাটকের রঘুপতিকে সেভাবে বিচার করলে খলনায়ক আমরা বলতেই পারি না বোধ হয়, তিনি নানারকম দুষ্কর্ম করা সত্বেও। আদর্শ ও বিশ্বাস এবং জয়সিংহের প্রতি আবাল্য স্নেহ তাঁর চরিত্রটিকে জটিল করে তোলে। তুলনামূলকভাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকে রমেশ নির্ভেজাল শয়তান চরিত্র, যেমন শেক্‌স্‌পীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' নাটকে শাইলক বা 'ওথেলো' নাটকে ইয়াগো।

হাস্যরসাত্মক নাটকে হাস্যোদ্দীপক চরিত্র অনেকই থাকতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজেডি নাটকেও আমরা হাস্যরসসৃষ্টির উপযুক্ত দু-একটি চরিত্রের অবতারণা দেখতে পাই। ট্র্যাজেডির গাঢ় করুণ রস ভালোভাবে উপভোগ করবার জন্যই এই অবকাশ বা 'tragic relief' সৃষ্টি করার দরকার আছে বলে সমালোচকগণ মনে করেন। তাই শেক্‌স্‌পীয়রের 'দা মেরী ওয়াইভস অব উইন্‌জর' নাটকে ফলস্টাফ চরিত্র যেমন

আছে তেমনি গাঢ় ট্র্যাজেডিতেও তিনি এই ধরনের ট্র্যাজিক অবকাশ সৃষ্টি করে নিয়েছেন। সংস্কৃত নাটকে এই পরিহাস-রসিকতার কাজটি যাঁরা করে থাকেন এক কথায় তাঁদের বলা হয় বিদূষক। এই চরিত্রটি সাধারণত হন ভোজনপ্রিয় ঔদরিক ব্রাহ্মণ, চেহারায় বামন বা বিকৃতদেহ, প্রায়শই নায়কের পার্শ্বচর এবং আচরণ এমনই স্থূল যে প্রতি আচরণে বা সংলাপেই তিনি পরিহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়ান। কিছু উচ্চস্তরের হাস্যরসিক চরিত্রও অবশ্য বাংলা নাটকে আমরা দেখেছি, যেমন গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা' নাটকে বিদূষক, অথবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাহাজন' নাটকে দিলদার।

নাটকে অন্যান্য যেসব পার্শ্বচরিত্র থাকে, আগেই বলা হয়েছে, কারো প্রতিই নাট্যকার অমনোযোগী হতে পারেন না। নাটক এমনই একটা সংহত শিল্প যে এখানে প্রত্যেকটি চরিত্রই আসে বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করতে, সুতরাং অবান্তর চরিত্রের স্থান এখানে হয় না। স্বল্পতম প্রয়োজনে যে চরিত্র আসে তার প্রতিও নাট্যকারের দায়িত্ব থাকে, এবং তা থাকে বলেই 'বিসর্জন' নাটকে জনতার মধ্যে যে চরিত্রটি বলে, দক্ষিণের লোক হয়ে উত্তর দিতে আসা উচিত নয়, কিম্বা যে ভীরু লোকটি বারবার তার আপন মামাতো ভাই হিসাবে সেখানকার দফাদারের উল্লেখ করে অথবা 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের যে মুচি নিজের পরিচয় দেয় ' I am a mender of bad soles' বলে—তাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে নাট্যকার সচেতন ছিলেন বলেই ওই রকম দুটি-একটি সংলাপের মধ্যেও চরিত্রগুলি আমাদের মনে এখনও গেঁথে আছে।

জ. নাটকের সংলাপ

নাটকে সংলাপের গুরুত্ব কতোখানি, এ কথা না বলে বলা উচিত সংলাপই নাটক, কারণ সংলাপ ছাড়া নাটকে আর কিছু নেই—নাটকে সংলাপ আছে, এবং সংলাপই আছে। নাট্যকার জীবন সম্বন্ধে তাঁর যাবতীয় ধ্যানধারণা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, ঘৃণা-ভালোবাসা প্রভৃতি প্রকাশ করার জন্য কয়েকটি চরিত্রকে নির্বাচন করেন এবং তাঁর সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কিছু আচরণ ও সংলাপের মাধ্যমেই তা প্রকাশ করে।

তাই বলে এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে নাট্যকার তাঁর যাবতীয় বক্তব্যই চরিত্রের সংলাপে প্রকাশ করতে পারেন। চরিত্র সেই সংলাপ উচ্চারণ করার ব্যাপারে যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে না ওঠে তবে তার মুখে সে সংলাপ দেওয়াই চলে না। বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যাপারটাকে নাটকে আগাগোড়া বজায় রাখতে হয়, কারণ নাটক দেখে বিভিন্ন রুচির মানুষ এবং নাটক দেখতে কাউকে বাধ্য করা চলে না। এই জন্যও সংলাপের গুরুত্ব নাটকে এতো বেশি।

উপন্যাসের ভাষারীতিতে যেমন কাব্যিক, বর্ণনামূলক, নাটকীয় ইত্যাদি ভাগ করা হয়ে থাকে, নাটকের সংলাপে সেরকম ভাগ করার কোন তাৎপর্য নেই। নাটকের চরিত্র যে প্রকৃতির হবে, সংলাপের প্রকৃতিও হবে সেই রকমের, এটাই স্বাভাবিক। একই নাট্যকারের লেখা বিভিন্ন নাটকে তাই সংলাপও বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। শেক্স্পীয়রের নাটকে জুলিয়াস সীজার যে ভাষায় কথা বলেন, ম্যাকবেথ সে ভাষায় কথা বলেন না, আবার লেডি ম্যাকবেথ যে ভঙ্গিতে কথা বলেন, হ্যামলেটের ভাষা তার চেয়ে অনেক আলাদা। বাংলা নাটকের আদিযুগে সংলাপ রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন দীনবন্ধু মিত্র। শুধু 'নীলদর্পণ' নাটকটি থেকেই বিভিন্ন রীতির সংলাপের উদাহরণ আমরা উদ্ধার করতে পারি। সাধারণভাবে ভদ্র চরিত্রের সংলাপে দীনবন্ধু তেমন পারদর্শী নন, একথা বলা হয়ে থাকে এবং নবীনমাধবের কিছু কিছু সংলাপ রচনায় কৃত্রিম আড়ষ্টতা যে ছিল না এমন কথাও নয়, তবু সর্বত্রই ভাষা এরকম নয়। যেমন গোলোকচন্দ্র বসুর প্রথম সংলাপ স্বতঃস্ফূর্ত—"বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাতপুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্তারা যে জমিজমা করো্যে গিয়াছেন তাহাতে কখন পরের চাকরি স্বীকার করিতে হয়নি। যে ধান জন্মায় তাতে সম্বৎসরের খোরাক হয়, অতিথিসেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায়";

গ্রাম্য স্ত্রীলোকের ভাষার নমুনা নেওয়া যাক বেরতীর সংলাপ থেকে—"ও যে এট্টু জল খ্যাতি চেয়েলো, ও অ্যামিন মশাই তোমার কি মাগ ছেলে নাই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট। ও মা ওযে ডব্কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দুবার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, সে যে অনেক দূর।"

তোরাপের সংলাপে পাওয়া যাবে ভদ্রেতর পুরুষচরিত্রের সংলাপের নমুনা, যার জন্য দীনবন্ধুর খ্যাতি আজও অম্লান—"দুত্তোর প্যারেকের মার প্যাট কব্যো, লো দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্চে। উঃ কি বল্বো, সমিন্দির একবার ভাতারমারির মাটে পাই, এমনি থাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়্য়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড করা হের ভেতর দে বার করি।"

ভাবলে অবাক লাগে আজ পর্যন্ত সাহেবের বাংলা সংলাপের যে আদর্শ আমরা মেনে চলি, তার রূপ দীনবন্ধুই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। 'নীলদর্পণ' নাটকে উড সাহেব ও রোগ সাহেবের সংলাপে যে বিপর্যস্ত ক্রিয়ার রূপ, মাঝে মাঝে হিন্দী শব্দের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি লক্ষ করি, প্রায় তাই এখনও ব্যবহার করা হয়—শুধু দন্ত্য ধ্বনি সাহেবি উচ্চারণে নেই বলে তার তালব্যীভবন ঘটে মাত্র। উড সাহেবের সংলাপের একটু উদাহরণ—"তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। স্বরপুর, শামনগর, শান্তিঘাটা এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামচাঁদ বেগোর তোম্ দোরস্ত্ হোগা নেই।"

আসলে, চরিত্র-অনুযায়ী সংলাপের বদল তো নিশ্চয়ই হয়, নাটকের প্রকৃতি

অনুযায়ীও চরিত্রের সংলাপ বদল হয়। গুরুগম্ভীর ট্র্যাজেডির ভাষা, লঘু হাস্যরসাত্মক নাটকের ভাষা অথবা সাংকেতিক নাটকের ভাষা এক রকমের হতে পারে না। ঠিক একই রকম ভাবে বলা যায়, নাটকের সংলাপ পদ্য ও গদ্য উভয় মাধ্যমেই রচিত হতে পারে। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে যেমন আমরা পদ্য সংলাপই বেশি উপভোগ করি। তবে ভাষায় নিজস্বতা আনবার জন্য অথবা নিজস্বতা পরিহার করতে অসমর্থ হওয়ার জন্য কখনও কখনও চরিত্র তার সংলাপে অন্য চরিত্রের চেয়ে পৃথক হতে পারে না, এতে নাটকের ক্ষতিই হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকার হিসাবে অল্প শক্তিমান ছিলেন না, কিন্তু সংলাপে তিনি প্রায় অহেতুক কাব্যময়তা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন কোন কোন চরিত্রে। এতে কিন্তু চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়েছে—চরিত্রকে তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা দান করাও নাট্যকারের এক বিশেষ কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষাও তাঁর সাহিত্যের সম্পদ! এই ভাষা যখন সাংকেতিক নাটক সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিয়োজিত হয় তখন তার উপভোগ্যতার মাত্রাও বেড়ে যায় অনেক বেশি। কিন্তু সাধারণ নাটকে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র যখন অননুকরণীয় রাবীন্দ্রিক ভাষায় কথা বলে তখন তাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে সচেতন দর্শকের একটু অসুবিধা হয় বৈকি।

সংলাপ প্রসঙ্গে স্বগতোক্তির উল্লেখ করতেই হয়। এটি বাংলা আদি যুগের নাটকে ঘনঘন ব্যবহৃত হতো, এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজি নাটকেও এর ব্যবহার ছিল খুব বেশি। বর্তমানে এই ধরনের সংলাপের প্রয়োগ কম দেখা যায়। একটি চরিত্র তার মনের গোপন কথা বা অন্তরঙ্গ ব্যথা-বেদনা, ঠিক অন্যান্য চরিত্রকে না জানিয়ে যেন নিজের মনেই নিজে উচ্চারণ করে—এইভাবেই স্বগতোক্তি অংশগুলি লেখা হয়। এতে দর্শক চরিত্রটির মনের কথা জানতে পারেন কিন্তু নাটকের পাত্রপাত্রী তার কিছুই বুঝতে পারেন না। ইংরেজি নাটকে একে বলে soliloquy, কখনো aside হিসাবেও একে নির্দেশ করা হয়। ইংরেজি নাটকের স্বগতোক্তির মধ্যে বিখ্যাত হয়ে আছে হ্যামলেটের 'টু বি অর নট্ টু বি'। খুব গুরুত্বপূর্ণ স্বগতোক্তি দেখা যায় মার্লোর 'ডক্টর ফাউস্টাস' নাটকে—সেখানে নাটক শুরুই হয় একটি দীর্ঘ স্বগতোক্তি দিয়ে এবং নাটক সমাপ্তও হয় আর একটি স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' নাটকে পদ্মলোচনের স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর একটি স্বগতোক্তির উদাহরণ—"আজ ভোর পর্যন্ত জেগে থাক্‌বো। অনেক রেতে বাড়ি আসেন, আর নুঠ্ করে বগীর ঘরে যান। আজ যেমন আসবে অমনি গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব। বগী আবাগী ঘুমুয়েছে, সাড়াশুড়ি আর পাচ্চি নে। আমি দোর ভেজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়ুয়ে থাকি।"

আধুনিককালে স্বগতোক্তির প্রয়োগ কমে এসেছে, বা বলা যায় প্রায় লুপ্তই হয়ে এসেছে, মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, বাস্তবতার বিচারে ব্যাপারটিকে হাস্যকর মনে হয়। মঞ্চে অন্যান্য চরিত্র অত্যন্ত কাছে থাকা সত্ত্বেও একটি চরিত্রের স্বগতোক্তি

কেউ শুনতে পাচ্ছে না, অথচ প্রেক্ষাগৃহের দর্শক শুনতে পাবার মতো যথেষ্ট জোরে তা বলা হচ্ছে—এই ঘটনা বাস্তবতার দিক থেকে স্বীকার করে নেওয়া শক্ত। দ্বিতীয় কারণটি শিল্পগত। নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, মাট্যধারা এবং অন্যান্য চরিত্র সম্বন্ধে তার ধারণা তার নির্ধারিত সংলাপ ও আচরণের মাধ্যমেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। একটি চরিত্র নিজের মনের কথা বা অন্যের সম্বন্ধে গোপন কোন কথা একা-একা উচ্চারণ করে, এর মানেই হল, লেখক চরিত্রদের সংলাপে বা আচরণে তা ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। এইসব কারণে স্বগতোক্তির ব্যবহার আধুনিককালে অত্যন্ত কমে গিয়েছে।

ঝ. নাটকের বিভিন্ন বিভাগ ও একাঙ্ক নাটক

নাটকের বিভাগ-নির্বাচন বিভিন্ন তাৎপর্য অনুসারেই ঘটতে পারে। একেবারে আকৃতিগত একটি বিভাগ আমরা মনে করতে পারি, পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং একাংক নাটকের। পূর্ণাঙ্গ নাটক বলতে বোঝায় পঞ্চাংক নাটক এবং একাংক নাটক বলতে বোঝায় একটি অংক সমন্বিত নাটক। কিন্তু বিশুদ্ধ আকারগত এরকম কোন বিভাগ মেনে নেওয়ার কোন যুক্তি নেই। কারণ প্রথমত, পূর্ণাঙ্গ নাটককে যে পঞ্চাংক হতেই হবে এ বিধান এখন অনেকেই মেনে চলেন না। আধুনিককালে পাঁচটি অংক এবং প্রতিটি অংকে কিছু নিয়মিত দৃশ্যবিভাগ প্রায় উঠেই গিয়েছে। গণনাট্য আন্দোলনের সময় যেসব নাটক রচনা করা হয়েছে তাতে প্রথাগত অংক সন্নিবেশের প্রশ্নই প্রায় অবান্তর হয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনেরও অনেক আগে, রবীন্দ্রনাথের নাটকের প্রথা ভাঙার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা দেখি। রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন'-এর মতো রীতিমত পঞ্চাংক নাটক যেমন লিখেছেন, তেমনি 'মালিনী'-র মতো চারিটি দৃশ্যের নাটকও লিখেছেন। আবার 'মুক্তধারা' নাটকে দৃশ্যপট একটিই এবং তা হল পথ—সমগ্র নাটকটি আমরা দেখতে পাই ওই পথের দৃশ্যেই। তা হলে কী বলবো আমরা সে নাটককে—পূর্ণাঙ্গ নাটক, অথবা একাংক নাটক!

দ্বিতীয়ত, যদি আকারগত বিভাগ হিসাবেই পূর্ণাঙ্গ ও একাংক নাটককে তফাৎ করি, তাহলে প্রশ্ন উঠবে পূর্ণাঙ্গ নাটকে আমরা যেমন কয়েকটি দৃশ্যসমন্বিত অংক দেখতে পাই, একাংক নাটকের অংকটিও সেরকম কয়েকটি দৃশ্যসমন্বিত হবে তো! অথচ প্রথাগত ভাবে একাংক নাটকে দৃশ্য আমরা একটিই দেখি, একাধিক নয়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক এর নামকরণ নিয়ে। একে আমরা একাংক নাটক বলবো অথবা একদৃশ্য নাটক, তা নিয়েও তাহলে চিন্তা করা দরকার।

তৃতীয়ত, একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, সংক্ষিপ্ত পরিসর ও একটি দৃশ্যে নাট্যবস্তুর বিন্যাস ছাড়াও একাংক নাটকের প্রকৃতিগত কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে।

কাজেই একাঙ্ক নাটককে পুরোপুরি আঙ্গিক বিভাগ মনে করা যুক্তিযুক্ত হবে না—তবে আকৃতি এই বিভাগের প্রধান বিচার্য বিষয় বলে স্বকীয় করে নেওয়া যেতে পারে।

নাটকের প্রধান বিভাগ হতে পারে রসগত এবং সেদিক থেকে এর প্রধান দুটি ভাগ ট্র্যাজেডি এবং কমেডি। ট্র্যাজেডি এবং কমেডির উপবিভাগও অবশ্য নিতান্ত কম নয়—এর ওপর আবার ট্র্যাজেডি এবং কমেডির উপাদান সংমিশ্রিত করে ট্র্যাজি-কমেডি নামক এক শ্রেণীর নাটকও রচনা করা হয়। এর বিস্তৃত পরিচয় উপযুক্ত প্রসঙ্গেই পাওয়া যাবে।

নাটকের বিষয়-অনুযায়ী এক ধরনের বিভাগও প্রচলিত আছে। বিষয়বস্তু ইতিহাস থেকে সংগৃহীত হলে তাকে আমরা বলি ঐতিহাসিক নাটক, পুরাণ থেকে সংগৃহীত হলে পৌরাণিক নাটক, কোন সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত নাটককে এইভাবেই বলি সামাজিক নাটক এবং লোককথা থেকে নাট্যবস্তু সংগ্রহ করা হলে তাকে বলি লোকনাট্য। এসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যেটা লক্ষণীয় সেটা হল, নাট্যলক্ষণ নিঃসংশয়ে রক্ষিত হওয়াই এদের প্রধান দায়িত্ব, তারপর দেখতে হবে, যে বিষয়ের নাটক হিসাবে এদের বিশেষিত করা হয়েছে, তার প্রতি সুবিচার করা হল কিনা। বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ হলেও প্রত্যেক বিভাগেরই কিন্তু প্রকৃতিগত বেশ কিছু লক্ষণ আছে এবং তা সুনির্দিষ্ট। ইতিহাস এবং ইতিহাসনির্ভর সাহিত্যের মূল পার্থক্য নিয়ে অ্যারিস্টটল সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট আলোচনা করেছেন। এই স্পষ্টতা পৌরাণিক বা অন্যান্য নাটক সম্বন্ধেও আছে।

নাটকের আরেকটি বিভাগ হতে পারে আন্দোলনকে ভিত্তি করে। বাংলা সাহিত্যে যেমন গণনাট্য বা নবনাট্য আন্দোলন হয়েছে, ইংরেজি বা ইউরোপীয় সাহিত্যেও তেমনি বিভিন্ন সময়ে নাট্য-আন্দোলন হয়েছে। এক-একটি বিশেষ আন্দোলনে উদ্ভূত নাট্যকর্মের এক-একটি বিশেষ ধরনের নামকরণ হয়েছে, যেমন—রোম্যান্টিক নাটক, বাস্তববাদী নাটক, অভিব্যক্তিবাদী নাটক, অ্যাবসার্ড নাটক প্রভৃতি। সাংকেতিক নাটকের উদ্ভবের নেপথ্যে সাংকেতিকতাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল বটে, কিন্তু সাংকেতিক নাটক বলতে আসলে এমন ব্যাপক প্রয়োগকৌশল বোঝায় যে সাংকেতিক ও রূপক—এই দুই শ্রেণীর নাটককে আমরা নাটকের প্রয়োগগত বিভাগ হিসাবে চিহ্নিত করাই সঠিক মনে করি। এই কারণে নাটকের আন্দোলনভিত্তিক শ্রেণীবিভাগের পরিচয় দেবার আগেই আমরা এদের আলোচনা করবো।

ঞ. একাঙ্ক নাটক

বর্তমান সময়কে নাট্যসৃষ্টির পক্ষে সুসময় অনেকেই মনে করেন না, কারণ গত শতকে এবং বর্তমান শতকের একেবারে প্রথম দিকে প্রচুর উল্লেখযোগ্য নাটক রচিত হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে মৌলিক নাটকের সংখ্যা খুবই কম। একমাত্র

একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে সে কথা বলা চলে না। একাঙ্ক নাটকের সংখ্যা যেমন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে এর জনপ্রিয়তা। পূর্ণাঙ্গ নাটকই যখন প্রায় সর্বস্ব ছিল তখন বড় জোর পূর্ণাঙ্গ নাটকের মুখবন্ধ হিসাবে একাঙ্ক নাটক অভিনয়ের কথা ভাবা যেতো। এখন শুধু যে একাঙ্ক নাটক প্রচুর লেখা হয় তাই না, তা প্রকাশও হয় খুব বেশি, একাঙ্ক-সংকলনের সাক্ষাৎ আমরা এখন পাই, এমনকি একাঙ্ক বিষয়ক আলোচনার পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তো বটেই, ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলেও নিয়মিত একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার এটি একটি বড় প্রমাণ।

একাঙ্ক নাটক বলতে আমরা সাধারণভাবে বুঝি, একটি দৃশ্যে সীমিত সময়ের—বোধ হয় প্রতিযোগিতার নিয়মের কথা স্মরণ রেখেই, এক ঘণ্টার মধ্যে অভিনয়-যোগ্য এক ধরনের নাটক। তবে একাঙ্ক নাটকের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষণ সম্বন্ধে জানতে হলে যাঁরা এ বিষয়ে যাঁরা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তাঁদের শরণাপন্ন হতে হবে।

নাট্যসাহিত্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন ড. অজিতকুমার ঘোষ এবং সাধনকুমার ভট্টাচার্য। অজিত বাবুর মতে—"ঘটনার অবিচ্ছিন্নতা, ভাবগত অখণ্ডতা, ঘনীভূত রসময়তা, এগুলিই একাঙ্ক নাটকের অপরিহার্য লক্ষণ।" এ বিষয়ে সাধনবাবুর মত—"দেশকালের অবিচ্ছেদ বা ঐক্যকে এবং কার্যের ঐকান্তিক এককত্বকে আমরা একাঙ্কিকার অপরিহার্য লক্ষণ বলেই স্বীকার করব। স্থান-ঐক্য, কাল-ঐক্য এবং কার্য-ঐক্যের আদর্শ সমন্বয়ের মধ্যেই একাঙ্কিকার বিশেষত্ব নিহিত রয়েছে।"

একাঙ্ক নাটকের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে জন হ্যাম্পডেন বলেছেন—"An one-act play deals with a single dominant dramatic situation and aims at producing a single effect…since the play is to be acted in a short space of time, the greatest artistic unity and economy are essential to success."

এই 'Unity and economy'-র কথা সমালোচক হার্ম্যান আউল্ড-ও বলেছেন, তবে সেই সঙ্গে তার বৈচিত্র্যের দিকটাও দেখিয়েছেন—"It may be neat, compact and rigid, but it may also be way ward, expansive and flexible. So long as it does not conflict with the fundamental principles of drama, it may venture into a hundred different directions and exploit as many themes as the ingenuity and inventiveness of the author can suggest."

একাঙ্ক নাটকের এইসব লক্ষণনির্দেশ এবং বাংলা একাঙ্ক নাটকের আলোচনা যাঁরা করেছেন তাঁদের আলোচনা স্মরণ রেখে আমরা বলতে পারি, একাঙ্ক নাটকের

প্রধান লক্ষণগুলি হল—(ক) তীব্র একমুখিনতা, (খ) সংবদ্ধতা ও বাহুল্য বর্জন (গ) ত্রিবিধ ঐক্যের আদর্শ সমন্বয় (ঘ) ঘটনার দ্রুতময়তা এবং (ঙ) নাটকের মৌলিক সত্য অক্ষুন্ন রেখে প্রচুর স্বাধীনতা। সুতরাং একাঙ্ক নাটকের একটি দৃশ্যে অভিনয়যোগ্যতার কথা স্মরণ রেখে এই সব লক্ষণের সাহায্য নিয়ে এর একটা সংজ্ঞাও আমরা নিরূপণ করতে পারি এইভাবে ঃ

একাঙ্ক নাটক হল এক দৃশ্যে অভিনয়যোগ্য, দ্রুত-সংঘটিত, বাহুল্যবর্জিত এমন এক ধরনের সংবদ্ধ নাটক যার প্রধান বৈশিষ্ট্য তীব্র একমুখিনতা, অথচ নাটকের মৌল লক্ষণ অবিকৃত রেখে যাতে প্রচুর স্বাধীনতা গ্রহণের অবকাশ রয়েছে।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে একাঙ্ক নাটকের এই লক্ষণসমূহ এবং তার সংজ্ঞার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল আছে ছোটগল্পের। এ বিষয়ে কোন কোন সমালোচক আমাদের সচেতনও করেছেন। কিন্তু আপাতত সে প্রসঙ্গ উল্লেখের কারণ একাঙ্ক নাটকের উৎস সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা। অনেক সমালোচকই একাঙ্ক নাটকের উৎস সন্ধানে যাত্রা করতে গিয়ে বড় দীর্ঘ পথপরিক্রমা করেছেন। সংস্কৃত নাটকে ভাসই প্রথম একাঙ্ক নাটকের সূচনা করেন এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন এবং তাঁর 'মধ্যম ব্যায়োগ', 'দূত ঘটোৎকচ', 'কর্ণভার', 'উরুভঙ্গ' প্রভৃতি নাটকের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কালিদাসের পূর্বে আবির্ভূত নাট্যকারদের মধ্যে বররুচির 'উভয়াভিসারিকা', শূদ্রকের 'পদ্ম প্রাভৃতক' প্রভৃতির নামও কারও মনে পড়েছে। পাশ্চাত্য নাটকের ইতিহাসে তেমনি সমালোচকের মনে হয়েছে, পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে একাঙ্কিকার অস্তিত্ব লক্ষ করা সম্ভব। এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গবেষণার ফলে একাঙ্ক নাটকের যে বীজই আবিষ্কার করা সম্ভব হোক, ছোটগল্প যেমন আধুনিক জীবনের সাহিত্য-ফসল, একাঙ্ক নাটকও তাই।

একাঙ্ক নাটক এবং ছোটগল্প মোটামুটি একই প্রেরণা ও তাড়না, একই সাহিত্য-প্রযত্ন ও সচেতনতায় সৃষ্টি হয়। জীবনের কোন তীব্র অভিজ্ঞতা বা গাঢ় অনুভূতি এ দুয়েরই জন্মদাতা। তীব্রতা বা গাঢ়তা একমুখী সৃষ্টি না হলে রক্ষা করা সম্ভব নয়, তাই একমুখিনতা বা singleness of purpose দুটি সাহিত্য-প্রকরণেরই মূল কথা। ছোটগল্পের মতেই একাঙ্ক নাটকে দৃষ্টি থাকে হয় একটি বিশেষ চরিত্রের ওপর, আখ্যানের বিশেষ এক চরম মুহূর্তের ওপর, সত্য আবিষ্কারের বিশেষ ভঙ্গির ওপর, বা এই রকমই কোন একক উদ্দেশ্যের ওপর। সংবদ্ধতা নাটকেরই অন্যতম প্রধান গুণ, কারণ তার আয়তন সীমিত—একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে তা লঙ্ঘন করা অমার্জনীয় শিল্পস্খলন, কারণ আয়তনের ক্ষুদ্রতর সীমা ছাড়াও আবেদনসৃষ্টির উদ্দেশ্যমুখিতা তাতে বিঘ্নিত হয়। ত্রিবিধ ঐক্যের কথা পূর্ণাঙ্গ নাটকে বলা হয়েছে, আমরাও তার আলোচনা করেছি। পূর্ণাঙ্গ নাটকে তিনটি ঐক্যই অপরিহার্য বলে আমাদের মনে হয়নি, কিন্তু সমালোচক ড. ভট্টাচার্য

একাঙ্ক নাটকে এদের অপরিহার্য মনে করেছেন, এবং সংগত ভাবেই। ঘটনা বা ক্রিয়াগত ঐক্য তো বজায় রাখতেই হবে, নইলে একাঙ্ক নাটকের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়, স্থানগত ঐক্য বজায় থাকে তা একটি দৃশ্যের নাটক বলে এবং কালগত ঐক্য বজায় না রাখলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে—যেহেতু নাটকে দৃশ্যান্তর নেই।

আধুনিক জীবনে ছোটগল্পের মতোই একাঙ্ক নাটকের আবেদন তীব্র, এই কারণেও একাঙ্ক নাটকের জনপ্রিয়তা বর্তমানে বেশি হতে পারে। এর উৎস সন্ধানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের অতীতবীক্ষা না চালিয়েও বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে এই প্রকরণটি উদ্ভবের জন্য আমরা ইউরোপীয় ও ইংরেজি সাহিত্যের কাছে ঋণী। ইংরেজি নাটক এবং নাট্য-আন্দোলনের সন্ধানই অবশ্য আমরা বেশি রাখি, তাই বলতে পারি ইংলণ্ডে বাস্তববাদী নাটকের প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয় আইরিশ নবনাট্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন জন মিলিংটন সিনজে, সঙ্গে সহযোগী হিসাবে পেয়েছিলেন বর্ষীয়ান কবি ও নাট্যকার ডব্লিউ. বি. ইয়েটস্, লেডি গ্রেগরী, সীন ও'ক্যাসি, সেন্টজন আরভিন প্রভৃতিকে। সিনজে-র যে একাঙ্ক নাটকগুলি এই উপলক্ষে রচিত হয় তাদের মধ্যে 'দি শ্যাডো অব দা গ্লেন', 'দি প্লেবয় অব দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড',' 'দি রাইডার্স টু দি সী' প্রভৃতি।

ইংরেজি একাঙ্ক নাটকে তার বিবিধ বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে, অর্থাৎ হার্ম্যান আউল্ড যে স্বাধীনতার কথা বলেছেন তার স্বরূপ আমরা ইংরেজি নাটকে অনুভব করি। ঘটনার নাটকীয়তা যখন একাঙ্ক নাটকের উদ্দেশ্য তখন তা কতো রসঘন হতে পারে তার উদাহরণ জো কোরি-র 'হিউয়ারস্ অব কোল', চরিত্রপ্রধান একাঙ্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বহুপরিচিত নাটক 'দা বিশপস্ ক্যাণ্ডলস্টিক'—যে নাটকে নরম্যান ম্যাকিনেল-এর প্রধান আকর্ষণ চরিত্রের পরিবর্তন। চরিত্রপ্রধান একাঙ্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জন গলস্ওয়ার্দি'র 'দি লিট্ল্ ম্যান', ডেভিড স্কট ড্যানিয়েলের 'দা কুইন এ্যাণ্ড মিস্টার শেক্সপীয়র', অলিভার কনোয়ের 'বেকি শার্প', লেডি গ্রেগরীর 'দি রাইজিং অব দি মুন' প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম একাঙ্ক নাটক কী, এ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ড. সুকুমার সেনের মতে অজ্ঞাত নাট্যকার রচিত 'বল্লালী খাত নাটক' (১৮৬৮) প্রথম বাংলা একাঙ্ক নাটক। ঠিক প্রথম নাটক না বললেও, 'সাহিত্য-সন্দর্শন' গ্রন্থে শ্রীশচন্দ্র দাস এ প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 'বৃষকেতু' ও 'প্রহ্লাদ চরিত্র' এ দুটি নাটকের নাম করেছেন। এই মত সমর্থন করেছেন ড. সরোজমোহন মিত্র। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রকেই একাঙ্ক নাটকের পথিকৃৎ বলেছেন, তবে তাঁর নির্বাচন গিরিশচন্দ্রের 'বেল্লিক বাজার'। গিরিশচন্দ্রেরই 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'সভ্যতার পাণ্ডা' ইত্যাদি নাটককেও কেউ কেউ প্রথম একাঙ্ক নাটক হিসাবে অভিহিত করেছেন। অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে পথিকৃতের দাবীদার হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (কিঞ্চিৎ জলযোগ) এবং

অমৃতলাল বসু (চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে)। এভাবে তালিকাবৃদ্ধির ইচ্ছা থাকলে রাজকৃষ্ণ রায়ের 'ডাক্তারবাবু' থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের 'বিনি পয়সার ভোজ' পর্যন্ত অনেক নাটকের কথাই আমরা স্মরণ করতে পারি। তবে বিদেশি একাংক নাটকের কথা যদি আমরা মনে রাখি, সঠিক ভাবে এই প্রকরণের আকৃতি ও প্রকৃতির কথা স্মরণ করি, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে বাংলা একাংক নাটকের প্রথম প্রবক্তা মন্মথ রায়। মন্মথ রায়ের প্রথম একাংক নাটক 'মুক্তির ডাক'। এরপর বহু একাংক নাটকই তিনি লিখেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'চাঁদসদাগর', 'দেবাসুর', 'কারাগার', 'সাবিত্রী', 'মাতৃ-মূর্তি', 'খনা', 'বিদুৎপর্ণা', 'রাজনটী', 'রূপকথা' প্রভৃতি। মন্মথ রায় ছাড়া বহু নাট্যকারই বাংলা একাংক নাটক রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন প্রবোধ মজুমদার (শুভযাত্রা), বনফুল (শিক্‌কাবাব), শিবরাম চক্রবর্তী (চাকার তলে), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (নতুন তারা), শচীন সেনগুপ্ত (ঝড়ের রাতে) দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (দাম্পত্য কলহে চৈব), বিধায়ক ভট্টাচার্য (তাহার নামটি রঞ্জনা) প্রভৃতি।

● একটি একাঙ্ক নাটকের বিশ্লেষণ

একাংক নাটকের প্রকৃতি এবং বিশেষ লক্ষণগুলির পর্যালোচনা করা হল। এবার দৃষ্টান্তসহ তা ব্যাখ্যা করবার জন্য বাংলা একাংক নাটকের পথিকৃৎ মন্মথ রায়ের একটি নাটকই গ্রহণ করা যেতে পারে। 'রাজপুরী' মন্মথ রায়ের অন্যতম বিখ্যাত একাংক নাটক, দেখা যাক সেটি সার্থক একাংক নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা।

'রাজপুরী' নাটকের কাহিনী মন্মথ রায় গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধ আখ্যান ভদ্রশাল-জাতক' থেকে। এর আখ্যানভাগ মোটামুটি এই রকম: বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বিবাহ করেছিলেন শাক্যদুহিতা বাসবক্ষত্রিয়াকে। নাটক শুরু হয় এমন একটি দিনে যেদিন রাজপুরীতে বিরাট উৎসব। একদিকে চৈত্র মাসের বসন্তোৎসব, অন্যদিকে কনিষ্ঠ কুমার রাজশেখরের তৃতীয় বার্ষিক জন্মতিথি পালন—তার ওপর আবার মাতুলালয় থেকে সেদিনই ফিরছেন ষোল বছরের যুবরাজ বিরুধক, তাকে নিয়ে আসছেন বাসবক্ষত্রিয়ার পূর্বপ্রণয়ী সুগায়ক কবিশেখর। উৎসব উপলক্ষে শাস্তার পায়ে আবির-কুংকুম ছুঁইয়ে এনেছেন রাজা, রানীকে বলেন প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তাদের সেই পবিত্র ধূলি বিতরণ করতে। রাণী কিন্তু কৌশলে সে অনুরোধ এড়িয়ে যান। বাসবক্ষত্রিয়া মান-অভিমানের পর রাজাকে বলেন, তিনি জানেন রাজা তাঁকে ভালবাসেন না—বিবাহ করেছেন শুধু বংশমর্যাদার জন্য। রাজা একথা স্বীকার করলে তিনি ভালবাসার জন্য আর্তি জানান।

এরপর সভাগৃহে কবিশেখরের গান শুরু হবে, রাজা সেখানে যেতে অনুরোধ জানান রানীকে। রানী এ প্রস্তাবও এড়িয়ে যান বিরুধকের সঙ্গে আগে দেখা করার অজুহাতে। যেতে হয় অগত্যা রাজাকেই একা। কিছুক্ষণ পরে কবিশেখর

এসে দেখা করেন রানীর সঙ্গে। গুপ্ত বিদ্রোহের খবর পেয়ে রাজা চলে গেছেন দুর্গে, রাতে হয়তো ফিরবেন না। রানী খুশী হলেন কবিশেখরের সঙ্গ পেয়ে। অতীত স্মৃতিচারণায় দুর্বল রাণী কবিশেখরকে অনুরোধ জানালেন তাঁকে নিয়ে পালানোর জন্য, সম্মত হন না কবিশেখর—চলে যান রাণীকে ছেড়ে।

ক্রুদ্ধ রাণী মূক ক্রীতদাসকে বলেন কবিশেখরের চোখ উপড়ে আনার জন্য। ক্রীতদাস ভুল বোঝে, সে উপড়ে নিতে যায় রাজশেখরের চোখ। জীবন বিপন্ন করে তাকে বাঁচান কবিশেখর এবং রাণীর আদেশ বুঝতে পেরে নিজের চোখ দুটি উপড়ে উপহার পাঠান রাণীকে। যন্ত্রণাদগ্ধ রাণী রাজপুরী ত্যাগ করে চলে যান বুদ্ধের আশ্রমে।

এদিকে চরমতম দুঃসংবাদ দেয় বিরূধক রাজা ফিরে এলে। সে জানায় রাণীর আসল পরিচয়। রাণী মোটেই শাক্যবংশের মেয়ে নয়, রাজার এক নর্তকীর কন্যা—প্রসেনজিৎকে ঠকাবার জন্যই শাক্যরা এই কৌশল করেছে। বিরূধক রাজপুরীতে ফিরেই শাক্যদের রক্তে বন্যা বইয়ে দিতে বলেছে এবং আনতে বলেছে শাস্তার ছিন্নমুণ্ড। রাজা রাণীর প্রকৃত পরিচয় শুনে ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তিনি দেন নির্বাসনদণ্ড, কিন্তু শোনেন, রানী স্বেচ্ছা-নির্বাসন নিয়ে চলে গেছেন। এতে রাজা এবং তাঁর পুত্রদুজনেই ব্যথিত হন, দুজনেই ক্ষমা করে দেন রাণীকে এবং সংকল্প করেন তাঁকে ফিরিয়ে আনবেন। ঠিক সেই সময়ই প্রতিহারী স্বর্ণপাত্রে এক ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে আসে বুদ্ধের আশ্রম থেকে। বিরূধক মনে করেন এ মুণ্ড শাস্তার—কিন্তু আবরণ উন্মোচন করে দেখা যায় তা রাণীর।

এবার লক্ষণ মিলিয়ে দেখা যেতে পারে সার্থক একাঙ্ক নাটকের পর্যায়ে এটি উন্নীত হয়েছে কিনা। প্রথমত, প্রায় এক ঘণ্টা সময়ে অভিনয়যোগ্য এই একাঙ্ক নাটকটিতে যা শ্রোতাদের মুগ্ধ করবে তা এর উদ্দেশ্যের একমুখিনতা। বলগর্বে দীপ্ত রাজা প্রসেনজিৎ প্রায় জোর করেই শাক্য বংশের মেয়েকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন নিজের বংশ গৌরব বৃদ্ধি করবার জন্য—এর পেছনে প্রেম বা করুণার কোন সম্পর্ক ছিল না, সম্পর্ক ছিল প্রয়োজনের। শাক্য বংশের মানুষও যে তাই এর প্রতিশোধ নিয়েছে, শাক্য রাজকন্যার পরিবর্তে প্রসেনজিতের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে রাজার নাচনেওয়ালীর কন্যার—এই সংবাদটি ষোল বছর ধরে গোপন রেখে এসেছেন রানী সুকৌশলে। আখ্যানের এই নাটকীয় রহস্য-উন্মোচনই এই নাটকীয় উদ্দেশ্যের একমুখিনতা। অথচ সেই সঙ্গে চরিত্রের গভীর অন্তর্মুখী দ্বন্দ্ব নাটকটিকে উজ্জীবিত করেছে, কারণ দ্বন্দ্বময়তাই নাটকের প্রাণ। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

রাণী যে শাক্যদুহিতা নন, এই গোপন তথ্যটির ওপর সমগ্র নাটকীয় আখ্যানটি নির্ভরশীল, কারণ রাজা প্রসেনজিৎ জানেন তিনি শাক্যদুহিতাকে বিবাহ করে বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। সংগত কারণেই নাটক শুরু হয় রাজার বিবাহের দীর্ঘদিন

পরে, ষোল বছরের বিরূধক মাতুলালয় থেকে রাজপুরীতে যেদিন ফিরে আসছে সেদিন। নাটকটির নাটকীয় গ্রন্থিমোচন যে অন্যত্র থাকতে পারে, এটা বোঝাবার জন্যই সম্ভবত রাণীর পূর্বপ্রণয়ী কবিশেখরকে বিরূধকের সঙ্গে আমরা দেখতে পাই। সভাগৃহে কবিশেখরের গান শুনতে যাওয়ার ব্যাপারে রাণীর অসম্মত অথচ রাজা দুর্গে চলে যাবার পর রাণী যেভাবে কবিশেখরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন—"অসম্ভব। ভুলে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেমন করে ভুলি! আমার রক্তমাংসে তুমি জড়িয়ে রয়েছো। আমার এই নগ্ন সত্যকে মিথ্যার আবরণে আর কতদিন ঢেকে রাখতে পারি?"—এরপর আর সন্দেহ থাকে না, রাণীর এই গোপন প্রণয়ই বোধহয় রাজপুরীতে বিপর্যয় ডেকে আনবে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যে তা নয়, তার প্রথম আভাস নাট্যকার দিয়েছেন মঙ্গলধূলি প্রজাদের বিতরণ করার ব্যাপারে রাণীর অসম্মতি দেখিয়ে। আসলে নীচ বংশের কন্যা হিসাবে রাণীর যে এই মঙ্গলকর্মে কোন অধিকার নেই, সে কথাটি ইঙ্গিতের দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে।

নাটকের দ্বিতীয় ইঙ্গিত এর পরেই এসেছে। রাণী রাজাকে প্রশ্নের পর প্রশ্নে উত্তক্ত করেছেন, রাজা তাঁকে কী জন্য গ্রহণ করেছেন—তাঁর রূপের জন্য অথবা বংশমর্যাদার জন্য। তিনি আকুল হয়ে বলেন, "আমাকে কি তুমি শুধু মানুষ বলে ভাবতে পার না? তুমিও মানুষ আমিও মানুষ—জন্ম আমাদের যা-ই হোক না কেন।"

নাটকের তৃতীয় ইঙ্গিত এই বিগত ঘটনার উন্মোচনে যে, কাশী থেকে আগত এক নর্তকী তাঁদের সম্মুখে নৃত্য প্রদর্শনকালে বিবসনা হয়ে পড়লে রাণী তাঁর মস্তক মুণ্ডনের আদেশ দিয়েছিলেন। সাধারণ নর্তকীর কাছে যে আচরণ মোটেই অস্বাভাবিক নয়, তার জন্য রাণীর এই অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কেন, সচেতন দর্শক সে কথা ভাবতেই পারেন। বিশেষ করে, এই ঘটনা স্মরণ করার পরেই রাণী বলেন "—এখন আমার ইচ্ছে হয়—আমিই তার সেই নগ্ন নাচ নাচি—দেহের এই মিথ্যা আবরণ ছিন্নভিন্ন করে ফেলি"—প্রকৃতপক্ষে যিনি রাজনর্তকীর কন্যা তিনি এ কথা বলতেই পারেন এবং নর্তকীর অসৌজন্যে তাঁর পূর্বোক্ত আচরণও অস্বাভাবিক নয়।

নাটকের চতুর্থ ইঙ্গিত, কবিশেখরের প্রত্যাখ্যানে রাণীর উন্মত্তের মত আচরণ। এইসব আচরণের মূলে যে সত্যটি রয়েছে—সমগ্র নাটকে যে সত্যটি উন্মোচিত হবার জন্য অপেক্ষা করেছে, তা আমরা শুনি বিরূধকের মুখে। এই সত্য জানবার পর রাণীর প্রত্যেকটি আচরণের রহস্য আমাদের কাছে সহজ ও স্পষ্ট হয়ে আসে।

এই সঙ্গেই আমাদের মনে রাখতে হবে একটির মধ্যে নাট্যধর্ম যাতে বজায় থাকে সে ব্যাপারে নাট্যকার অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। বহিরঙ্গ ঘটনা এখানে অনেক ঘটেছে, ঘটবেই—কারণ নাটক বলতে কেবল চরিত্রের সংলাপ আমরা বুঝি না, তার আচরণ বুঝে থাকি; কিন্তু একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, বাইরের এই সব দ্বন্দ্বময়তা আসলে প্রতিফলিত করেছে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকেই। অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচক হিসাবে

চমকিত বাহ্যিক ঘটনাকে গ্রহণ করলে পারলে আমরা নাটকীয় দ্বন্দ্বের স্বরূপ বুঝতে পারবো। রাণী সর্বদা কেন অস্থির, কেন তিনি বিরূধকের সঙ্গে কথা না বলে অন্য কিছু করতে পারেন না, সে আমরা পরে বুঝি। তিনি আশঙ্কিতা পাছে বিরূধক সত্য সংবাদ জানতে পারে। রাণী কবিশেখরের সঙ্গে পালাতে চান এই মিথ্যার প্রলম্বিত অধ্যায় টানতে পারছেন না বলে। নৃশংস আদেশ দিতে পারেন তিনি নর্তকীর কন্যা বলে, আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন অপরাধবোধের তীব্রতা থেকে। হৃদয়-সমুদ্রের ওপরের তরঙ্গভঙ্গ দেখে বিচার করলে নাটকটির প্রতি অবিচার করা হবে, চোখের আড়ালে কতো আশ্রয় ধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে তার সঠিক অনুভবেই এর প্রকৃত নাটকীয়ত্ব বোঝা যাবে।

দ্বিতীয়ত, নাটকটির সংবদ্ধতা ও বাহুল্য বর্জনক্ষমতা একাঙ্ক নাট্যকারদের আদর্শ হতে পারে। অনেকগুলি কাহিনীর স্রোত একটি দৃশ্যে সংহত করতে হয়েছে মন্মথ রায়কে—বিরূধকের রাজপুরীতে প্রত্যাবর্তন, রাজার বসন্ত-উৎসব, রাণীর সঙ্গে কবিশেখরের অবৈধ সম্পর্ক, রাজার বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র এবং তারপর মূল নাট্যদ্বন্দ্বের বিস্তার। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সব কটি স্রোত তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, যে ঘটনার ঠিক যতটুকু গুরুত্ব পাওয়া উচিত তাকে ততটুকুই গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকটি যেমন চমকিত ঘটনা সত্ত্বেও অতি সংহতভাবে মালিনীর 'ক্ষম ক্ষেমংকরে' দিয়ে শেষ হয়েছিল, এখানেও রাণীর ছিন্নমুণ্ড দেখার পর দুটি মাত্র সংলাপ আমরা পাই—

"দেহরক্ষী ॥ আশ্রমের প্রথম হত্যা—

বিরূধক ॥ আশ্রমের শেষ হত্যা—মা। মা!"

তৃতীয়ত একাঙ্ক নাটকের ত্রিবিধ ঐক্যকে নিষ্ঠভাবেই মেনে চলা হয়েছে। রাজপুরীর চৌহদ্দির মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই নাটকের সমগ্র নাট্যক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে। ক্রিয়া বা ঘটনাগত ঐক্যও রক্ষিত হয়েছে এই কারণে বলা যায় যে সর্বক্ষণই একটি টানটান উত্তেজনা এবং রহস্যের মধ্যে নাটক সংঘটিত হয়েছে। সংলাপে ও আচরণে কোথাও নাট্যকার এই একাগ্রতা নষ্ট হতে দেননি।

চতুর্থত, নাটকটি অত্যন্ত গতিশীল—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দর্শক কোথাও ক্লান্তি অনুভবের বা একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হবার কোন সুযোগ পান না।

এইসব কারণেই আমরা বলতে পারি, সার্থক একাঙ্ক নাটকের লক্ষণ বিচারে মন্মথ রায়ের 'রাজপুরী'কে একটি রসোত্তীর্ণ ও শিল্পোত্তীর্ণ একাঙ্ক নাটক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

ট. ট্র্যাজেডি

নাটকের অন্যতম প্রধান রসগত বিভাগ ট্র্যাজেডি। গুরুগম্ভীর বিষয়ের যে নাটকের শেষে থাকে বিয়োগব্যথা বা বিষাদ, তাকেই স্থূল অর্থে ট্র্যাজেডি' বলা

হয়। এই কারণেই বাংলায় এর পরিভাষা বিয়োগান্ত বা বিষাদান্ত নাটক। কিন্তু 'ট্র্যাজেডি' শব্দটি আমাদের কাছে এতোই পরিচিত ও বহুব্যবহারে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে যে আমরা সাহিত্যের অন্য যে-কোন প্রকরণ সম্বন্ধেও শব্দটিকে প্রায় বিশেষণের মত ব্যবহার করি—যথা ট্র্যাজিক কবিতা, উপন্যাসের ট্র্যাজেডি প্রভৃতি। এমনকি জীবনে কোন বিষণ্ণ ঘটনা ঘটে গেলে তাকেও আমরা ট্র্যাজিক ঘটনা বা জীবনের ট্র্যাজেডি ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করি। ট্র্যাজেডির বিস্তৃত লক্ষণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্‌স্‌ গ্রন্থে এবং প্রচুর সমালোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সে আলোচনা সমালোচকদের শিরোভূষণ হয়ে আছে। সুতরাং ট্র্যাজেডির স্বরূপ, তার বৈশিষ্ট্য এবং নাটকের অন্য রসগত বিভাগের সঙ্গে তার পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে অ্যারিস্টটলের শরণাপন্ন আমাদের হতেই হবে। তবে তার আগে সাধারণভাবে এ সম্বন্ধে দুটি-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার।

বাংলা পরিভাষায় ট্র্যাজেডি ঠিক কী হওয়া উচিত—বিয়োগান্ত অথবা বিষাদান্ত, এ বিষয়ে পরিভাষাবিদ্‌গণ এখনও নিঃসংশয় হতে পারেননি, কিন্তু ট্র্যাজেডির মূল ব্যাপারটা স্মরণে রাখলে এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব ছিল না। ট্র্যাজেডি আসলে কোন মানুষের এমন কোন বেদনা বা ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী যা তার প্রাপ্য ছিল না—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে। এ ব্যাপারটা তার সাংঘাতিক কিছু করে ফেলার (by doing something terrible) জন্যও ঘটতে পারে, অথবা সাংঘাতিক কিছু সহ্য করার ফলেও (by suffering something terrible) ঘটতে পারে। কাজেই, যে ভাবেই হোক, আপাত-নির্দোষ একটি মানুষের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় ও সেই দুর্ভোগই যখন ট্র্যাজেডির প্রাণ, তখন মানুষটির যন্ত্রণা দিয়েই ট্র্যাজেডির বিচার হতে পারে। যদি মৃত্যুই সবচেয়ে দুঃখের বলে মনে হয় তবে মৃত্যুকেই আমরা ট্র্যাজিক বলে মেনে নেব, যদি বেঁচে থাকার যন্ত্রণা মৃত্যুর চেয়েও বড় মনে হয় তখন বেঁচে থাকাটাকেই ট্র্যাজিক বলে মনে হবে। যেমন ধরা যাক, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস। এই উপন্যাসে প্রথাগত বিচারে এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে কুন্দনন্দিনীর কথা চিন্তা করলে তার মৃত্যুকে আমরা বলবো ট্র্যাজিক, কেন না বেচারির তেমন কোন দোষ না থাকলেও পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অন্য চরিত্রের আচরণের কারণে তাকে কষ্ট পেতে হয়েছে। সামগ্রিক ভাবে চিন্তা করলে এই প্রথা ধর্ম মেনেই বলতে হবে একটি মিলনান্ত বা কমিক সমাপ্তি ঘটেছে উপন্যাসের, কারণ নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখী উপন্যাসের শেষে আবার আগের মতই 'সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিল' গোছের মধুর পরিণতি দেখানো হয়েছে। বস্তুত ব্যাপারটা তাই ঘটেছে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কুন্দনন্দিনী বিবাহের পরের দিন থেকেই নগেন্দ্রের রূঢ় ব্যবহার সহ্য করেছে—ভালো কথা বলতে গিয়ে ধমক খেয়েছে, সূর্যমুখীর নাম পর্যন্ত তার মুখে সহ্য করতে পারেননি নগেন্দ্র। নগেন্দ্র যদি বালসুলভ আচরণ না করে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মতো এই বিবাহই মেনে

নিতেন এবং সূর্যমুখী সত্যিই যদি মারা যেতেন আগুনে পড়ে, তাহলে কুন্দর জীবন কেমন বিষময় হয়ে উঠতো সে কথা যদি একবারও কেউ চিন্তা করেন তাহলে তাঁকে স্বীকার করতে হবে, কুন্দ মারা গিয়ে বেঁচে গিয়েছে—বেঁচে থাকাটা হতো তার জীবনের সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ, সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজিক ঘটনা। পক্ষান্তরে নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখী পুনর্মিলিত হয়েছে, কিন্তু সত্যিই কি এ মিলন নির্বিকল্প সুখের! সূর্যমুখীর মতো স্ত্রী থাকতেও নগেন্দ্রের চিত্তস্খলন ঘটেছিল এবং কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করবার জন্য তিনি এমন পাগল হয়ে উঠেছিলেন যে বিবাহ না করা পর্যন্ত তার নিবৃত্তি ঘটেনি-এই ঘটনাটি পুনর্মিলিত দম্পতির কেউই কি ভুলতে পারবে! তাদের পরবর্তী জীবনে কুন্দনন্দিনীর অশরীরী অস্তিত্ব কি মিলনের পথে অলঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করবে না—যেমন করেছিল রবীন্দ্রনাথের গল্পে হরসুন্দরী ও নিবারণের মাঝখানে মধ্যবর্তিনী শৈলবালার অস্তিত্ব!

কাজেই আমরা বুঝতে পারি, বিয়োগ বা মৃত্যু ট্র্যাজেডির মূল কথা নয়, কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে সেই বিষাদ সৃষ্টি হয়েছে কিনা, সেটাই মুখ্য ব্যাপার যা আমাদের মনে ট্র্যাজিক সংবেদন সৃষ্টি করবে। সুতরাং বিয়োগান্ত নাটক না বলে বিষাদান্ত নাটক বললেই ট্র্যাজেডির চারিত্র ঠিক মতো প্রকাশ পেতে পারে বলে আমাদের মনে হয়।

সংস্কৃত নাটকে ট্র্যাজেডি নেই কেন, এ প্রশ্নের উত্তরও এই ট্র্যাজিক সংবেদনের রহস্য থেকেই পাওয়া যাবে। ট্র্যাজেডি সংক্রান্ত আলোচনায় অ্যারিস্টটলই এখনও শিরোধার্য বলে, ট্র্যাজিক সংবেদনের মূল কথা তাঁর রচনার ইংরেজি ভাষ্য থেকেই স্মরণ করা যাক। তিনি মাত্র দুটি শব্দে এটি বোঝাতে চেয়েছেন—unmeritted misfortune, অর্থাৎ এমন কোন misfortune বা ভাগ্যবিপর্যয় যা কিনা unmeritted—যেটা একেবারেই অপ্রাপনীয়, কোনমতেই তার জীবনে প্রত্যাশিত নয়। এই যদি হয় ট্র্যাজিক সংবেদন, তবে সংস্কৃত নাটকে তার যে স্থান হবে না এ তো সহজেই বোঝা যায়। কারণ ভারতীয় ধর্মচিন্তার মূল কথা, যেমন কর্ম তেমনি ফল—একটি মানুষ যেমন কর্ম করে তেমনই সে ফল লাভ করে, এই চিন্তার বিরোধী কোন ঘটনা সংস্কৃত নাটকে আমরা দেখাতে পারি না। আর তা দেখাতে না পারলে, অর্থাৎ প্রাপনীয় নয় এমন ফলই মানুষ লাভ করছে, এ ঘটনা না দেখালে ট্র্যাজিক সংবেদনও সৃষ্টি হবে না। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই সংস্কৃত নাটকে যথার্থ ট্র্যাজেডি নেই। এমন কি বাংলা পৌরাণিক নাটকেও ব্যাপারটা ওইখানেই অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। শেকসপীয়রের নাটক দেখে অনুপ্রাণিত নাট্যকার গিরিশচন্দ্রও ট্র্যাজিক সংবেদন সৃষ্টির ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল। তিনি জনার জীবনে সুন্দর ট্র্যাজিক উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন, তাকে অপূর্ব দক্ষতায় ব্যবহার করেছিলেন, অথচ জনার শোচনীয় মৃত্যুদৃশ্যের পরই এমন একক্রোড় অঙ্ক রচনা করলেন যাতে ভারতীয় ধর্মাদর্শেরই জয় ঘোষিত হল—পাশ্চাত্য ট্র্যাজিক সংবেদন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

● অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞা ও তার বিচার :

অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্‌স্' গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, বাইওটার তা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন এইভাবে—

"A tragedy, then, is the the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself ; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work ; in a dramatic, not in a narrative from ; with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its catharsis of such emotions."

এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা ট্র্যাজেডির কতকগুলি প্রধান লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য পাই। প্রথমত, ট্র্যাজেডি কোন বিশেষ ঘটনার অনুকরণ। এ থেকে ট্র্যাজেডিব বস্তুগত চরিত্রই ফুটে ওঠে, অর্থাৎ ভাবনাচিন্তার রূপায়ণ নয়, ট্র্যাজেডি কোন ঘটনার অনুকরণ। এই ঘটনারও অবশ্য বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে বলে তিনি সংজ্ঞায় বলেছেন, সেই বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) ঘটনাটিকে গুরুগম্ভীর হতে হবে, কোন তরল ঘটনা নিয়ে ট্র্যাজেডি রচিত হওয়া উচিত নয়।

(খ) ঘটনাটি বেশ কিছুটা আয়তনবিশিষ্ট হবে, অর্থাৎ একেবারে ক্ষুদ্র হবে না।

(গ) ঘটনাটি খাপছাড়া হবে না, তাকে সম্পূর্ণ হতে হবে। এর অর্থ হল তার সুস্পষ্ট আদি, মধ্য এবং অন্ত থাকবে।

দ্বিতীয়ত, এর আঙ্গিক হবে আনন্দদায়ক উপাদান দিয়ে তৈরি। এই উপাদান বা diction সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল এই অধ্যায়েরই পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মূলত ছন্দ এবং গীতিময়তাকেই বোঝাতে চান। যে অংশে যে রকম ছন্দ প্রয়োজন সেখানে সেইরকম ছন্দ প্রয়োগ করতে হবে, এই তাঁর অভিমত।

তৃতীয়ত, সমস্ত ব্যাপারটি লেখা হবে নাটকীয় ভাবে, বর্ণনামূলক ভঙ্গিতে নয়। এই বৈশিষ্ট্য অবশ্য যে কোন নাটকেরই মেনে চলা উচিত। কোন ঘটনা কীভাবে ঘটেছে, অন্যান্য চরিত্র তার বর্ণনা দিলে তা নাটক হয় না—নাটকে ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষ বর্ণনা থাকা প্রয়োজন, তাকেই বলে নাটকীয় উপস্থাপন।

চতুর্থত, ঘটনাক্রম যেন মানুষের মনে করুণা এবং ভীতির সঞ্চার করে। ট্র্যাজিক সংবেদন বলতে আমরা যা বুঝিয়েছি তা যদি নাটকে ফুটে ওঠে তবে চরিত্রের প্রতি করুণা আমাদের নিশ্চয়ই জাগবে, এবং সেই সঙ্গে জাগবে ভীতি এই কারণেই যে, মানুষ কৃতকর্ম ছাড়াও এই রকমের যন্ত্রণা বা বেদনা ভোগ করে। এই দৃশ্য আমাদের মনে ভয়ের সঞ্চার করাই স্বাভাবিক।

পঞ্চমত, আমাদের করুণা ও ভীতি ইত্যাদি অনুভূতির বিশ্লেষণ ঘটিয়ে ট্র্যাজেডি আমাদের চিত্তে আনন্দ সঞ্চার করে। অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞার অন্যান্য অংশের মত অনুভূতির 'বিমোক্ষণ' বা 'ক্যাথারসিস' নিয়েও প্রচুর আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তার বিস্তৃত পরিচয় দেবার অবকাশ এখানে নেই। শুধু এইটুকু বলা যায় ক্যাথারসিস বলতে মনের সেই রূপান্তরিত অবস্থা বোঝানোই সম্ভব যাতে একটি শোকবহ ঘটনাও মনে আনন্দের অনুভূতি দান করে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রসবাদী কাব্যতাত্ত্বিকগণ স্থায়ীভাব থেকে সিদ্ধিলাভ করে রসে পরিণত হবার যে প্রক্রিয়াকে বুঝিয়েছেন তার সঙ্গে এর মিল থাকা অসম্ভব নয়। ক্যাথারসিসের অন্য যেসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে লেসিং এবং লুকাসের ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য।

ট্র্যাজেডির এই সংজ্ঞা দান করেই অ্যারিস্টটল তার উপাদানের প্রসঙ্গে এসেছেন এবং বলেছেন ট্র্যাজেডির অপরিহার্য উপাদান ছটি—কাহিনী বা বৃত্ত (plot), চরিত্র (character), বাচন (Diction), মনন (Thought), দৃশ্যসজ্জা (Spectacle) এবং গীতিময়তা (Melody)। উপাদানগুলি বলতে সঠিকভাবে কী বোঝায় তাও তিনি বলেছেন। বৃত্ত বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সমগ্র আখ্যানে যে ঘটনাগুলি গ্রথিত হয় সেই ঘটনার সমষ্টি ও যুক্তিবদ্ধ গ্রন্থনা। চরিত্র বলতে তিনি ঠিক পাত্রপাত্রীদের বোঝাননি, বুঝিয়েছেন পাত্রপাত্রীদের সেই বিশেষ মানবিক গুণ বা দোষ যার দ্বারা তার 'চরিত্র' হয়ে ওঠে। বাচনের অর্থ খুবই স্পষ্ট—'The composition of the verse', এবং গীতিময়তা তখন এতোই অনিবার্য ছিল যে তার কোনরকম ব্যাখ্যা প্রয়োজন বলেই তিনি মনে করেননি। মননের ব্যাখ্যা প্রয়োজন ছিল বলেই তিনি যা লিখেছেন তার ইংরেজি ভাষান্তর—"Thought is shown in all they say when proving a particular point, or it may be, enunciating a general truth." এই সঙ্গেই দৃশ্যসজ্জা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য এটা যেন বহিরঙ্গ-বিলাস না হয়ে দাঁড়ায়—Spectacle (or stage appearance of the actors) must be some part of the whole."

● ট্র্যাজেডির নায়ক

ট্র্যাজেডির নায়ক কী ধরনের চরিত্র হতে পারে এবং তার চরিত্রের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য সঠিক ট্র্যাজিক সংবেদন ঘটাবার কাজে সাহায্য করতে পারে, এ নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা করেছেন অ্যারিস্টটল।

প্রথমত, মানুষকে চিত্রিত করার যে তিনটি উপায় লেখকের কাছে আছে—সে যেমন ঠিক তেমনি, সে যেমন তার চেয়ে হেয় এবং সে যেমন তার চেয়ে উন্নত—এর মধ্যে তৃতীয়টিই ট্র্যাজেডির নায়কের ক্ষেত্রে আমরা আশা করি, কারণ নায়ক মহিমা-সম্পন্ন না হলে যথার্থ ট্র্যাজিক সংবেদন সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, ট্র্যাজেডির নায়ককে হতে হবে বিখ্যাত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কথাটা একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিখ্যাত এবং ঐশ্বর্যশালী না হলে ট্র্যাজেডির নায়ক হওয়া যাবে না, অ্যারিস্টটলের এই কথা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। আসলে, কমেডিতে থাকে একটু নীচু ধরনের মানুষ, ট্র্যাজেডিতে থাকে কিছুটা উঁচু ধরনের মানুষ—এটাই ছিল তাঁর বক্তব্য। বিখ্যাত না হলেও ট্র্যাজেডির নায়ক যে হওয়া যায়, পরবর্তীকালে তার প্রচুর উদাহরণ আমরা দেখেছি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা অবশ্য ট্র্যাজেডির নায়কমাত্রেরই থাকা উচিত। যার জীবনের সব আশা শেষ হয়ে গিয়েছে বুদ্ধিবৃত্তি যার পংগু হয়ে গিয়েছে,—উদাহরণ হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়বে 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের কথা—তাকে কখনো ট্র্যাজেডির নায়ক বলা যাবে না ; তার অন্তত 'মেঘনাদবধ কাব্যের' প্রধান পুরুষ রাবণের মতো সহ্য করবার ক্ষমতা থাকবে অসীম।

তৃতীয়ত, অতিভালো মানুষ বা অতিধার্মিক ব্যক্তি কখনো ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারেন না, কারণ এরকম মানুষের করুণ ভাগ্যবিপর্যয় দেখলে আমরা আশাহত হয়ে পড়ি। তাঁদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী আমাদের মনে করুণা জাগায় না, আমাদের দুঃখে অভিভূত বরে ফেলে। অবশ্য এই মত পরবর্তীকালে অনেকে মেনে নিতে পারেননি।

চতুর্থত, অতি মন্দলোক বা শয়তানও ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারেন না, কারণ তাঁর পতন আমাদের কোন সহানুভূতি জাগায় না। তার চেয়েও বড়ো কথা, যথার্থ ট্র্যাজিক সংবেদনও সৃষ্টি করা যায় না অতি-মন্দ লোকের ক্ষেত্রে। তিনি যে ধরনের ভাগ্যবিপর্যয়েরই সম্মুখীন হোন না কেন, তাকে আমাদের অপ্রাপণীয় বা unmeritted মনে হয় না। এই মতটিও পরবর্তীকালে প্রচুর সমালোচিত হয়েছে।

পঞ্চমত, ট্র্যাজেডির নায়কের শোচনীয় ভাগ্যবিপর্যয় ঘটার জন্য বাহ্যিক কারণ কিছু নিশ্চয়ই থাকতে পারে, কিন্তু তার প্রধান কারণটিকে বলা হয়েছে Hamartia বা আরো সাধারণ কথায় Tragic flaw. গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রধান হ্যামারশিয়াকে বলা হয়,'Hubris' অর্থাৎ নায়কের আত্মবিশ্বাসের প্রাবল্য—তার জন্য তিনি এতো অতিরিক্ত গর্বিত যে দেবতার সাবধানবানীকেও তিনি গ্রাহ্য না করে নিজের পতন ডেকে আনেন। শেক্‌স্‌পীরীয় ট্র্যাজেডিতে এটা দেখা যায় নায়কের বিচার-বিভ্রম (Error of jndgement) বা অন্তর্নিহিত কোন দুর্বলতা (Frailty) হিসাবে।*

● ট্র্যাজেডির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : গ্রীক ও ইংরেজি সাহিত্য

ট্র্যাজেডির উদ্ভব যে গ্রীসে, এ সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই। অ্যারিস্টটল

* এ সম্বন্ধে এবং ট্র্যাজেডির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা পাওয়া যাবে লেখকের 'সাহিত্য-বীক্ষণ' গ্রন্থে (প্রকাশক : এস্‌ ব্যানার্জি এ্যান্ড কোং কলকাতা-৯)।

যখন তাঁর 'পোয়েটিক্‌স্‌' রচনা করেন তখনই গ্রীক সাহিত্যের বিখ্যাত ট্র্যাজেডি রচয়িতা ইস্কাইলাস, সোফোক্লিস, এবং ইউরিপিদিস প্রাচীন হয়ে এসেছেন।

ট্র্যাজেডির উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে। 'ট্র্যাজেডি' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'goat-song' বা ছাগগীতি বলে অনেকে মনে করেন প্রাচীন কালে ডায়োনিসাস দেবতার উদ্দেশে ছাগল বা ভেড়া বলিদানের সময় যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো, তা থেকেই ট্র্যাজেডির উৎপত্তি।

আর একটি মত অনুসারে ট্র্যাজেডির উৎপত্তি আরো প্রাচীনকালে। অতীতে যেসব দীক্ষাবিধি ছিল সেই গুলোই ট্র্যাজেডির প্রাচীনতম রূপ।

সমালোচক রিজ্‌ওয়ে তাঁর Origion of Tragedy, with special reference to Greek Tragedians' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন যে ডায়োনিসাস দেবতার কাছে ছাগ বলির অনুষ্ঠান থেকে মোটেই ট্র্যাজেডির উদ্ভব নয়, গ্রীকদের পূর্ব-সূরীদের পূজা বা মৃতের উদ্দেশে এক ধরনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকেই ট্র্যাজেডি উদ্ভূত হয়েছে। অবশ্য ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে প্রথম প্রথাসম্মত আলোচনা অ্যারিস্টটলই করেন, সেই জন্য তাঁর মতই অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, প্রাচীন ডিথাইরাম্ব (Dithyramb) গান থেকেই ট্র্যাজেডির উদ্ভব ঘটেছে। উদ্ভবের পর তার বিবর্তন কীভাবে অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঘটেছে সে সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল বলেছেন "Tragedy advanced by slow degrees, each new element that showed itselef was in turn developed. Having passed through many changes, it found its natural form."

প্রাচীন গ্রীক নাটকের নির্মাণরীতিতে পাঁচটি বিভাগ আছে-সর্বত্রই অবশ্য সমবেত সংগীত বা chorus-এর একচ্ছত্র প্রাধান্য। কোরাসের এই প্রাধান্য সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের মন্তব্যঃ The Chorus must be regareded as one of the actors, and a part of the whole and as joining in the action." প্রথম ভাগে কোরাসের আগে থাকে প্রোলোগ (Prologos)—সেখানে স্বগতোক্তি বা দুই চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে নাটকের বিষয়বস্তুর পরিচয় দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ভাগ প্যারোড (Parodos) যেখানে গান গাইতে গাইতে সমবেত সংগীতের কুশীলব প্রবেশ করে। তৃতীয় ভাগ এপিসোডিয়া (Epeisodia), এটি পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত এবং এখানে কোরাস ও কিছু চরিত্র নাট্যবস্তুকে আরো বিশদ করেন। চতুর্থ বিভাগ স্ট্যাসিমা (stasima)—এখানে কোরাস একই জায়গায় দাঁড়িয়ে গান করে যায়। সর্বশেষ বিভাগটিকে বলা হয় এক্সোডাস (Exodos)।

এই বিভাগ অবশ্য কেবল আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যই বোঝায়। গ্রীক নাটকের প্রকৃতি-গত বৈশিষ্ট্যেরও সামান্য পরিচয় জেনে রাখা ভালো।

এককথায় বলতে গেলে গ্রীক ট্র্যাজেডিকে ধর্মমূলক এবং ঈশ্বরের বিধানের প্রতি

নিষ্ঠামূলক বলা যেতে পারে। আমাদের সাধারণ ধারণা, এখানে মানুষকে ঈশ্বরের ক্রীড়নক এবং অদৃষ্ট বা অদৃষ্টের দেবতা নেমেসিসের দাস হিসাবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু এ ধারণা যে ঠিক নয় তা স্কাইনবার্গ-সহ অনেক পণ্ডিত সমালোচকই দেখিয়েছেন কিছু বিধান আছে যা ধর্মীয় বলে নয়, স্বাভাবিক ও নৈতিক দিক থেকেই লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কোন মানুষ যদি তা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করে তবে ঈশ্বরের রোষ তার ওপর নেমে আসে—মোটামুটি এই হল গ্রীক ট্র্যাজেডির অন্তর্গত সত্য। যেমন সোফোক্লেসের বিখ্যাত নাটক 'ইলেক্‌ট্রা'-য় একদা ক্লাইটেমনেস্ট্রা স্বামী হত্যা করে যে অন্যায় করেছিলেন, তার প্রতিশোধ নিয়েছে তাঁরই দুই ছেলে ওরেস্টাস এবং ইলেক্‌ট্রা তাদের মাকে হত্যা করে এবং এ কাজে দেবতা অ্যাপোলোরও পুরোপুরি সম্মতি ছিল। গ্রীক ট্র্যাজেডির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নীতিগর্ভ বাক্যের সমাবেশ, অলংকৃত ভাষা, নাটকে একটা প্রশান্ত পরিবেশের সৃষ্টি, ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া মঞ্চে প্রত্যক্ষ ভাবে না দেখিয়ে তার বর্ণনা দেওয়া প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত রোমান ট্র্যাজেডির কথাও বলা দরকার। রোমান নাটক ও সেনেকান ট্র্যাজেডি কথাদুটি প্রায় সমার্থক হয়ে এসেছে, কারণ প্রাচীন নাট্যকার সেনেকা (খ্রীষ্ট পূর্ব ৪ সাল থেকে ৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) যে ট্র্যাজেডিগুলি লিখেছেন, পরবর্তী কালে তা ইংরেজ নাট্যকারদের আদর্শ হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখা দশটি নাটকের কথা জানা যায়, এগুলি হল মিডিয়া, ফায়েড্রা, অয়দিপাউস, অ্যাগামেমনন প্রভৃতি। রোমান বা সেনেকার ট্র্যাজেডিগুলি ছিল বক্তৃতাধর্মী, সেজন্যই সমালোচক অ্যাব্রাম্‌স্‌ বলেছেন, "Senecan tragedy was written to be recited, rather than acted."

ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যযুগে গ্রীক ট্র্যাজেডির প্রভাব প্রায় কিছুই দেখা যায় না। সেই সময়ে যেসব নাট্যগাথা পাওয়া যায় তার মধ্যে লোকসাহিত্যের লক্ষণ প্রবল। ইংরেজি ট্র্যাজেডির গৌরবময় যুগ বলা যায় এলিজাবেথীয় যুগকে। এই সময়ে সেনেকার নাটক দুটি ধারায় ইংরেজি নাটককে প্রভাবিত করে। একটা ধারাকে বলা যেতে পারে সেনেকার আদর্শে প্রথাগত ট্র্যাজেডি যেখানে কোরাসের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে, নাটকের ত্রিবিধ ঐক্যকে দৃঢ়ভাবে মেনে চলা হয় এবং আলংকারিক ভাষা ব্যবহার করা হয় সযত্নে। এর একেবারে প্রাচীন উদাহরণ স্যাকভিল এবং নর্টনের লেখা 'গর্বোডাক' নাটক। অন্য যে ধারাটির উল্লেখ করা হয়েছে তাকে সাধারণ-ভাবে বলা যায় প্রতিশোধমূলক ট্র্যাজেডি বা রক্তক্ষয়ী ট্র্যাজেডি। সেনেকার যেসব নাটকে প্রতিহিংসা, হত্যা, রক্তপাত, নৃশংসতা ইত্যাদি আছে, তাই এই ধারাটির আদর্শ। কিন্তু সেনেকা যেখানে বর্ণনার মাধ্যমেই এই বীভৎস ব্যাপারগুলি সেরেছেন, এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারগণ সেখানে ঐই রোমহর্ষক দৃশ্যগুলি মঞ্চের ওপরেই নিয়ে এসেছেন। এই ধরনের ইংরেজি ট্র্যাজেডির মধ্যে উল্লেখ করা

যার টমাস কীডের 'দি স্প্যানিশ ট্র্যাজেডি', মার্লো-র 'দি জ্যু অব মালটা' এবং শেক্‌স্‌পীয়রের 'টাইটাস অ্যানড্রোনিকাস'—অবশ্য এই ধারাতেই এসেছে তাঁর অমূল্য সৃষ্টি 'হ্যামলেট'।

১৫৮৫ থেকে ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ, প্রায় চল্লিশ বছরের এই কালসীমার মধ্যেই ইংরেজি ট্র্যাজেডির বিখ্যাত স্রষ্টাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, যেমন মার্লো, শেক্‌স্‌পীয়র চ্যাপম্যান, ওয়েবস্টার, বোমণ্ট, ফ্লেচার, ম্যাসিঞ্জার প্রভৃতি। এদের অনেকেই অ্যারিস্টটলের নির্দেশিত আদর্শ মেনে চলেননি, শেক্‌স্‌পীয়র তো ননই—এবং সেই কারণেই আমরা গ্রীক নাটক ও শেক্‌স্‌পীরীয় নাটকের দুটি আদর্শ লাভ করেছি। যেমন ধরা যাক 'ম্যাকবেথ' নাটকের কথা। একটি ভালো মানুষ বিচার-বিভ্রমের জন্য ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন—একথা ম্যাকবেথ সম্বন্ধে বলা যাবে না, তবে অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ তাঁকে নিশ্চয়ই বলা যায়। অ্যারিস্টটল বলেছেন অতি মন্দলোক ট্র্যাজেডির নায়ক হতে পারেন না, কিন্তু 'রিচার্ড দি থার্ড' নাটকের নায়ককে কোন মতেই অতি মন্দ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। অবশ্য সব নাটকেই যে শেক্‌স্‌পীয়র অ্যারিস্টটলের নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন এমন নয়, যেমন 'ওথেলো' পুরোপুরি অ্যারিস্টটলীয় ধারণাকেই সমর্থন করে। এলিজাবেথীয় যুগের ট্র্যাজেডিতে আর একটা জিনিস এলো যা অ্যারিস্টটলের পক্ষে ভাবা সম্ভব ছিল না, সেটা হচ্ছে ট্র্যাজেডির মধ্যে হাস্যরসাত্মক কিছু অংশ পরে যার সাধারণ নাম হয়েছে 'কমিক রিলিফ'। পরবর্তীকালে রেস্টোরেশন যুগে মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির মাঝামাঝি একটি প্রকরণের উদ্ভব হয় যাকে অবশ্য ট্র্যাজেডির একটি প্রকারভেদ বলাই সংগত, এর নাম মহাকাব্যিক ট্র্যাজেডি।

অষ্টাদশ শতকের আগে পর্যন্ত ইংরেজি ট্র্যাজেডিগুলি পদ্যেই লেখা হয়েছে এবং অজ্ঞাত নাট্যকার-রচিত 'এ ইয়র্কশায়ার ট্র্যাজেডি-'র মতো ব্যতিক্রমী নাটক বাদ দিলে তারা বিখ্যাত ও উচ্চশ্রেণীর মানুষকেই নায়ক হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে। অষ্টাদশ শতকেই আমরা গদ্যমাধ্যমে লেখা নাটক পাই এবং এক ধরনের ট্র্যাজেডি পাই যাকে বলা হয় 'ডোমেস্টিক ট্র্যাজেডি'—যেখানে সাধারণ মানুষও নায়কত্ব করতে পারে। উদাহরণ হিসাবে জর্জ লিলো-র 'দি লণ্ডন মার্চেন্ট' নাটকের নাম করা যায়। এরপর থেকে গদ্যে বহু বিখ্যাত ট্র্যাজেডিই লেখা হয়েছে। মধ্যবিত্ত মানুষ কেবল নয়, শ্রমজীবী মানুষকে নিয়েও লেখা হয়েছে ট্র্যাজেডি। একেবারে আধুনিক কালে লেখা নাটকের মধ্যে বিশ শতকের বিখ্যাত নাট্যকার আর্থার মিলারের 'দি ডেথ অব এ সেলস্‌ম্যান' (১৯৪৯) নাটকের উল্লেখ করা যায়, রূপান্তরের মাধ্যমে আমাদের কাছেও যার অভিনয় অত্যন্ত পরিচিত। এর নায়ক উইলি লোম্যানের সঙ্গে আমরা যে সহানুভূতির বন্ধন অনুভব করি তার প্রকৃতি অ্যারিস্টটলের 'pity and fear'-এর চেয়ে কিছু স্বতন্ত্র। এসব থেকেই সম্ভবত প্রথাবহির্ভূত নায়ক বা 'anti-hero-র ধারণা গড়ে উঠেছে এইসব প্রতিবাদী নাট্যকারদের সৃষ্টিতে।

স্যামুয়েল বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোদো' নাটকে ভ্ল্যাদিমির ও এস্ট্রাগনের কথা ভাবলেই এই 'অ্যান্টি-হিরো'-র ধারণাটি বোঝা যাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইংরেজি ট্র্যাজেডির ধ্যান-ধারণা অনেক পাল্টে গেছে। প্রাচীন নাটকের নব্য রূপায়ণ যেমন ঘটেছে তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলেছে কম না। উদাহরণ হিসাবে ইউজিন ও'নীলের 'মোর্নিং বিকামস ইলেকট্রা' বা এলিয়টের কাব্যনাট্য 'মার্ডার ইন দা ক্যাথিড্রাল'-এর উল্লেখ করা যায়।

বাংলা সাহিত্যে ট্র্যাজেডির উদ্ভবের সঙ্গে মধ্যযুগীয় বাংলা লোকসংস্কৃতি যাত্রাগান বা পাঁচালির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই বলেই সাধারণভাবে মনে করা হয়, তবে যাত্রাপালায় সংগীতের আধিক্যে কোরাসের কথা মনে পড়তে পারে। তার চেয়েও বড়ো কথা, কোরাস যে কাজটি সম্পাদন করতো, যাত্রাপালায় সে কাজ দীর্ঘদিন করে এসেছে বিবেক নামক একটি চরিত্র—সংগীতেরই মাধ্যমে। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে সংস্কৃত নাটকেই যখন ট্র্যাজেডির উত্তরাধিকার নেই তখন ইংরেজির থিয়েটার ছাড়া বাংলা নাটক ট্র্যাজেডির আদর্শ আর পাবে কোথা থেকে!

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ট্র্যাজেডি রচনার প্রচেষ্টা 'কীর্তিবিলাস', লেখক জি. সি. গুপ্ত, শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেনের অনুমান পুরো নামটি গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত। 'রচনা অমার্জিত এবং বিশৃঙ্খল হইলেও বিষাদান্ত নাটক-রচনায় প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়া কীর্তিবিলাসের ঐতিহাসিক মূল্য আছে'—এই অভিমতও তাঁর।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি হিসাবে স্বীকার করা হয় মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণ কুমারী' নাটক'কে। এই নাটকে অবশ্য শেক্‌স্‌পীরীয় আদর্শ অপেক্ষা গ্রীক নাটকের আদর্শই বেশি দেখতে পাই আমরা। অপাপবিদ্ধা তরুণী কৃষ্ণকুমারীর আহ্বানে তার নিজের কোন বিচারবিভ্রম বা frailty আমরা দেখতে পাইনি—মনে হয়েছে যেন অপরিহার্য নিয়তি তার জীবনকে বিষময় করে তুলেছে। সমালোচকগণ বোধহয় সেই কারণেই ইউরিপিদিসের 'ইফিগেনিয়া' নাটকের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে। তবে অ্যারিস্টটলীয় ধারণার বাইরে গিয়ে এখানে ধনদাস-মদনিকা বৃত্তান্ত নিয়ে নাট্যকার বেশ কিছুটা comic relief তৈরি করেছেন। একই সঙ্গে বাংলা নাটকের আদি যুগে রচিত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের উল্লেখ করতে হবে। ট্র্যাজেডির আদর্শে তাকে খুব উচ্চাসন দেওয়া যাবে না, যদিও এর ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ এবং জনপ্রিয়তার বিচারেও প্রথম যুগের কোন নাটক এর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না।

দ্বিতীয় পর্বের নাট্যকারদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ শেক্‌স্‌পীরীয় নাট্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রচুর নাটকের মধ্যে তাঁর পৌরাণিক নাটকই যদিও সংখ্যায় বেশি—'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'বলিদান' প্রভৃতি সামাজিক ট্র্যাজেডিও তিনি রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐতিহাসিক নাটক রচনায় যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তার মধ্যে কিছু ট্র্যাজেডিও আছে। 'সাজাহান' ও

'নূরজাহান' তাঁর দুটি বিখ্যাত ট্র্যাজেডি। গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক নাটকে গৈরিশ ছন্দ ব্যবহার করলেও সামাজিক নাটকে বিশুদ্ধ গদ্যই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্যভাষা একেবারেই পদ্যগন্ধী, যেমন 'নূরজাহান' নাটকে জাহাঙ্গীরের সংলাপ—"সেদিন গবাক্ষপথে দেখলাম কি সে মূর্তি!—যেন তুষারের উপর উষার উদয়; যেন স্তব্ধ নিশীথে ইমনের প্রথম ঝঙ্কার; যেন মনুষ্যের প্রথম যৌবনের প্রেমের প্রভাত।"

রবীন্দ্রনাথ ট্র্যাজেডি চেতনাতেও ছিলেন বিশিষ্ট, বিশেষ ও স্বতন্ত্র ভাবে বিচার না করলে এর মৌলিকত্ব বোঝা সম্ভব নয়। তাই প্রকরণের আলোচনায় তাঁর নাটক ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। 'বিসর্জন' নাটককে আমরা তাঁর প্রথানুসারী সর্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি বলতে পারি। অন্যান্য ট্র্যাজেডিতে তিনি যে শেক্স্‌পীয়রকেই অনুসরণ করেছেন একথা তিনি আভাসে বলেছেন, তবে 'মালিনী' নাটকে গ্রীক নাট্যরীতির প্রভাব বিশিষ্ট গ্রীক সাহিত্যের সমালোচকগণও লক্ষ করেছেন। রবীন্দ্র-সমসাময়িকদের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ নাট্যকার হিসাবেও সমর্থ ছিলেন, ট্র্যাজেডির লেখক হিসাবেও। পরবর্তীকালে নাটক এবং ট্র্যাজেডি রচনায় যাঁরা খ্যাতিমান হয়েছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন নিশিকান্ত বসু ('দেবলাদেবী'), বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ('মিশরকুমারী'), মন্মথ রায় ('জীবনটাই নাটক'), যোগেশ চৌধুরী ('সীতা') শচীন সেন ('গৈরিক পতাকা'), বিধায়ক ভট্টাচার্য ('মাটির ঘর')।

বাংলা নাটকের জাত বদল হয়, নবনাট্য বা গণনাট্য আন্দোলনের সময়। ইংরেজি নাটকে যাকে বলে anti-hero, সেই প্রথায় জনসাধারণকে প্রাধান্য দিয়ে mass-theatre বা গণনাট্য দেখা যায়। এই পর্যায়ে সব নাটকেই যে ট্র্যাজেডি এমন নয়। তবে 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার', 'ছেঁড়া তার' প্রভৃতি কিছু ভালো ট্র্যাজেডি এই সময় লেখা হয়েছে। বিজন ভট্টাচার্য এবং তুলসী লাহিড়ী ছিলেন এই সময়ের দুজন শক্তিমান নাট্যকার। এই ধারায় পরে অভিনেতা-নির্দেশক নাট্যকার উৎপল দত্ত কিছু ভালো নাটক রচনা করেন।

নাটকের আধুনিক পর্যায়কে অনেকে দীন মনে করেন। বিখ্যাত বিদেশী নাট্যকারদের রচনার অনুবাদ রূপান্তর বা ভাবানুসরণে লেখা নাটকের সংখ্যা এখন বেশি, তবে মৌলিক ট্র্যাজেডিও একেবারে নেই তা নয়। বুদ্ধদেব বসুর হাতে জন্ম হয়েছে কাব্যনাট্যের এবং রাম বসু, আলোক সরকার প্রভৃতি কবিদের হাতে এই শ্রেণীটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।

● একটি বাংলা ট্র্যাজেডির বিশ্লেষণ

ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন লক্ষণ সম্পর্কে যা আলোচনা আমরা এতোক্ষণ করলাম তার আলোকে একটি বাংলা ট্র্যাজেডির শিল্পসার্থকতা বিচার করা যেতে

পারে। বাংলা নাট্য সাহিত্যের স্বীকৃত প্রতিভা গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং 'জনা' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তি। সুতরাং বিচারের জন্য এই নাটকটিই আমরা গ্রহণ করবো।

'জনা' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাজা নীলধ্বজের পত্নী জনা এবং তাঁর ট্র্যাজেডিই যখন নাটকের ঈপ্সিত তখন এটিকে ইংরেজি ট্র্যাজেডির আদর্শে She-tragedy ধরনের নাটক ভাবাই ভালো। মহাভারতের বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন এবং দিগ্বিজয় করার উদ্দেশ্যে সেই অশ্ব নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যপরিক্রমায় বার হয়েছেন অর্জুন ও কৃষ্ণ। তাঁরা নীলধ্বজের রাজ্যে উপস্থিত হয়েছেন, এই খবর জানিয়ে অগ্নিদেব রাজাকে অনুরোধ করেন শ্রীকৃষ্ণকে পুজোপচারে বরণ করে নেবার জন্য। রাজ্যের সকলেই এই প্রস্তাবে একমত, শুধু জনা এ কথা মানতে পারেন না। তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি পুজো পাবার জন্যই তাঁদের কাছে মাহিষ্মতী পুরীতে আসতেন তাহলে তাঁকে বরণ করে নিতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না, কারণ তিনি নিজেও কম হরিভক্ত নন। কিন্তু তিনি বলেন, 'হরিভক্তি নহে রাজা হীনতা স্বীকার।' শ্রীকৃষ্ণ এখন ঈশ্বর হিসাবে এখানে আসছেন না, 'অরিরূপে নারায়ণ আসিয়াছে ঘরে।' সুতরাং তাঁকে যদি যুদ্ধক্ষেত্রেই আহ্বান না জানানো হয় তবে ক্ষাত্র ধর্মের অসম্পন্ন ঘটে। জয়-পরাজয় মানুষের হাতে নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই রণের আহ্বান উপেক্ষা করা কোন ক্ষত্রিয় বীরেরই উচিত নয়।

জনার এ কথা সকলে অগ্রাহ্য করে, করতে পারে না মাতৃভক্ত ও তাঁর বীরপুত্র প্রবীর। প্রবীর অর্জুনের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব আটকায় এবং অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সে তিলমাত্র ভীত নয়, কারণ মাতৃভক্তি তার অপরিসীম—'মাতৃনাম কবচ আমার' এবং সে জানে মায়ের যদি আশীর্বাদ থাকে—'ধরি তোর পদ ধূলি শঙ্করে না ডরি।' সকলে প্রবীরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে, যজ্ঞের অশ্ব ফিরিয়ে দেবার পরামর্শ দেয়, কিন্তু জনার কথা—'রণে যেতে পুত্রে আমি কভু না বারিব।' শেষ পর্যন্ত প্রবীরের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয় এবং বোঝা যায় এই যুদ্ধের প্ররোচনাও কৃষ্ণেরই পরিকল্পনা, কারণ—"মহাবীর প্রবীর না পতন হইলে।
পাণ্ডবের সমকক্ষ বীর রবে ভবে।"

কাজেই প্রবীরের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়, অন্যায় ভাবে ছলনাময় কৃষ্ণ তার সমস্ত শক্তি হরণ করে নেন, অর্জুনের হাতে সে নিহত হয় এবং জনার রোষবহ্নি থেকে কেমন করে অর্জুন নিজেকে বাঁচাবে, সে উপায়ও কৃষ্ণ বলে দেন অর্জুনকে। অসহায় জনা শেষ অবলম্বন হিসাবে অনুরোধ জানান ভাইকে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার জন্য। ভাই অসম্মত হওয়ায় শেষপর্যন্ত জাহ্নবীর জলে জীবন বিসর্জন করা ছাড়া কোন উপায় তাঁর থাকে না। ক্রোড় অঙ্কে অবশ্য দেখা যায় জনার যাবতীয় ক্লেশের অবসান ঘটেছে—তিনি প্রসন্ন মুখে মাতা জাহ্নবীর কোলে বসে আছেন।

অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা হিসাবে বিচার করলে আমরা বলতে পারি—

(ক) ঘটনাটি যে গুরু গম্ভীর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্য সকলে যখন

ভক্তির আবেগে প্রবাহিত তখন যুক্তির বলিষ্ঠতায় জনা নিজের চিন্তাশক্তিকে অটল রাখতে পেরেছেন। ক্ষাত্র ধর্মের সঙ্গে ভক্তি ধর্মের এই সংঘাত যথার্থ ট্র্যাজেডির উপযুক্ত বিষয়, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

(খ) নাটক হিসাবে এটি স্বল্পায়তন নয়।

(গ) একটি পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজেডি গঠিত হবার মতো আয়তন এই নাটকের আছে। এর সুস্পষ্ট আরম্ভ আছে, দ্বন্দ্বময়তায় কাহিনীর স্পষ্ট নাট্যদেহ আছে এবং একটি সুনির্দিষ্ট উপসংহারও আছে।

(ঘ) জনা নাটকের গঠনশৈলি বা ভাষার আলোচনা পৃথকভাবে করা অর্থহীন। মোটামুটিভাবে বলা যায় গিরিশচন্দ্র তাঁর নাট্যভাষা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে সমর্থ ছিলেন। শুধু গৈরিশ ছন্দের আবিষ্কারক হিসাবে নয়, চরিত্রের মানসিকতা এবং বক্তব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী ভাষা-পরিবর্তনে তিনি দক্ষ ছিলেন। সেই জন্যই প্রবীরের মুখে যখন দিয়েছেন উচ্ছ্বসিত সংলাপ, বিদূষকের মুখে তখন রেখেছেন দ্ব্যর্থবোধক সরস সংলাপ। সাধারণভাবে গদ্য সংলাপে ঘটনা এগিয়ে চলে, অথচ যখনই তা ভাবগম্ভীর বা আবেগবিহ্বল হয়ে পড়ে তখনই ভাষা পরিবর্তিত হয়ে যায় গদ্যমাধ্যমে। প্রকৃতি অনুযায়ী এই ভাষারীতির পরিবর্তন সর্বত্রই যে স্বাদু হয়েছে তা নয়, কোথাও তা রসাভাসও ঘটিয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় জনার মস্তিষ্কবিকৃতির সময় এই সুসংবদ্ধ সংলাপ—

"যথা নিবিড় আঁধারে
ঘোর রোলে পরমাণু ঘূর্ণ্যমান।
যথা জড় জড়িমায় প্রকৃতি জড়িত
ঘোর ধূম মাঝে
চলে প্রলয় জীমূত শ্রেণী
বজ্র-অগ্নিধারা ঝরে।"

তবে এগুলিকে ব্যতিক্রম হিসাবে মেনে নেওয়াই ভালো।

(ঙ) ট্র্যাজেডি সার্থক করে তুলতে হলে যে বর্ণনামূলক রীতি বর্জন নাটকীয় রীতি, অর্থাৎপ্রত্যক্ষ ঘটনা-সংঘটন মূলক রীতির দিকে নজর রাখতে হয়, 'জনা' নাটকে সর্বত্র তা নাট্যকারের স্মরণ ছিল। এই নাটকে প্রবীরের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ, মোহিনী মায়ার প্রবীরের বর্ম ও তীর ধনুক অপহরণ, প্রবীরের মৃত্যু, পুত্রশোকে উন্মাদিনী জনাকে সামলানোর প্রাণ বিসর্জন ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই নাট্যকার প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়েছেন, অন্য চরিত্রের মুখে বর্ণনা করেননি।

(চ) যে নাটকীয় ঘটনাগুলি দেখানো হয়েছে তা আমাদের মনে করুণা ও সহানুভূতির সঞ্চার করে কিনা—এ প্রশ্নটি ট্র্যাজেডি-বিচারের পক্ষে সম্ভবত সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ওপরই যথার্থ ট্র্যাজিক সংবেদন নির্ভর করে। জনার মানসিকতার যে দ্বন্দ্ব অনাবৃতভাবে এই নাটকে তুলে ধরা হয়েছে তাতে তাঁর প্রতি করুণা ও সহানুভূতি আমাদের মনে নিশ্চয়ই জাগবে। সকলেই যখন কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত তখন জনা যে যুক্তিতে কৃষ্ণকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে পেতে চান বা পুত্রের রণস্পৃহা সমর্থন করেন তা আমাদের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য বলেই মনে হয়। নিজের যুক্তিতে অটল থেকে বহুর বিরুদ্ধে একা তিনি যেভাবে সংগ্রাম করেন তাতে spectacle of doing something terrible যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি প্রবীরের মৃত্যুতে এবং ভাইয়ের প্রত্যাখ্যানে ফুটে ওঠে তাঁর sufferings of something terrible ; তাই চরিত্রটির ট্র্যাজিক উপাদান এবং সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে তার ব্যবহারের প্রতি কোন সন্দেহই আমাদের থাকতে পারে না। গঙ্গার জলে তাঁর অসহায় আত্মহত্যা ট্র্যাজেডির উদ্দিষ্ট pity এবং fear দুইই জাগিয়ে তোলে আমাদের মনে।

শুধু অসুবিধা এই যে, নাটকটি যেখানে শেষ হলে আমরা তাকে নির্দ্বিধায় একটি মহৎ ট্র্যাজেডি হিসাবে স্বীকার করে নিতে পারতাম, গিরিশচন্দ্র সেখানে নাটকটি সমাপ্ত করেননি। তিনি পৌরাণিক নাটক হিসাবে 'জনা'-র প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে এর পরেও একটি ক্রোড় অঙ্ক সংযুক্ত করেছেন এবং তাতেই ট্র্যাজিক সংবেদন দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। জনার সুবিশাল প্রতিরোধ, অপরিমেয় যন্ত্রণা এবং ট্র্যাজিক সমুন্নতি একেবারে হাস্যকর হয়ে যায় যদি এ সমস্ত মর্ত্যলীলাই 'প্রপঞ্চ' হয়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ এই বলে সান্ত্বনা দিতে পারেন যে জনা এখন 'নহে আর পুত্রশোকে উন্মাদিনী'—কিন্তু পুত্রশোকের যে বেদনা আমাদের মনে ট্র্যাজিক অনুভূতির গভীর দাগ রেখে যায়, তা কিন্তু তাতে সান্ত্বনা লাভ করে না। ফলে ক্রোড়অঙ্ক পুরাণ ও ধর্মপ্রিয় পাঠকের চিত্তে ভক্তিরস সঞ্চার করতে পারে কিন্তু যথার্থ ট্র্যাজিক সংবেদনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

(ছ) 'ক্যাথারসিস' বলতে অ্যারিস্টটল সঠিকভাবে কী বুঝিয়েছিলেন তা নিয়ে যদিও জল্পনা কল্পনা এখনও শেষ হয়নি, এবং ক্রোড় অঙ্কে গঙ্গার কোলে জনাকে আদর খেতে দেখে আমাদের মনে যদিও আনন্দই হয়—তবু এ আনন্দ যে ক্যাথারসিস বা বিমোক্ষণজনিত আনন্দ নয়, তা একেবারে নিশ্চিত করে বলা যায়। এই জন্যই বলা যায় যে, দুটির প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ট্র্যাজিক সংবেদনও যেমন মানবিক, তার আনন্দও তেমনি মানবিক। জনাকে দেখে আমরা যে অভিভূতি হই তাঁর আচরণ ও পরিণতি আমরা যে অভিভূত হই, তাঁর আচরণ ও পরিণতি আমাদের মনে ট্র্যাজিক সংবেদন জাগায়, তার কারণ একেবারেই মানবিক। পক্ষান্তরে জনাকে জাহ্নবীর কোলে আদর খেতে দেখে যে আনন্দ আমাদের মনে জাগে তা আধ্যাত্মিক—সুতরাং ট্র্যাজেডি বা তার অন্তরঙ্গ লক্ষণ ক্যাথারসিসের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। সুতরাং উপযুক্ত ক্যাথারসিস ঘটার পেছনেও সবচেয়ে বড়ো বাধা ওই ক্রোড় অঙ্ক একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

কাজেই অ্যারিস্টটল-নির্দেশিত ট্র্যাজেডির লক্ষণ অনুযায়ী বিচার করলে আমাদের একথা বলতেই হবে ক্রোড় অঙ্ক বর্জিত হলে 'জনা' বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ট্র্যাজেডি হিসাবে গণ্য হতো, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ক্রোড় অংকটি তার ট্র্যাজিক সংবেদন যে কতকাংশে ক্ষুণ্ণ করেছে, একথাও বিশেষ কোন সংশয় না রেখেই বলা যায়।

ঠ. কমেডির সাধারণ পরিচয়

কমেডির সাধারণ পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, যে নাটকে চরিত্র এবং ঘটনাসজ্জা এরকম থাকে যাতে আমরা আনন্দ পেতে পারি এবং যার অন্তে মিলন থাকে, তাকেই কমেডি বলা যায়। কমেডির বাংলা পরিভাষা হিসাবে এই কারণেই 'মিলনান্ত নাটক' কথাটি বহুল প্রচলিত, যদিও এর 'হাস্যোদ্দীপক' এবং অন্যান্য দু-একটি পরিভাষাও দেখা যায়। শুধুমাত্র নাটকের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হলেও এটি যে অন্যান্য প্রকরণেও রচিত হতে পারে, সমালোচক অ্যাব্রামস্ সে কথা বলেছেন—"The term 'Comedy' is customarils applied only to dramas; it should be noted, how ever, that the comic form, so defined, also occurs, in prose fiction and narrative poetry."

কমেডি আনন্দ দেয় এবং ট্র্যাজেডি করুণ বেদনার সঞ্চার করে, অতএব প্রকৃতিতে এরা সম্পূর্ণ বিপরীত, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত, "কমেডি এবং ট্র্যাজেডি কেবল পীড়নের মাত্রাভেদ। কমেডিতে যতটুকু নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় তাহাতে আমাদের হাসি পায় এবং ট্র্যাজেডিতে যতদূর পর্যন্ত যায় তাহাতে আমাদের চোখের জল আসে।"...অসঙ্গতির তার অল্প অল্প চড়াইতে চড়াইতে বিস্ময় ক্রমে হাস্যে এবং হাস্য ক্রমে অশ্রুজলে পরিণত হইতে থাকে।"

এ বিষয়ে দার্শনিক হবস্-এর অভিমত, অপরের কোন দুর্বলতার সঙ্গে নিজের তুলনা করে যখন আমরা নিজেদের যোগ্যতর মনে করি তখনই ওই চরিত্রের প্রতি আমাদের হাস্যোদ্রেক হয়। ফিল্ডিং-এর মতে অযোগ্য মানুষের আস্ফালন এবং আত্মম্ভরিতাই কমেডির প্রাণ। মেরেডিথের মতে কমেডির হাস্যকে বলা যায় 'sword of commonsense'। এ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মতই শিরোধার্য, তিনি নিজেও ট্র্যাজেডি ও কমেডির পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেছেন "There is only a very fine line of distinction between great Comedy and Tragedy."

অবশ্য অ্যারিস্টটল তাঁর গ্রন্থে কমেডি নিয়ে কোন পৃথক অধ্যায় রচনা করেননি, ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য বোঝাতেই কমেডির প্রসঙ্গ এনেছেন। এই ভাবেই পোয়েটিক্সের পঞ্চম অধ্যায়ে তাঁর কমেডির সংজ্ঞা আমরা পেয়ে যাই—"As for Comedy, it is (as has been observed) an imitation of men worse than the average;

worse, however, not as regards any and every sort of fault, but only as regards one particular kind, the Ridiculous may be defined as a mistake or deformity not productive of pain or harm to others."

অ্যারিস্টটলের এই সংজ্ঞাতেই কমেডির বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে, প্লেটো তাঁর 'ফিলেবাস' গ্রন্থেও প্রায় এই ধরনের কথাই বলেছিলেন। অপরের দুর্দশা আমরা ট্র্যাজেডির মতো কমেডিতেও দেখি, কিন্তু সে দুর্দশা আমাদের মনে বেদনার উদ্রেক করে না, আনন্দ দেয়। পোয়েটিক্‌সের অন্যত্র অ্যারিস্টটলের আলোচনা স্মরণ রাখলে বলা যাবে, কমেডিতে চিত্রিত হয় আমাদের চেয়ে 'হীন' মানুষের চরিত্র—অবশ্য হীন বলতে অন্য কিছু নয়, কোন একটা হাস্যকর আচরণে তিনি হাসির খোরাক জোগান এবং কমেডি লেখক তাকেই ব্যবহার করেন, অনেক সময় একটু অতিরঞ্জনের সাহায্য নিয়েই।

কমেডির উদ্দেশ্য অবশ্যই মানুষকে হাস্যাস্পদ করে তোলা নয়, তবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী সে বিষয়েও সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেবলমাত্র নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করাও কমেডির উদ্দেশ্য হতে পারে, কারণ পৃথিবীতে তাও খুব সুলভ নয়। শেক্‌স্‌পীয়রের কমেডির আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক ডাওডেন তার এই বৈশিষ্ট্যই লক্ষ করে বলেছেন—"A Shakespearean comedy is a delightful story, conducted in some romantic region, by gracious and gallant persons thwarted or aided by the mirthful God, Circumstances, and arriving at a fortunate issue."

আবার সমালোচক গর্ডন কমেডির একটি বিরাট উদ্দেশ্য লক্ষ করে বলেছেন—"Comedy is critical, and its main use is to teach the world what ails it."

কমেডির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় গ্রীসের দেবতা ডায়োনিসাসের বসন্তকালীন উৎসব থেকে ট্র্যাজেডি এবং শীতকালীন উৎসব থেকে কমেডির উৎপত্তি ঘটেছে। অ্যারিস্টটলের মতে কমেডির কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। কবি আর্কন 'কমিক কোরাস'-কে গৌরব দান করেছিলেন, এথেনীয় লেখকদের মধ্যে ক্রেটিস এ বিষয়ে অগ্রসর হন। গ্রীক ভাষায় 'কমেডি' শব্দের অর্থ আমোদকারীদের গান। একে ভিত্তি করে ডোরীয়, গ্রীসের মোগরীয় এবং সিসিলির মেগারীয়-প্রত্যেকেই দাবী করেন তাঁরাই কমেডির জন্মদাতা। ইংরেজি সাহিত্যে ট্র্যাজেডি ও কমেডির উদ্ভব ঘটেছে যথাক্রমে মর‍্যালিটি ও ইণ্টারলুড থেকে। সংস্কৃত নাটকে 'কমেডি' নাম না থাকলেও হাস্যরসাত্মক নাটকের অভাব ছিল না। আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রের অষ্টাদশ অধ্যায়ে যে দশরূপকের কথা বলেছেন তার অন্যতম ছিল প্রহসন। এই শ্রেণীটিকে তিনি বলেছেন হাস্যরসাত্মক দৃশ্যকাব্য। অবশ্য প্রহসন না হয়েও উচ্চস্তরের কমেডি হিসাবে গণ্য হতে পারে,

এমন নাটক সংস্কৃতে অনেক লেখা হয়েছিল, যেমন ভাস-এর 'স্বপ্নবাসবদত্তা', কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' বা 'মালবিকাগ্নিমিত্র', শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' প্রভৃতি।

বাংলা নাটকের উৎপত্তির সময় প্রহসন ধরনের নাটকই বেশি দেখা যায়। সূচনা-পর্বে রামনারায়ণ তর্করত্ন এই ধরনের নাটকেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তবে কমেডি নাটকে সিদ্ধিলাভ করেন মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র। মধুসূদনের দুটি একাঙ্ক 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'; দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' বা 'জামাই বারিক' প্রথম শ্রেণীর কমেডির মধ্যে পড়তে পারে। পরবর্তীকালেও কমেডির অভাব ঘটেনি। অবশ্য ট্র্যাজেডির মধ্যে কমিক রিলিফ তৈরি করবার জন্য যেমন কিছু অবিস্মরণীয় চরিত্রের সৃষ্টি আমরা ইংরেজি সাহিত্যে দেখি, বাংলা সাহিত্যেও তার অভাব নেই। উল্লেখ করার মতো চরিত্র ধনদাস ও মদনিকা (কৃষ্ণকুমারী নাটক), বিদূষক (জনা) দিলদার (সাজাহান) প্রভৃতি।

কমেডির বিষয়বস্তু, প্রকৃতি, উপস্থাপন এবং রসনিষ্পত্তির বিচারে তার শ্রেণীবিভাগ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই এ বিষয়ে সমালোচক M.H. Abrams-এর A Glossary of Literary Terms গ্রন্থের বিভাগটিই আমরা গ্রহণ করছি। অবশ্য দৃষ্টান্ত হিসাবে বাংলা নাটকেরও উল্লেখ করা হবে। সেখানে বিভাগগুলি এই রকম—

(১) রোম্যাণ্টিক কমেডি ঃ

অ্যারিস্টটল যাকে বলতে চেয়েছেন বিশুদ্ধ কমেডি, তাকেই আমরা আখ্যা দিতে পারি রোম্যাণ্টিক কমেডি বা কাব্যধর্মী কমেডি। ইংরেজি সাহিত্যে এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারদের হাতেই রোম্যাণ্টিক কমেডির প্রতিষ্ঠা ঘটে। সাধারণত প্রেম ঘটিত এই কমেডিতে নায়িকারা সুন্দরী ও আদর্শ নারী হয়—অনেক সময় তারা পুরুষের ছদ্মবেশেও থাকে, যেমন শেক্স্পীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকের রোজালিণ্ড, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছদ্মবেশী' বা রবীন্দ্রনাথ মৈত্র 'মানময়ী গার্ল্স্ স্কুল'। অবশ্য রোম্যাণ্টিক বলেই যে নায়ক-নায়িকার মিলনের পথ একেবারে কুসুমাস্তীর্ণ থাকে তা নয়, অনেক বাধাবিপত্তি পেরিয়েই মিলন ঘটে নায়ক-নায়িকার। যেমনটি ঘটেছে প্রমথনাথ বিশীর 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটকে। তবে শেষ পর্যন্ত কৌতুককর ঘটনা এবং তার ক্রমান্বয়ে নাটকটি উপভোগ্য করে তোলার দিকেই নাট্যকারের দৃষ্টি থাকে, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'। অবলাকান্তর (অর্থাৎ কিনা শৈলবালা) প্রতি নির্মলার আকর্ষণ, নৃপবালার রুমাল ও নীরবালার গানের খাতা পেয়ে যথাক্রমে শ্রীশ ও বিপিনের প্রেমোন্মাদনা এবং সমস্ত কিছুর

ফলশ্রুতি চিরকুমার সভার সভ্যদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ। এই শ্রেণীর কমেডি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচক নরথ্রপ্ ফ্রাই বলেছেন আমাদের পুরাকাহিনী ও প্রাচীন রীতিনীতিরই প্রকাশ ঘটেছে এই ধরনের কমেডিতে এবং জীবনে দুঃখের মলিনতা কেটে গিয়ে সুপ্রভাত আসে—এই বিশ্বাসই তারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে।

(২) স্যাটায়ারিক কমেডি ঃ

অ্যারিস্টটল কমেডির কোন বিভাগ করেননি, কিন্তু তাঁর আলোচনাকে ভিত্তি করে ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য যে বিভাগ নির্দেশ করেছেন সেই অনুসারে এই সমাজ-ব্যঙ্গাত্মক কমেডিকে তিনি বলেছেন অবিশুদ্ধ কমেডি। সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে বা নৈতিকতা বর্জন করে সমাজবিরোধী আচরণ যারা করে, তাদের নিয়েই লঘু ভাবে একটু অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়ে এই রকম কমেডি গড়ে ওঠে। আসলে তাদের আচরণের অসংগতিকেই নাট্যকার ব্যবহার করেন, যেমন আমরা বেন জনসনের 'ভলপোন' বা 'দি অ্যালকেমিস্ট' নাটকে দেখতে পাই। এই দুটি নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অ্যাব্রামস্ যে সুন্দর মন্তব্য করেছেন তা এই রকম—the" greed and ingenuity of one or more highly intelligent but rascally swindlers, and the equal greed but stupid gulliblity of their victims, are made grotesquely ludicrous rather than highly amusing."

অবশ্য এই ধরনের ব্যঙ্গাত্মক কমেডি 'highly amusing' হয়ে ওঠবার দৃষ্টান্তও আমরা একেবারে পাই না এমন নয়। দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', অমৃতলাল বসুর 'কৃপণের ধন', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম' প্রভৃতি এর উদাহরণ। অনেকে এই ধরনের সামাজিক ব্যঙ্গকে দুভাগে বিভক্ত করতে চেয়েছেন—ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ ও সমষ্টিগত ব্যঙ্গ। তবে এই বিভাগ অনেক সময়ই ঠিক মতো করা সম্ভব নয়।

(৩) কমেডি অব ম্যানার্স ঃ

এই ধরনের কমেডিও ব্যঙ্গমূলক এবং সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটিই এর মুখ্য আকর্ষণ, তবে কমেডি অব ম্যানার্স বলতে সঠিক ভাবে আমরা যা বুঝি সেখানে আক্রান্ত হন সমাজের কিছু উচ্চস্তরের মানুষ এবং তাদের হৃদয়সম্পর্কহীন কিছু যান্ত্রিক আচরণ। এখানে বুদ্ধি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের ছটা বেশি থাকে, এটাও এই জাতীয় কমেডির এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

শাণিত সংলাপের বিনিময়ই এই কমেডির প্রাণ, যেমন দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকের আরম্ভ—

"নকু ॥ ওহে, অটল নাকি মদ ধরেচে ?

নিম ॥ পানায়, খায় না ।

নকু ॥ সুরাপান-নিবারণী সভা কচ্চে কি ?

নিম ॥ creating a concourse of hypocrites."

এই রকম কমেডিতে অবশ্য কিছু নির্বোধ চরিত্রও থাকে, যাদের আপাত-এলোমেলো সংলাপে সমাজের বিকৃত ব্যবস্থা অনাবৃত হয়ে পড়ে।

এই জাতীয় নাটকের সূত্রপাত ঘটে শেক্‌স্‌পীয়রের হাতে। তাঁর 'লাভ্‌স্‌ লেবার লস্ট' এবং 'মাচ এ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং' এই রকম কমেডির দৃষ্টান্ত বলতে পারি। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে যাকে রেস্টোরেশন যুগ বলা হয়, সেই সময় এর অনেক উন্নতি ঘটে। এর জনপ্রিয়তা কমে আসে উনবিংশ শতকে, কিন্তু এই শতাব্দীর শেষের দিক থেকে আবার তা জনপ্রিয় হতে থাকে প্রধানত এ. ডাবলু. পিনেরো এবং অস্কার ওয়াইল্ডের হাতে। এরপর এই জাতীয় নাটকের চরমোৎকর্ষ দেখতে পাই জর্জ বার্নাড শ-এর হাতে।

ইংরেজি সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কমেডি অব ম্যানার্স নাটক বহু আছে যেমন— কন্‌গ্রীভের 'দি ওয়ে অব্ দি ওয়র্লড', উইচার্লি'র 'দি কান্‌ট্রি ওয়াইফ', অলিভার গোল্ডস্মিথের 'শী স্টুপ্‌স্‌ টু কংকার', রিচার্ড শেরিডানের 'দি রাইভ্যাল্‌স্‌' ও 'এ স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল', জর্জ বার্নার্ড শ-র 'আর্স অ্যান্ড দি ম্যান', 'মিসেস ওয়ারেন্‌স্‌ প্রোফেশন' প্রভৃতি। বাংলায় কমেডি অব ম্যানার্স খুব ভালো নেই, যা আছে তার মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাঙ্ক 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলায়তন', অমৃতলাল বসুর 'কালাপানি' বা 'ব্যাপিকা বিদায়' উল্লেখযোগ্য।

(৪) **ফার্স বা প্রহসন :**

প্রহসনকে কেউ কেউ নাটকেরই অন্যতম শ্রেণী হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু অ্যাব্রাম্‌স্‌ যেহেতু তাকে কমেডিরই একটি বিভাগ বলে মনে করেন, আমরা সেই ভাবেই তাকে বিন্যস্ত করলাম। ফার্স বলতে বোঝায় অত্যন্ত লঘু কল্পনাসিদ্ধ, অতিরঞ্জিত এক ধরনের হাস্যোচ্ছল নাটক। সহজ সরল এই রকম কমেডিতে হাস্যময়তা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত। আসলে, এখানে বুদ্ধির খেলা বিশেষ দেখা যায় না এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্য দেখাবার অবকাশও কম বলে একে একটু নীচু ধরনের কমেডি বলে মনে হতে পারে, নইলে অ্যাব্রাম্‌স্‌ এখানে 'বেলি লাফ্‌স্‌' (অর্থাৎ কিনা কাতাকুতু দিয়ে হাসানোর ব্যাপার) আছে বলে মন্তব্য করতেন না। অপর এক ইংরেজ সমালোচক

একে বলেছেন 'the type of drama stuffed with low humour and extravagant wit'। সংস্কৃত আলংকরিকও প্রহসন সম্বন্ধে বলেন—'হাস্যোদ্দীপক কাব্যন্তু প্রহসনমিতি স্মৃতম্।'

কোন কোন সমালোচক ফার্সে অত্যন্ত পুরনো ধরনের কমেডি মনে করে অ্যারিস্টোফেনসের 'দি ফ্রগস্'কেও এর অন্তর্ভুক্ত করতে চান। কিন্তু মধ্যযুগের মিরাক্‌ল্ প্লে-র মধ্যে যে ফার্সের উপাদান ছিল একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই—দৃষ্টান্ত, ওয়েকফিল্ড প্লে-র অন্তর্গত 'নোয়া' এবং 'সেকেণ্ড শেফার্ডস্ প্লে'। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটককে প্রহসনের স্তরে নামানো ঠিক হবে না, তবে তাঁর 'দি টেমিং অব দি শ্রু' কিম্বা 'দি মেরি ওয়াইভস্ অব উইন্‌জর'-এ যেসব 'নক্-অ্যাবাউট' দৃশ্যগুলি আছে, প্রকৃতিতে তারা প্রহসনই। এছাড়া ফরাসী নাটকের মধ্যে মলেয়রের নাটক 'লে মিসানথ্রোপ্' ইংরেজি নাটকের মধ্যে রিচার্ড শেরিডানের 'দি স্কিমিং লেফটেন্যান্ট,' আমেরিকান নাটক হিসাবে ব্র্যান্‌ডন টমাসের 'চার্লিজ আণ্ট', বাংলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীক বাবু', দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কি অবতার' বা অমৃতলাল বসুর 'তাজ্জব ব্যাপার'কে প্রহসনের কিছু দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অ্যাব্রামস্ কমেডির পঞ্চম বিভাগটির নামকরণ করেছেন 'হাই কমেডি', কিন্তু এভাবে উচ্চস্তরের কমেডি ও নিম্নস্তরের কমেডির (লো কমেডি) বিভাগ খুব যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এ বিভাগ মূলত কমেডির সৃষ্টিসামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। আসলে জর্জ মেরেডিথের 'দি আইডিয়া অব কমেডি' গ্রন্থটিই বোধ হয় এই ধরনের বিভাগের প্রতি তাঁকে উৎসাহিত করেছে। বিভিন্ন সমালোচক আরো নানা ধরনের বিভাগের কথা বলেছেন, যেমন—কৃত্রিম কমেডি, যথা প্রমথনাথ বিশীর 'মৌচাকে ঢিল', চক্রান্তমূলক কমেডি বা 'কমেডি অব ইন্‌ট্রিগ্ (ড্রাইডেনের 'দি স্প্যানিশ ফ্রায়ার) চরিত্রনির্ভর কমেডি, (বেন জনসনের 'ভলপোন'), সংলাপমুখ্য কমেডি (শেক্‌স্‌পীয়রের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট'), ভাবপ্রবণ কমেডি (যথা ব্যারির 'দি অ্যাডামিরেব্‌ল্ ক্রিচ্‌টন'), বাস্তব কমেডি (দৃষ্টান্ত, মলিয়রের 'দি মিড্‌ল্‌ক্লাস জেণ্টলম্যান'), উদ্ভট কমেডি (যেমন ব্রিডির 'টোবিয়াস অ্যাণ্ড দি অ্যাঞ্জেল'), স্ল্যাপস্টিক কমেডি (লরেল-হার্ডির প্রচুর ছবি যার দৃষ্টান্ত) প্রভৃতি।

● একটি বাংলা কমেডির বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' ঠিক পূর্ণাঙ্গ নাটক নয়, তিনটি দৃশ্যে সংহত একটি প্রহসন ধরনের কমেডি বলা যেতে পারে। অবশ্য দৃশ্য অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের নাটককে পূর্ণাঙ্গ বা নক্‌সাজাতীয় কিছু আখ্যা দেওয়া একেবারে অসম্ভব, কারণ

তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটক 'মালিনী' মাত্র চারিটি দৃশ্যে সম্পূর্ণ এবং 'মুক্তধারা' নাটকে দৃশ্য কেবল একটি সেটি হল পথ। বৈকুণ্ঠের খাতা কী ধরনের কমেডি এবং কমেডির বৈশিষ্ট্য এতে কী পরিমাণ রক্ষিত হয়েছে তা আলোচনা করার আগে অতি সংক্ষেপে এর কাহিনীটি মনে করে নেওয়া যাক।

ঘটনাস্থল বৈকুণ্ঠ ও অবিনাশ দুই ভায়ের সংসার। বিপত্নীক বৈকুণ্ঠর বিধবা কন্যাও আছে এ সংসারে অবিনাশ অবশ্য অবিবাহিত—তাদের দেখাশোনা করে বহুদিনের ভৃত্য ঈশ্বর। অবস্থা এককালে ভালো ছিল নিশ্চয়ই, তাই বৈকুণ্ঠকে কিছুই করতে হয় না, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও বই লেখার বাতিক নিয়েই তিনি সময় কাটিয়ে যাচ্ছেন। অবিনাশ ভালই চাকরি করে। বৈকুণ্ঠের এই বাতিকের সূত্র ধরেই তাঁর কাঁধে চেপে বসে অবিনাশের একদা-সহপাঠী কেদার এবং কেদারের সহচর তিনকড়ি। কেদার উপার্জনহীন বলে এ বাড়িতে পাকাপাকি ভাবে বসবাসের জন্য নিজের শ্যালিকার সঙ্গে অবিনাশের বিবাহের বন্দোবস্ত করে এবং সে বিবাহ সুসম্পন্নও হয়ে যায়। এরপর অবিনাশের শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সংখ্যা বাড়তে থাকে এ বাড়িতে, একেবারে বৈকুণ্ঠের ঘরেই ঘাঁটি গেড়ে উৎপাত শুরু করেন বিপিনবাবু নামে অবিনাশের এক খুড়শ্বশুর। বাধ্য হয়ে বৈকুণ্ঠ সমস্ত গুছিয়ে টুছিয়ে চাকর ঈশ্বর এবং মেয়ে নীরুকে নিয়ে যখন বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত, তখন অবিনাশ সব জেনে একেবারে ফেটে পড়ে। বাড়ি থেকে সমস্ত আবর্জনা বিদায় করে বাড়িকে আবার স্বাভাবিক করে সে।

নাটকটিকে অ্যারিস্টলের সংজ্ঞার আলোকে বিচার করলে বলতে হবে, এখানে কমেডির প্রধান উপাদান যে দুটি চরিত্র, বৈকুণ্ঠ এবং কেদার—তারা আর যাই হোক স্বাভাবিক চরিত্র নয়। কেদারকে অনায়াসেই বলা চলতে পারে, সাধারণের চেয়ে হীন চরিত্র কিন্তু বৈকুণ্ঠ তা নন। খুব স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে কেদার একটি ভণ্ড প্রতারক, মানুষকে ঠকিয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করাই তার কাজ—এই ভাবেই যে সে দীর্ঘকাল চালিয়ে আসছে, তিনকড়ির কথা শুনে তা বুঝতে পারা যায়। বৈকুণ্ঠ মানুষটিকে 'অ্যাভারেজ' তো বটেই, তার চেয়ে ওপরেরও ধরা যেতো, কিন্তু তিনি তাঁর আচরণে যে 'রিডিকুইলাস' হয়ে পড়েছেন তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের বাতিক তাঁর এমনই তীব্র যে কেদার চীনেম্যানের কাছ থেকে তার পুরণো জুতোর হিসেবের খাতাও তাঁকে বহুমূল্য চীনা সংগীত-পুস্তক বলে গছিয়ে দিতে পারে। এই বাতিককেই বলা যেতে পারে এমন অসংগতি যা অপরের ক্ষতি করে না বা বেদনার কারণ হয়েও দাঁড়ায় না। এই বাতিককেই কিছু অতিরঞ্জিত করে দেখিয়েছেন নাট্যকার। নাটকে অবিনাশের একটি বাতিকের প্রসঙ্গও আছে—'নিলেম থেকে বিলিতি গাছ কেনা', কিন্তু সেটা নাটকে আমরা দেখতে পাই না।

উত্তম কমেডি এবং ট্র্যাজেডির মধ্যে তফাৎটা যে শুধু মাত্রার, সে কথা এই ছোট

নাটকে খুব স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়। কেদারের জীবনে প্রতারণা ছাড়া কিছুই নেই এখন, কিন্তু সে যখন বলে "যখন ছেলেবেলায় কলেজে পড়তুম তখন ওর নাম কী, খুব উচ্চ মাচার উপরেই আশালতা চড়িয়েছিলুম"—তখন তার চরিত্রের ট্র্যাজিক দিকটি আভাসিত হয়ে ওঠে। এই আভাস স্পষ্টতা পেয়েছে তিনকড়ির চরিত্রে। অবিনাশ যখন তাকে বলে 'আংটির চেয়ে কথার দাম বেশি' তখন সে সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করে—"তা হলে আজ আর তিনকড়িকে হাহাকার করে বেড়াতে হত না।" বোঝা যায় তিনকড়ির জীবনেও এক ট্র্যাজিক হাহাকার লুকিয়ে আছে, তা নইলে তাকে বলতে হয় না—"শিশুকাল থেকে আমিও কারও জন্যে ভাবিনি, আমার জন্যেও কেউ ভাবেনি, ওটা আমার আর অভ্যাস হলই না।"

অনেক রকম টানা-পোড়েনের মধ্য দিয়ে অনেক সময় ট্র্যাজেডি হবার লক্ষণ দেখিয়েও, সমাপ্তিতে নাটক কমেডি হয়ে যেতে পারে—অনেক ভালো কমেডিতেই তা হয়েছে। 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকেও সেই টানা-পোড়েন আমরা দেখেছি। কেদারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার পর বাড়ি ভোগদখলের জন্য সে অবিনাশের শ্বশুরালয়ের বিস্তর মানুষজনকে এনে বৈকুণ্ঠকে উৎখাত করবার সমস্ত ব্যবস্থাই করে ফেলেছিল। এদের সম্মিলিত আক্রমণে অস্থির হয়ে বৈকুণ্ঠ বাড়ি ছেড়ে সবার আয়োজনও করতে আরম্ভ করেছিলেন। যদি বৈকুণ্ঠ সত্যিই সত্যিই গৃহত্যাগ করতেন, অবিনাশের প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রী নীরু এবং ভৃত্য ঈশান যদি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতো, অবিনাশের জীবনে তার চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কিছুই হতে পারতো না। কিন্তু তা হয়নি, সেই চরম মুহূর্ত থেকে নাটক ফিরে এসেছে কমেডির দিকে—অবিনাশের দ্রুত হস্তক্ষেপে।

'বৈকুণ্ঠের খাতা' ঠিক কোন্ শ্রেণীর কমেডি তা নিরূপণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। রোম্যান্টিক কমেডির বেশ কিছু লক্ষণ এ নাটকে আছে, অবশ্য যদি অবিনাশের সঙ্গে কেদারের শ্যালিকার বিবাহঘটিত ব্যাপারটি আদৌ প্রাধান্য পায়। সম্পূর্ণ প্রেম-পরিণয় গোছের নাটকের দৃষ্টান্ত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'-র কথাই আমাদের মনে পড়বে, তবে অনেক ঝামেলার পর বৈকুণ্ঠের জীবনে শান্তি এসেছে এবং অন্যায় ও অধর্মের পর ধর্মের প্রকাশ ঘটেছে—এই উপসংহার মনে রাখলে একে রোম্যান্টিক কমেডির কিছুটা সদৃশ বলে আমরা মনে করতে পারি।

আবার অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে কমেডি অব ম্যানার্স হিসাবেও আমরা একে গ্রহণ করতে পারি। শাণিত সংলাপের বিনিময় এই ধরনের কমেডির প্রাণ, যাকে 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এরও প্রাণ বলা যায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই সংলাপের এই বৈশিষ্ট্য কমবেশি আছে। ঠিক সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটিও অবশ্য এই নাটকের বিষয় নয়, চরিত্রের একটি উৎকেন্দ্রিক আচরণ বা বৈশিষ্ট্যকেই বড়ো করে দেখিয়ে এই নাটকের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সাধারণ দৃষ্টিতে নাটকটিকে ফার্স বা প্রহসনের মতো মনে হতে পারে, এর

আকার এবং সংক্ষিপ্তীকরণ সেজন্য দায়ী হতে পারে, কিন্তু একটু ভালো করে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে একে প্রহসন বলা কোন মতেই সম্ভব নয়। প্রহসন একটু মোটা দাগের ব্যাপার, অথচ বুদ্ধির দীপ্তি ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এর সর্বত্র এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে যে নাটক হিসাবে একে বেশ উচ্চস্তরের বলতে হয়। বিশেষত, ফার্সে কাহিনী নিয়ে একরকমের যে অতিরঞ্জন থাকে, এখানে তার বিপরীত ব্যাপারই ঘটেছে। একটি বিরাট কাহিনী রবীন্দ্রনাথ সংহত করে রেখেছেন মাত্র তিনটি দৃশ্যে। অবিনাশের কাছে কেদারের বিবাহের প্রস্তাব পাড়া, অবিনাশের প্রণয়বৃত্তান্ত, পরিণয়োত্তর জীবনের দুর্বিপাক ইত্যাদি ঘটনা অনায়াসে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের পাঁচটি অঙ্কের বিষয় হতে পারতো। যে সংযম এবং সংহতি নাট্যকার এখানে দেখিয়েছেন তাতে এটি একটি উচ্চস্তরের কমেডি হয়ে উঠেছে। এতে রোম্যাণ্টিক কমেডি করে তোলার মত বিস্তার তিনি ঘটাননি বলে, সবদিক চিন্তা করে, কমেডি অব ম্যানার্স আখ্যায় একে ভূষিত করলেই ভালো হয় বলে আমরা মনে করি।

● ট্র্যাজি-কমেডি

প্রথাগত ট্র্যাজেডি এবং কমেডির সংমিশ্রণে নাটকের এই ধারাটি দেখা যায় এলিজাবেথীয় যুগে। উচ্চস্তর ও নিম্নস্তর, উভয় স্তরের মানুষকে নিয়েই ট্র্যাজি-কমেডি লেখা হতে পারে। সাধারণত কোন গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়েই ট্র্যাজি-কমেডি লেখা হয়। প্রতি মুহূর্তেই ঘটনাধারা থেকে মনে হয় এর পরিণতি হতে চলেছে বিষাদময়, কিন্তু আকস্মিকভাবে এমন কোন ঘটনা ঘটে যায় যার জন্য এর পরিণতি বিষাদময় না হয়ে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে।

শেকস্‌পীয়রের 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস' ট্র্যাজি-কমেডির একটি ভালো উদাহরণ। কারণ এখানে দুই স্তরের মানুষের সাক্ষাতই আমরা পাই—নাটকে যেমন ল্যান্সলট গোবোর মতো চরিত্র আছে, তেমনি শাইলকের মতো নৃশংস কসাইও আছে। আন্তোনিওর অদৃষ্টে কী ঘটতে চলেছে শেষ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারি না, ভালোর চেয়ে মন্দ হবার আশঙ্কাই যখন প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে তখনই তার ভাগ্য-পরিবর্তন ঘটে।

ঙ. ঐতিহাসিক নাটক

নাটকের বিষয়ভিত্তিক বিভাগের আলোচনায় এবার আমরা প্রবেশ করতে পারি। এই জাতীয় বিভাগের মধ্যে প্রধান ঐতিহাসিক নাটক, পৌরাণিক নাটক এবং সামাজিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটক দিয়েই আলোচনার সূচনা হতে পারে।

খুব স্থূলভাবে বলতে গেলে যে নাটকের বিষয়বস্তু ইতিহাস থেকে সংগৃহীত, তাকে বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক নাটক। এক্ষেত্রে কয়েকটি কথা মনে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। প্রথমত, বিষয়বস্তু যেখান থেকেই সংগ্রহ করা হোক, সাহিত্যকৃতিকে আগে নাটক হতে হবে। নাটক হয়ে ওঠার শর্ত আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করেছি, কেবল উক্তি-প্রত্যুক্তি-বন্ধে রচিত হলেই তা নাটক হয় না—জীবনের দ্বন্দময় রূপ সেখানে পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজন। যে দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ তা যদি ইতিহাসের আশ্রিত কোন কাহিনীতে পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু ইতিহাস থেকে যে-কোন কাহিনী আহরণ করলে তা নিয়ে নাটক রচনা করা যায় না—কারণ তা নাটকও হয় না, ঐতিহাসিক নাটকও হয় না। 'ঐতিহাসিক' শব্দটি নাটকের বিশেষণ এটি মনে রাখতে হবে। ইতিহাসের কোন কাহিনীতে উপযুক্ত নাটকীয়তার সন্ধান পেলে তাকে সমর্থ নাট্যকার নিশ্চয়ই গ্রহণ করতে পারেন, যেমন করেছেন শেকস্‌পীয়র জুলিয়াস সীজার বা ক্লিওপেট্রার জীবনের দ্বন্দ্বময়তা নিয়ে, অথবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্রাট সাজাহানের পিতৃসত্তা ও রাজসত্তার দ্বন্দ্ব নিয়ে।

দ্বিতীয় কথা ইতিহাসের সত্যতা ও ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে। দুটি ব্যাপার এখানে মৌলিক সত্যের মতো মনে রাখা প্রয়োজন—ইতিহাসের পাঠ নেবার জন্য যেমন কেউ ঐতিহাসিক নাটক পড়েন না তেমনি ইতিহাসের ধারণাকে বিকৃত করার অধিকারও কোন সাহিত্যিকের নেই। সাহিত্যিক যেহেতু ঐতিহাসিক নন, ইতিহাসের খুঁটিনাটি তথ্য সম্বন্ধে তিনি অবহিত থাকবেন এটা আমরা আশা করতে পারি না—যেমন মুঘল আমলের কোন একটি ঘটনা বা রাজপুত জাতির ইতিহাসে সংগঠিত কোন ঘটনার প্রত্যেকটি অনুপুঙ্খ লেখক বিবৃতি করবেন এটা আমাদের প্রত্যাশা হতে পারে না, কারণ তিনি ইতিহাসের বিবরণ দিতে বসেন নি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে কোন চরিত্র সম্বন্ধে যে ধারণা গড়ে তুলেছেন তা বিকৃত করার অধিকারও নাট্যকারের নেই। জুলিয়াস সীজার চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা ঐতিহাসিকগণ গড়ে তুলেছেন, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক পড়ে যদি সে ধারণা ভেঙে যায় তাহলে তার জন্য দায়ী থাকবেন নাট্যকার—তিনি স্বস্পষ্ট চরিত্রের প্রতীতি নির্মাণ করতে পারেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে পাওয়া চরিত্রকে পালটে দিতে পারেন না।

তৃতীয়ত, ইতিহাস থেকে নাটক বা উপন্যাসের তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে তার প্রকৃতি কী রকম হবে, অর্থাৎ ইতিহাস ও কাব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক ঠিক কী, এ বিষয়ে অ্যারিস্টটল সংক্ষেপে হলেও কিছু কিছু মন্তব্য করেছেন তাঁর 'পোয়েটিক্‌স্‌' গ্রন্থে। সংক্ষিপ্ত হলেও মন্তব্যগুলি অতি মূল্যবান, এ বিষয়ে তাঁর প্রধান বক্তব্য উদ্ধার করছি এই গ্রন্থের নবম অধ্যায়ের অংশবিশেষের ইংরেজি অনুবাদ থেকে (অনুবাদক বাইওয়াটার)—"The poets fanction is to describe, not the thing that has happened, but a kind of thing that might happen i.e what is

possible as being probable or necessary...one describes the thing that has been, and the other a kind of thing that might be···Hence poetry is something more philosophic and of graver import than history, since its statements are of the nature rather of universals, whereas those of history are singulars.

মনে রাখবার মতো কথা হচ্ছে যা ঘটে তার বর্ণনা দেওয়া নাট্যকার বা ঔপন্যাসিকের কাজ নয়, সেটা করে ইতিহাস—সাহিত্যিক সৃষ্টি করেন সম্ভাব্যতার সূত্র মেনে যা ঘটতে পারে তাই। সুতরাং ইতিহাস ব্যক্তিগত মানুষের বিশেষ কালের কাহিনী, সাহিত্য সাধারণভাবেই মানুষের সর্বকালের কাহিনী। সেই জন্যই ইতিহাস অপেক্ষা সাহিত্য অনেক উচ্চস্তরের।

সম্ভবত এই মহত্ত্বের ধারণা মনে রেখেই ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করে কোন কোন নাট্যকার একটি মহৎ ভাব প্রচার করতে চান, অবশ্য সে চরিত্র ইতিহাসানুগ না হতে পারে, এমনকি ঐতিহাসিক চরিত্রও না হওয়া সম্ভব। যেমন 'মেবার পতন' নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যক্তিপ্রেম, স্বদেশ প্রেম এবং বিশ্বপ্রেম পরিস্ফুট করবার জন্য যথাক্রমে বেছে নিয়েছিলেন কল্যাণী, সত্যবতী এবং মানসী নামক তিনটি নারী চরিত্রকে—সম্ভবত যাদের প্রত্যেকটিই অনৈতিহাসিক। এদের মধ্যেও আবার জয়যুক্ত হয়েছিলেন মানসী তাঁর বিশ্বপ্রেমের বাণী নিয়ে। কিন্তু ঐতিহাসিক ধারণা থেকে বিশেষ বিচ্যুত না হওয়ায় অনেকেই 'মেবার পতন'-কে মোটামুটিভাবে একটি সমর্থ সৃষ্টির সম্মান দিয়ে থাকেন।

আসলে এই ধরনের ব্যাপার মূলগতভাবে নাট্যধারণার বিরোধী, কারণ নাট্যকার কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেন এবং তাঁর বক্তব্য বস্তুগত ভাবে এই সব চরিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন—নিজের বক্তব্য তিনি চরিত্রের ওপর আরোপ করতে চাইছেন, এ ধারণা দর্শকের মনে সৃষ্টি হলে নাটকের শিল্পমূল্য কমে যায়। আমাদের উল্লিখিত 'মেবার পতন' নাটকে মানসী চরিত্র এতো বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চয়ই হয়নি যে বিশ্বপ্রেমের দুরূহ ও সুমহান আদর্শ তার একান্ত নিজস্ব বলে আমাদের মনে হবে। যেমন ধরা যাক জর্জ বার্ণার্ড শ-এর 'সেন্ট জোয়ান' নাটক—সেখানেও চরিত্রকে ছাপিয়ে উঠেছে নাট্যকারের নিজের বক্তব্য। অথচ এই দুটি নাটককেই আমরা প্রথম শ্রেণীর নাটকের মর্যাদা দিই। সে কারণে মনে হয়, ইতিহাসকে বিকৃত না করে কুশলী নাট্যকার ঐতিহাসিক নাট্যকার তাঁর নিজের মতবাদ প্রচার করার সুযোগও কোথাও কোথাও পেয়ে যান।

● একটি ঐতিহাসিক নাটকের বিশ্লেষণ

বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের সিদ্ধি ও সার্থকতা কতখানি তা সম্যক্‌ভাবে জানবার জন্য আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে গৃহীত

নাটকটিকে অবলম্বন করতে পারি। নাটকের নাম 'কৃষ্ণকুমারী নাটক', রচয়িতা মধুসূদন দত্ত। এর আগে যদিও দুটি পৌরাণিক নাটক তিনি রচনা করেছেন—ভারতীয় পুরাণ অবলম্বনে লিখেছেন 'শর্মিষ্ঠা' এবং গ্রীক পুরাণ অবলম্বনে 'পদ্মাবতী,' কিন্তু ইতিহাসের কাহিনী আশ্রয় করে তাঁর প্রথম এবং শেষ সম্পূর্ণ নাটক একটিই, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'। ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনার আলোকে নাটকটির গুরুত্ব পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, অর্থাৎ পঞ্চাঙ্ক সমন্বিত নাটক। এর প্রথমাঙ্কে আমরা পাই দুটি গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কে তিনটি, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি, চতুর্থ অঙ্কে তিনটি এবং পঞ্চম অঙ্কে তিনটি গর্ভাঙ্ক। এই নাটকের মূল বিষয় সংগ্রহ করা হয়েছে টডের রাজস্থান-বিষয়ক গ্রন্থ থেকে, মূল চরিত্র জগৎ সিংহ, ভীম সিংহ, কৃষ্ণকুমারী প্রভৃতিও ইতিহাস থেকেই সংগৃহীত, যদিও কিছু কল্পিত চরিত্রও এখানে আছে। নাটকের প্রাণশক্তি যে দ্বন্দ্বময়তা, এখানে তাকেও সবিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে। উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণের আশায় জয়পুরের রাজা জগৎ সিংহ এবং মরুদেশের রাজা মানসিংহের মধ্যে সংগ্রামের সম্ভাবনা এবং পরিণতিতে কৃষ্ণকুমারী করুণ আত্মহনন এই নাটকের উপজীব্য। সুতরাং নাটকের প্রার্থিত দ্বন্দ্ব এখানে আগাগোড়াই রক্ষিত হয়েছে।

দ্বিতীয়, নাটকে ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠা যেটুকু রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন তা এখানে রক্ষিত হয়েছে বলেই আমাদের মনে হয়। জয়পুরের রাজার চরিত্রদোষ এবং লাম্পট্যবৃত্তির সমর্থন ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়, কৃষ্ণকুমারীর করুণ অপমৃত্যুও ইতিহাসেরই সত্য—যদিও মৃত্যুর কারণ ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে। ইতিহাসের ধারণা যেখানে কিছুটা লঙ্ঘিত হয়েছে সেটি হল ভীমসিংহের চরিত্র। এই চরিত্রটিকে আমরা প্রথম থেকেই নির্জীব, নিরানন্দ এবং হতোদ্যম হিসাবে চিত্রিত দেখি। রাজপুত জাতির অনেক রাজাই তখন অন্তর্কলহে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু রাণা ভীমসিংহের এই রকম কাপুরুষোচিত ব্যবহার ইতিহাস সমর্থন করবে বলে মনে হয় না। এছাড়াও তথ্যের কিছু ছোটখাট বিচ্যুতি এ নাটকে আছে, তবে নাট্যকার যেহেতু ঐতিহাসিক নন, ইতিহাস জ্ঞানের পূর্ণতা নেই বলে এ ব্যাপারে কোন শৈল্পিক অভিযোগ করা যায় না। মোটামুটিভাবে ঐতিহাসিক ধারণা মধুসূদন বজায় রাখতে পেরেছেন বলেই আমরা মনে করি।

অসুবিধা যদি কিছু ঘটে থাকে তবে তা ঘটেছে অনৈতিহাসিক চরিত্র নিয়ে: ঐতিহাসিক নাটকে কল্পিত চরিত্র নিশ্চয়ই আসতে পারে, নাট্যকার তাদের সৃষ্টি করেন ইতিহাসের ঘটনাগত অসংগতি দূর করবার জন্য বা ঘটনার মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করবার জন্য। এখানেও তার প্রয়োজন ছিল। মানসিংহ এবং জগৎসিংহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইতিহাস সমর্থন করলেও, তাদের মধ্যে শত্রুতার কোন উপলক্ষ ইতিহাস আমাদের দেয় না। মধুসূদন ধনদাস ও মদনিকা নামে সম্পূর্ণ

দুটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এই দ্বন্দ্ব ঘনীভূত করবার জন্য। কৃষ্ণকুমারী সম্পর্কে প্রায় কিছুই যিনি জানতেন না, সেই জগৎ সিংহকে তার পাণিপ্রার্থী করে তুলবার কৃতিত্ব যেমন ধনদাসের, তেমনি আর এক রাজপুত রাজা মানসিংহকে সুকৌশলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টেনে এনেছে মদনিকা। একদিকে নাটকের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তারা পালন করেছে, অন্যদিকে লঘু কৌতুক পরিবেষণ করায় চরিত্র হিসাবেও দর্শকের কাছে তারা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। নাটককে জনপ্রিয় করবার প্রলোভন মধুসূদন সামলাতে পারেননি বলেই এই সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক চরিত্রদুটিকে কেবল প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনি সংযত হতে পারেননি। মাত্রাজ্ঞানের অভাবের জন্যই অনৈতিহাসিক এই চরিত্রদুটি ঐতিহাসিক চরিত্রদেরও অতিক্রম করে গিয়েছে এবং কার্যত কিছুটা শিল্পমূল্যও ক্ষুণ্ন করেছে। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি এরকম মন্তব্যও সমালোচকগণ করে থাকেন বলেই বিশেষ করে এ কথা বলা। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে এই পরিণতিকেন্দ্রিক dramatic irony আমরা পাই কৃষ্ণকুমারীর পরিহাসে—"পারিজাত ফুল লয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে যদুপতির বিবাদ ত আরম্ভ হলো। এখন দেখি কে জেতেন।"

এরপর তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে পাই পরিণতির সুস্পষ্ট আভাস, যখন রাজপুত-কুললক্ষ্মী পদ্মিনী কৃষ্ণকুমারীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁরই মতো আত্মত্যাগের পথ অনুসরণ করতে বলেছেন, কারণ "যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপন প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তার আদরের সীমা নাই!" কৃষ্ণকুমারীর আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় যখন সচেতন দর্শকের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকার কথা তখন সমগ্র চতুর্থ অঙ্ক জুড়ে ধনদাস ও মদনিকার কার্যকলাপ এবং মদনিকার চাতুর্যে ধনদাসের শাস্তিবিধান একাধারে নাটকের রসনিষ্পত্তিতে ব্যাঘাত ঘটায় এবং রসজ্ঞ দর্শকের বিরক্তির কারণ হয়। নাটকের ঘটনাগত ঐক্য বা 'unity of action'-ও এতে ব্যাহত হয়। আমাদের আরো আপত্তি, দুটি কাল্পনিক চরিত্র ঐতিহাসিক নাটকের এই বিপত্তি ঘটিয়েছে বলে।

তৃতীয়ত, ইতিহাস ও কাব্যের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে যে সম্ভাব্যতা ও সর্বজনীনতার কথা অ্যারিস্টটল বলেছেন, সেই সূত্রে ব্যাখ্যা করতে গেলে মধুসূদনের প্রশংসাই আমাদের করতে হবে। ইতিহাসের যে তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন তাতে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব নিশ্চয়ই ছিল। ধনদাসের ধনস্পৃহা এবং মদনিকার প্রতিশোধস্পৃহার অবতারণা করে নাটকের সম্ভাব্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা তিনি অনেক বৃদ্ধি করতে পেরেছেন। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা চলে যে, একটি বিশেষ কাহিনীকে কিছুটা শাশ্বত সত্যের মর্যাদা তিনি দিতে পেরেছেন এই কারণেই যে, রাজপুত জাতির আত্মক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং রাজপুত-রমণীর আত্মত্যাগের প্রায় সাধারণ একটি সত্য এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। সুতরাং ত্রুটিমুক্ত না হলেও

'কৃষ্ণকুমারী নাটক'-কে একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটকের স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না।

চ. পৌরাণিক নাটক

নাটকের বিষয়ভিত্তিক বিভাগের অন্যতম, এবং সম্ভবত প্রধানতম, বিভাগ পৌরাণিক নাটক। অন্তত বাংলা নাটক সম্বন্ধে এ কথা একশো ভাগ প্রযোজ্য, কারণ পৌরাণিক নাটক দিয়েই বাংলা নাটকের জয়যাত্রা শুরু এবং এই ধরনের নাটকেই আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য যাত্রাপালার সঙ্গে তার পার্থক্যের সূত্রগুলিও স্পষ্ট। পৌরাণিক নাটক আমাদের কাছে যে সবচেয়ে জনপ্রিয় একথাও স্বীকার করতে হবে। পুরাণ মানেই ভক্তিমূলক বিষয় এবং ভক্তিমূলক কিছু পেলে বাঙালীর আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ওঠে যে, তা আজকের দিনেও ধর্মমূলক কোন যাত্রাপালা—এমনকি ছায়াছবি এলেও বুঝতে পারা যায়। গিরিশচন্দ্র ঠিকই বলেছিলেন, "হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।"

ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে লেবেডফের আকস্মিক এক নাটকীয় প্রয়াস বাদ দিলে প্রথম বাংলা পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন'কে পৌরাণিক নাটকই বলতে হবে। প্রায় একই সময়ে, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দেই লেখা হয় যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস'—যদিও তাকে পুরাণকথা বলা হবে না রূপকথা, এ নিয়ে সংশয় আছে। এই দুটি নাটকের অব্যবহিত পরেই আমরা পাই মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা', মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক', রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রুক্মিণী-হরণ' প্রভৃতি। অবশ্য বাংলা পৌরাণিক নাটকের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এখনও পর্যন্ত বলা হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষকে।

বাংলা নাটকের উদ্ভব যে যাত্রাপালা থেকে হয়নি, এ কথা সমালোচকগণ প্রায় নিঃসন্দিগ্ধভাবে বললেও পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে যাত্রাপালার কিছুটা আত্মীয়তা আমরা খুঁজে পাই, যেহেতু যাত্রাপালার বিষয়ও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুরাণ থেকে আহৃত। পোরাণিক্ নাটকের ভাষায় উচ্ছ্বাস ও তরলতাকে কিছু পরিমাণে প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলে সাদৃশ্যও কোন কোন ক্ষেত্রে ভালোভাবেই ধরা পড়ে। আসলে কিন্তু উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান,। পৌরাণিক নাটকের প্রকৃতি ভালোভাবে আলোচনা করলেই সে কথা বোঝা যাবে।

পুরাণ বলতে সাধারণভাবে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত বোঝালেও পৌরাণিক অভিধানের মতে পুরাণ "অতি প্রাচীনকালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজ-ধর্ম ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত অখ্যায়িকা।...পুরাণ দুই ভাগে বিভক্ত—মহাপুরাণ ও উপপুরাণ। মহাপুরাণের সংখ্যা ১৮; যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত,

নারদ, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড।" নাটকের বিষয়বস্তু হিসাবে অবশ্য বিভিন্ন লৌকিক পুরাণও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পুরাণ বলতে এই যে ব্যাপক বিষয়ের উল্লেখ করা হল, এর মধ্যে সাদৃশ্যসূত্র একটাই আছে, সেটা হল ভক্তিপ্রগাঢ় কাহিনী। পৌরাণিক নাটকেরও প্রধান লক্ষণ সেটাই—ভক্তিরসগাঢ়তা। সংস্কৃত আলংকারিকগণ যে নবরসের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ভক্তির স্থান না থাকলেও বৈষ্ণব তাত্ত্বিকগণ রতিভাবকে কৃষ্ণরতিতে রূপান্তরিত করে তার সিদ্ধিকে বলেছেন প্রেমরস বা ভক্তিরস। আমরা সেই ভাবেই ভক্তিরস ব্যাপারটিকে বুঝে নিতে পারি।

প্রচলিত ছক হিসাবে পৌরাণিক নাটকে কয়েকটি সাধারণ ব্যাপার আমরা লক্ষ করতে পারি, যেমন—অদৃষ্টবাদ, অলৌকিকতা, নীতির প্রতিষ্ঠা, অবতারত্ব, ভক্তি ও বিশ্বাসের জয়, ভগবৎউচ্ছ্বাস থাকা সত্ত্বেও আংলকারিকদের শান্তরসের প্রভাব, মৃত্যু ও বিচ্ছেদ দ্বারা সমাপ্তি না ঘটিয়ে পরলোকে মিলন ও প্রশান্তি দেখানো প্রভৃতি। আসলে সাধারণ মানুষের মনে অনেক রকম সংস্কারের মতো দৈবী সংস্কারও থাকে, ধর্মভাব ও সংস্কারের যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তাদের মনে থাকে, পৌরাণিক নাট্যকার তার সদ্ব্যবহার করে থাকেন। তাই দেবদেবী চরিত্রের মতোই পৌরাণিক নাটকে ভূত-প্রেত, ডাকিনী-যোগিনী, যমদূত-দেবদূত ইত্যাদিরাও ঘন ঘন আবির্ভূত হয়ে থাকে।

কিছুটা এই কারণে এবং কিছুটা ভিন্ন কারণে পৌরাণিক নাটককে কেউ কেউ আধুনিককালের সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে মানতে চান না। আধুনিক সাহিত্য যুক্তি লালিত, অথচ পৌরাণিক নাটকে যুক্তির স্থান গ্রহণ করে ভক্তি। যুক্তি দিয়ে যাকে কোনরকমেই ব্যাখ্যা করা যায় না, ভক্তি তাকে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। ভক্তি যেহেতু পৌরাণিক নাটকে প্রাণরস সঞ্চার করে, সাহিত্য হিসাবে তাকে আধুনিক প্রকরণ বলে মানাটাই ঠিক নয় বলে অনেকের ধারণা। আবার কোন কোন সমালোচক বলেন 'পৌরাণিক নাটক' কথাটির মধ্যে এমন স্ববিরোধ আছে যে একে প্রায় অসম্ভব বলাই ভালো। নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নাটকের বৈশিষ্ট্য, নির্বিচার গ্রহণ বা 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু' গোছের মানসিকতা পুরাণের আসল কথা—সুতরাং এ দুয়ের সমন্বয়ে যে 'সোনার পাথরবাটি' তৈরি হতে পারে তাকে অন্তত আধুনিক সমালোচকের গ্রাহ্য করা উচিত নয়।

আমাদের মনে হয় এ সব যুক্তিই গভীরভাবে ভেবে দেখবার মতো, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো যে শৈল্পিক সমস্যা ঘটতে পারে সেটা এই যে, যে-দ্বন্দ্বময়তা নাটকের প্রাণ, পৌরাণিক নাটকে তা পরিস্ফুট করার অসুবিধা আছে। দেবতার আধিপত্যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে যেমন মানুষের প্রতিরোধী সত্তা ফুটে উঠবার বিশেষ অবকাশ

ছিল না, এখানেও দর্শক যখন চান দেবতার মহিমা এবং অলৌকিক লীলা, তখন দ্বন্দ্বময়তা প্রদর্শনের সুযোগ তো সেখানে অল্প।

এইসব সমস্যা মেনে নিয়েও বলতে হবে, পৌরাণিক নাটক রচনায় যাঁরা সামর্থ্য দেখিয়েছেন তাঁরা ভক্তি ও যুক্তির মধ্যে, নির্দ্বন্দ্ব দৈবী আধিপত্য ও দ্বন্দ্বময়তার সঙ্গে, একটা সুষ্ঠু সমন্বয়সাধনের শৈল্পিক প্রচেষ্টা করেছেন। পৌরাণিক নাটকের ঊষালগ্নে অলৌকিকতা ও মিথের বাড়াবাড়ি থাকলেও পরবর্তীকালে তাকে যুক্তির অনুশাসনে গ্রহণ করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এই কারণেই দেবত্ব অপেক্ষা পূর্ণ মানবত্বও ক্রমে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। যে দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ, সেই দ্বন্দ্বও পৌরাণিক নাটকের উপজীব্য হয়ে উঠেছে—কখনো দেবতার সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, কখনো আস্তিকতার সঙ্গে নাস্তিকতার, কখনো বা বিভিন্ন স্তরের ধর্মের মধ্যেই বিরোধ। একটি বাংলা পৌরাণিক নাটক বিশ্লেষণ করলে কথাটি ভালো করে বোঝা যাবে।

● একটি পৌরাণিক নাটকের বিশ্লেষণ

পৌরাণিক নাটকের প্রাণপুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটিকে পৌরাণিক নাটকের একটি ভালো দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায় বলে আমাদের মনে হয়, কারণ এটিতে একদিকে যেমন পুষ্ট হয়েছে পৌরাণিক নাটকের ঈপ্সিত ভক্তিরস, অন্যদিকে এটি আধুনিক অর্থেই নাটক হয়ে উঠেছে।

নাট্যকার স্বয়ং অবশ্য এই নাটকের শ্রেণী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, এটি 'প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক' এবং যেহেতু বিল্বমঙ্গল চরিত্রটি নাভাজী-রচিত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে অন্যতম ভক্ত হিসাবে পাওয়া যায়, একে অনেকে চরিতনাটকও বলে থাকেন। তা সত্ত্বেও প্রকৃতিতে একে যে পৌরাণিক নাটক ছাড়া অন্য কিছু মনে করা সম্ভব নয় সে কথা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

'বিল্বমঙ্গল' নাটকের কাহিনী এক কথায়, একটি সাধারণ বেশ্যাসক্ত মানুষের ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত হওয়ার কাহিনী। অবশ্য সাধারণ মনে হলেও বিল্বমঙ্গল যে চিন্তামণি নামক এক গণিকার কাছে দেহের প্রলোভনেই যেত না, তার মনে যে প্রকৃত প্রেম প্রচ্ছন্ন ছিল, তা চিন্তামণির কথা থেকেই বোঝা যায়—

"কাছ থেকে নড়তে দেবে না; সমস্ত রাত ভ্যান্ ভ্যান্। মাথামুণ্ডু নেই—খালি, ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি।"

প্রেমের এই প্রমত্ত আবেগ মনে লালন না করলে পিতৃশ্রাদ্ধের দিন সমস্ত বাধা উপেক্ষা করে চিন্তামণির কাছে আসার মতো অসাধ্যসাধন সে করতে পারতো না। এর পর যখন চিন্তার কাছে সে শুনেছে—"এই মন, আমি বেশ্যা যদি আমায় না দিয়ে

হরিপাদপদ্মে দিতে—তোমার কাজ হত!” তখনই বিল্বমঙ্গলের মনে কথাটি একেবারে আমূল গভীরতায় ঢুকে গিয়েছে। প্রেমেরই সার্থকতা খুঁজতে চেয়েছে সে তার পরমার্থ ঈশ্বর প্রেমের মধ্যে, বলেছে—

“কোথায় সে প্রেমের পাথার—
মম প্রেমের প্রবাহ মিশে যাহে হবে লয় ?’

এরপরই তার কঠোরকঠিন, যন্ত্রণাবিক্ষত ভগবৎ আরাধনা—শেষপর্যন্ত যা সার্থক হয়ে উঠেছে।

যে কোন শ্রেণীর নাটক-বিচারেই আমাদের প্রধান বিচার্য হওয়া উচিত তা নাটক হয়েছে কিনা এবং সেই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় ‘বিল্বমঙ্গল’ অত্যন্ত উচ্চস্তরের নাটক, কারণ এখানে আমরা একেবারে আধুনিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাই—ব্যক্তির নিজের সঙ্গেই নিজের বিরোধ, তার প্রেমিক সত্তার সঙ্গে অধ্যাত্ম সত্তার বিরোধ এবং তার বিচিত্র এক সমীকরণ, যেখানে উপনীত হলে বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে বলতে পারে তার ‘প্রেমশিক্ষাদাতা’।

প্রথাগত বিচারে ‘বিল্বমঙ্গল’-কে পৌরাণিক নাটক বলার অসুবিধা নিশ্চয়ই আছে কারণ এর বিষয়বস্তু পুরাণ হিসাবে নির্দিষ্ট কোন গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়নি, রামায়ণ বা মহাভারত থেকেও নাট্যকার এই আখ্যান গ্রহণ করেননি। কিন্তু পৌরাণিক নাটকের অঙ্গীরস যে ভক্তি, তা এই নাটকে সর্বাংশে আছে—আলংকারিদের ভাষায় বলা যায়, এর ঔচিত্য কোন মতেই ক্ষুণ্ন হয়নি। সেই হিসাবে বলতে হবে, পৌরাণিক নাটক হিসাবে এর আস্বাপদ্যমানতা সম্পূর্ণই বজায় আছে। উপরন্তু নাটক হিসাবেও এটি অনেক প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কারণ উপাদান যেখান থেকেই সংগৃহীত হোক, আধুনিক সাহিত্যে মানবিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বা আশা-আকাঙ্ক্ষার কাহিনীই আমরা শুনতে চাই। ‘বিল্বমঙ্গল’ সেদিক থেকে আধুনিক দর্শকের কাছেও রুচিকর হবে, কারণ সাধারণ একটি মানুষের কামনা এবং সেই কামনার উর্ধ্বায়নই এখানে পরিস্ফুট করার চেষ্টা করা হয়েছে—ফলে পৌরাণিক নাটকেও নাট্যকার আশ্চর্যভাবে মানবিক স্বার্থ ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন।

এই কৌশল আমরা অন্যত্রও দেখি। পৌরাণিক নাটকে অনেক অবাস্তব ও অপার্থিব লীলা দেখাতে হয় যাতে ভক্তপ্রাণ দর্শক তা উপভোগ করতে পারেন। দর্শক সম্বন্ধে অতিঅভিজ্ঞ গিরিশচন্দ্র তা স্মরণ রেখেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক মহিমা এই নাটকে অনেক প্রদর্শন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে রাখাল বেশে দেখিয়েও তাঁর পরিতৃপ্তি হয়নি, শেষ দৃশ্যে দোলমঞ্চে তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগললীলা দেখিয়েছেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গেই একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে, কুশলী নাট্যকার কখনো অলৌকিক লীলাকে নাটকের প্রত্যক্ষ কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেন না। অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতকে তিনি জনরুচির স্বার্থে গ্রহণ করেন কিন্তু শিল্পের স্বার্থে তাকে করে রেখে দেন বহিরঙ্গ উপকরণ। এই নাটকেও আমরা অলৌকিক

লীলা বেশ কয়েকবারই দেখতে পেয়েছি, তার মধ্যে প্রধান অবশ্য অন্ধ বিল্বমঙ্গলের পুনর্বার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া। কিন্তু একে যদি আমরা রূপক হিসাবে দেখি, ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ জীবনে আবির্ভূত হবার পর তার চোখে এলো নতুন দৃষ্টি বা নতুন করে দেখবার ক্ষমতা—তাহলে বোধহয় এই রকম জোরালো অলৌকিক ঘটনাকেও আমরা মেনে নিতে পারি।

সচেতন দর্শককে এ কথাটা বোঝাবার জন্য, অথবা মানবিক নাটকের মধ্যে অলৌকিক পরিবেশ তৈরি করবার জন্য, আর একটি কৌশলের প্রয়োগ করেছেন নাট্যকার। নাটকে তিনি সাধারণভাবে ব্যবহার করেছেন গদ্য সংলাপ এবং সে গদ্য একেবারেই মুখচলতি ভাষা, অথচ যে-মুহূর্তে নাটকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির প্রয়োজন ঘটেছে অথবা অলৌকিকের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, নাট্যকার প্রয়োগ করেছেন তাঁর বিশিষ্ট গৈরিশ ছন্দ। যেমন বিল্বমঙ্গলের প্রথম কাব্যছন্দ ব্যবহারের উল্লেখ করা যায়। অত্যন্ত সাধারণ ভাষার সংলাপই নাট্যকার ব্যবহার করেছেন তার মুখে, অথচ যে মুহূর্তে তাকে আন্দোলিত করার মতো কথা সে শোনে চিন্তার মুখে, সেই মুহূর্তে তার মুখের সংলাপের চরিত্র-পরিবর্তন ঘটে—

"এই পরিণাম।
এই নরদেহ—
জলে ভেসে যায়,
ছিঁড়ে খায় কুক্কুর শৃগাল,
কিম্বা চিত্তাভস্ম পবন উড়ায়।
এই নারী—এরও এই পরিণাম।
নশ্বর সংসারে,
তবে হায়! প্রাণ দিছি কারে?"

কাজেই, অলৌকিক লীলাকে বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা সত্ত্বেও তাকে নাটকের বহিরঙ্গ উপাদানে পরিণত করে, দর্শকের রুচিকে মান্য করেও শিল্পের দাবী অক্ষুন্ন রেখে এবং মানুষের অন্তর্দ্বন্দের প্রখরতায় একে আধুনিক দর্শকের উপভোগ্য করে গিরিশচন্দ্র যে এই নাটকে সার্থক পৌরাণিক নাটকের সংবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছেন এ বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নেই।

গ. সামাজিক নাটক

সাধারণভাবে নাটক বলতে আমরা সামাজিক নাটকই বুঝি। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বৃত্ত ছেড়ে নাটক যে মুহূর্তে সমাজের বিশেষ কোন সমস্যাকে আশ্রয় করেছে, সেই মুহূর্তে আমরা বুঝতে পেরেছি বাংলা যাত্রাগান থেকে নাটকের পথ-পরিক্রমা কতো স্বতন্ত্র হতে চলেছে। নাটক জীবননির্ভর, এবং জীবন বলতে

প্রধানত মানুষের সামাজিক জীবনই বোঝায়, তাই আধুনিক নাট্যকলার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সামাজিক নাটকের উন্মেষের এক দৃঢ় সম্পর্ক আছে।

সামাজিক নাটক বলতে অবশ্য আমরা ঠিক সামাজিক মানুষের নাটক বুঝি না, বুঝি এমন এক ধরনের নাটক যার বিষয় কোন সামাজিক সমস্যা। সেই হিসাবে যেসব নাটক সমস্যাপ্রধান নাটক হিসাবে চিহ্নিত, সেই সমস্যার প্রকৃতি সামাজিক হলে তাকে নিশ্চয়ই সামাজিক নাটক বলা যায়। আবার বাস্তবতাবাদী আন্দোলনে উদ্ভূত নাটকেও সেই একই কারণে সামাজিক নাটকই বলতে হবে। এই সূক্ষ্ম বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে আমরা বলতে পারি বিভিন্ন সময়ের যেগুলি প্রধান সামাজিক সমস্যা সেগুলিকে অবলম্বন করে লেখা নাটককেই আমরা আখ্যা দিই সামাজিক নাটক। যেমন ঊনবিংশ শতকের প্রধান সমস্যা ছিল কৌলীন্য প্রথা, বালবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি। এই সঙ্গে ছিল অন্তঃসারশূন্য জমিদারদের আভিজাত্য-বোধ এবং এইরকম দুই পরিবারের বংশানুক্রমিক লড়াই প্রভৃতি। পরবর্তীকালে সামাজিক সমস্যার পালাবদল ঘটেছে। যৌথ পরিবারের অবলুপ্তি এবং সংসার ক্রমশ ছোট থেকে আরো ছোট করার প্রবণতাই এখন সবচেয়ে বেশি প্রকট। এর ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলি এখনও ব্যক্তিগত সমস্যা হয়েই আছে, কিন্তু অচিরেই তা বৃহত্তর সামাজিক সমস্যায় রূপান্তরিত হবে, সে আশঙ্কা এখনই দেখা দিতে শুরু করেছে।

প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে সম্ভবত রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' (১৮৫৪)। সেকালে কুলীনদের বহুবিবাহ ছিল অন্যতম প্রধান সামাজিক সমস্যা এবং এই সমস্যাকেই তাঁর এই জনপ্রিয় নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। রামনারায়ণ সামাজিক প্রহসনও কিছু লিখেছিলেন, যেমন বহুবিবাহের দোষ নিয়েই লিখেছেন 'উভয় সংকট', স্বামীর লাম্পট্য দূর করায় স্ত্রীর কৌশল নিয়ে লিখেছেন 'চক্ষুদান', বড় প্রহসন হিসাবে লিখেছেন 'যেমন কর্ম তেমনি ফল।' 'কুলীন কুল সর্বস্ব নাটক' যদিও তাঁর জনপ্রিয় নাটক, নিটোল কাহিনীর অভাবে একে খণ্ড খণ্ড ব্যঙ্গচিত্রের মতো মনে হতে পারে। নাটক হিসাবে বরং তাঁর পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক 'নবনাটক' অনেক শিল্পত্রুটিমুক্ত।

বাংলা নাটকের আদি যুগে রামনারায়ণের পরবর্তী অনেক নাট্যকারই সামাজিক নাটক লেখার চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্যবিবাহ নাটক', তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক', হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কাদম্বিনী নাটক', উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' প্রভৃতি। মধুসূদন দত্ত সামাজিক নাটক লেখেননি, কিন্তু তাঁর 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এই দুটি সামাজিক প্রহসন এই জাতীয় রচনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলা যেতে পারে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' অবশ্যই সামাজিক নাটক। যদিও আজ তা ইতিহাস হয়ে গিয়েছে, দীনবন্ধু যখন এ নাটক লেখেন তখন এই নৃশংস

প্রথা ছিল নির্মমতম সামাজিক সমস্যা। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে জীবনযাত্রা গঠনের অপদার্থতা নিয়ে লেখা তাঁর 'সধবার একাদশী', কিম্বা ছোট প্রহসন 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও পুরোপুরি সামাজিক প্রহসন এবং রচনাসৌকর্যে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং সর্বশ্রেণীর উপভোগ্য প্রহসন 'জামাই-বারিক'।

● একটি বাংলা সামাজিক নাটক

বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় সামাজিক নাটকগুলির অন্যতম গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', সুতরাং এই নাটকে সামাজিক নাটকের লক্ষণ কতোটা আছে এবং তার শিল্প-সার্থকতাই বা কতোখানি, সংক্ষেপে তা আলোচনা করা যেতে পারে।

'প্রফুল্ল' নাটকের নাট্যকাহিনী মোটামুটিভাবে এইরকম যে, অল্প বয়সে পিতৃহারা যোগেশ নিজে প্রচুর কষ্ট করে বিধবা মা এবং দুটি নাবালক ভাই রমেশ ও সুরেশকে মানুষ করার চেষ্টা করেন। জীবনে যখন তিনি সৎপথে থেকে, ন্যায়নিষ্ঠ ভাবেই প্রতিষ্ঠিত, মেজভাই রমেশকে ওকালতী পাশ করিয়েছেন, ছোট ভাই সুরেশকে পড়াশুনায় কৃতী করতে না পারলেও অমানুষ হতে দেননি—সেই সময়েই সংসারে বিপর্যয় দেখা দেয়, তাঁর ব্যাংক ফেল করে এবং তিনি সর্বস্বান্ত হন। তাঁর এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে মেজভাই রমেশ তাঁকে দিয়ে বাড়ি ও সম্পত্তি লিখিয়ে নেয় নিজের নামে এবং এ পথের একমাত্র কাঁটা যোগেশের পুত্র যাদবকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে মিথ্যা চুরির অপবাদে সুরেশকে জেলে ঢোকায়। যোগেশ আঘাতের পর আঘাতে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন এবং মদ্যপানে বিভোর হয়ে সমস্ত ভুলে থাকার চেষ্টা করেন। সংসারের প্রতি দৃষ্টি না থাকায় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়, ছোট ছেলের শোকে মা উন্মাদিনী হন—শেষে যাদবকে মারার অপকীর্তি রোধ করতে এসে রমেশের স্ত্রী প্রফুল্লও মারা পড়ে এবং রমেশ বোধহয় এতোদিনে প্রথম ধাক্কা খায়।

নাটকটি আমাদের দেশের একদা-এক সামাজিক অবস্থাকেই প্রতিফলিত করে। এখানে যদিও আমরা কোন বিশেষ সামাজিক সমস্যাকে একক ভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারি না, কিন্তু আমরা সবাই বুঝি একান্নবর্তী পরিবারের মূল সমস্যা এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একার আয়ে যখন সংসার দাঁড়িয়ে থাকে, অথচ পোষ্য থাকে অনেকগুলি, তখন সেই একার বিপর্যয়ে গোটা সংসারটাই ভেসে যাবার উপক্রম হয়। এখানে অবশ্য যোগেশের আয়ে সংসার চললেও তিনি রমেশকে মানুষ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও একটি প্রশ্ন আছে। ভায়েরা যাতে ঠিকমতো পড়াশুনা করতে পারে, কোন আর্থিক অসুবিধা যাতে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে না পারে, এ ব্যাপারে তাঁর যতো দৃষ্টি ছিল, ভাইগুলি সত্যিই 'মানুষ'

হচ্ছে কিনা এদিকে দৃষ্টি তাঁর একেবারেই ছিল না। ফলে, একচক্ষু হরিণের মতো তিনি তাদের পেছনে অকাতরে অর্থব্যয়ই করে গিয়েছেন, ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ হয়ে তাদের শাসনের দিকটা দেখতেই পাননি। এর আশঙ্কিত ফললাভও তিনি করেছেন। (অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলা যায়, বর্তমান সমাজে একটিমাত্র ছেলে বা মেয়েকে সেরা করার যে প্রতিযোগিতায় বাবা-মা নেমেছেন, সেখানেও প্রচুর অর্থব্যয় করেই তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব শেষ মনে করছেন—নিজেরা সময় দিতে চান না, ছেলেমেয়ের মনোভাবও বুঝতে চান না। তার ফল কিন্তু ফলতে শুরু করেছে।) এই সঙ্গে অবশ্য আর একটি সামাজিক সমস্যার দিক উন্মোচিত করা দরকার, সেটি হল বেসরকারী ব্যাঙ্কের সমস্যা। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা ফলে আমরা এখন যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করি তার মধ্যে প্রধান হল ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা। মানুষ তার অর্থ সঞ্চয় করে তিল তিল করে, অথচ বেসরকারী ব্যাঙ্কিং প্রথায় যে-কোনদিন এক মুহূর্তে তা নস্যাৎ হয়ে যাবার আশঙ্কা ছিল—সেই আশঙ্কার বিধ্বংসী চেহারা আমরা 'প্রফুল্ল' নাটকে দেখতে পাই। সুতরাং সমস্যার প্রকৃতি বিচার করলে নাটকটিকে সামাজিক নাটক বলে স্বীকার করতে আমাদের কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। অবশ্যই এর শিল্পসাফল্যের কথাটা এরপর আমাদের চিন্তা করতে হবে।

যে-কোন ভাল নাটকেই চরিত্র ও ঘটনাকে আমাদের স্বাভাবিক ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। প্রফুল্ল যেহেতু ট্র্যাজেডি হিসাবে সাধারভাবে স্বীকৃত, এর পরিণতি এবং নায়ক চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের আরো সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এই নাটকের পরিণতি এবং ঘটনাধারার মধ্যে যে একটা কার্যকারণ-শৃঙ্খলের অভাব আছে এবং রোমহর্ষক ঘটনার প্রতি নাট্যকারের যে বেশি আগ্রহ আছে তা আমরা বুঝতে পারি। দর্শকদের অভিনন্দন পাওয়ার জন্য জগমণি ও কাঙালীচরণকে তিনি প্রায় অবিশ্বাস্য চরিত্রে পরিণত করেছেন। প্রফুল্ল শেষ দৃশ্যে যে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার নায়িকা হয়ে যায়, সে প্রাধান্যও তাকে প্রথমাবধি দেওয়া হয়নি। রমেশের মতো আদ্যন্ত শয়তান চরিত্র কোন মানুষের হতে পারে কিনা এটাও ভাববার কথা। বিশেষ করে যোগেশ কেন মদ্যপানের মাত্রা বাড়িয়ে দেন, সারাজীবন যিনি নিজে দাঁড়াবার ও ভাইদের প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন তিনি একটি আঘাতেই—তা সে যতোই বড়ো হোক না কেন, ভেঙে পড়েন, তা আমাদের বিস্মিত করে। এ কথা আরো ভাববার এই কারণেই যে, উদ্যম ও মনোভাব পংগু হয়ে গেলে তাকে তো আমরা ট্র্যাজেডির আদর্শ নায়ক বলতেই পারি না, এবং যোগেশ ছাড়া নায়ক হিসাবে ভাববার মতো অন্য কোন চরিত্রও 'প্রফুল্ল' নাটকে নেই। অবশ্য যোগেশ চরিত্রকে একটু অন্য ভাবেও চিন্তা করা যায়। তাঁর চারিত্রিক ত্রুটি বা **frailty** যদি আমরা ধরি অন্ধ ভ্রাতৃস্নেহ এবং ভাইয়ের আচরণে তিনি যদি বুঝে থাকেন এতোদিন তিনি পণ্ডশ্রম করেছেন—সঞ্চিত ধনের চেয়েও বড় সম্পদ তিনি হারিয়েছেন, এই অনুভূতি যদি তাঁর জেগে থাকে, একমাত্র তবেই তাঁর আচরণের যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়।

ফলত, বিষয়ের বিচারে তো বটেই, রূপায়ণের ক্ষেত্রেও আমরা 'প্রফুল্ল'কে মোটামুটিভাবে শিল্পসফল সামাজিক নাটক হিসাবে মেনে নিতে পারি।

ত. লোকনাট্য

আধুনিক সাহিত্য-প্রকরণের আলোচনায় লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্তি হতে পারে কিনা সে বিষয়ে সংশয় আছে। সংশয় আছে, কারণ প্রকৃত অর্থে যাকে নাটক নামক সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে অভিহিত করা হয়, তার আগে পর্যন্তই ছিল লোকনাট্যের উপযোগিতা ও অস্তিত্ব। কিন্তু শিষ্ট সাহিত্যের প্রবল প্রতাপ সত্ত্বেও কোথাও কোথাও সে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে লোকসাধারণের মধ্যে এবং আধুনিক নাট্যকারগণও সাম্প্রতিক কালে লোকনাট্যের প্রতি ঐতিহ্যগত যোগসূত্র স্বীকার করছেন ও কখনো কখনো সেই উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের উদারতা দেখাচ্ছেন বলেই প্রকরণ হিসাবে তারও উল্লেখ করা হল।

প্রকৃতপক্ষে লোকনাট্যকে মানুষের আদিম সাহিত্যশিল্প-প্রকরণ বললেই ভালো হয়। উৎসমূলে এই নাটকের বিষয় ছিল কৃষিভিত্তিক। বিভিন্ন ঋতুতে ফসল সংগ্রহ, শস্যক্ষেত্রের দেবদেবী প্রকৃতিদেবীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ রচনা এবং নাচে-গানে-উৎসবে তাঁদের তা উৎসর্গ করাই ছিল মূল ব্যাপার। এমন কথাও কেউ কেউ মনে করেন যে ঐশ্বর্যশালী গ্রীক ট্র্যাজেডির পূর্ব সূত্র এই ধরনের লোকনাট্য। ইংরেজি নাটকে 'মুখোশ-নাটকে'-র মধ্যে লোকনাট্য নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল।

আমাদের গ্রামীন লোকসমাজে লোকনাট্যই ছিল জনপ্রিয়। আবেগধর্মী সংলাপ, সংগীতের বহুল প্রয়োগ, আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ—ইত্যাদির দ্বারাই তা সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করতো, এখনও একেবারে করে না এমন নয়। সংস্কৃতে শিষ্ট নাটকের পাশাপাশি যে প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত লোকনাট্যের ধারা ছিল, আমাদের দেশে তাকেই বলা যায় আদি লোকনাট্য। আদি ও মধ্যযুগের বাংলা-সাহিত্যে লোকনাট্যের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাপদে 'বুদ্ধ নাটকের' কথা আছে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গীতিনাট্যটিও বহুলাংশে লোকনাট্যের লক্ষণাক্রান্ত।

থ. রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটক

রূপক ও সাংকেতিক নাটককে এক সঙ্গে আলোচনা করার কোন যৌক্তিকতা নেই, তাদের একই বিভাগে স্থান দেওয়া আরো অর্থহীন। অর্থাৎ সাধারণভাবে যে আমরা দুটি শ্রেণীকে একই ধরনের দুটি বিভাগ বলে মনে করি তাই শুধু নয়, সাহিত্য-প্রকরণের কোন কোন গ্রন্থে তাদের পৃথক পর্যন্ত না করে আলোচনায় বার

বার 'রূপক-সাংকেতিক' নাটক হিসাবে উল্লেখ দেখি। এই বিপর্যয় সাহিত্যালোচনাতেও সংক্রামিত হয়েছে, সেইটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের নাটক আলোচনাতে একই নাটককে কেউ বলেছেন রূপক, কেউ সাংকেতিক, কেউ তত্ত্ব নাটক। নাটকে তত্ত্ব থাকতেই পারে এবং যখন সেই উদ্দেশ্যমূলকতা নাট্যরসের মতোই প্রধান হয়ে ওঠে তখন তাকে তত্ত্বনাটক বলা যায় না, এমন নয়। কিন্তু একই নাটককে রূপক ও সাংকেতিক, অথবা রূপক-সাংকেতিক বলা কিছুতেই সমীচীন হতে পারে না, অন্তত বললে তা রূপক ও সাংকেতিক নাটক সম্বন্ধে আমাদের ধারণার অস্পষ্টতাকেই প্রমাণ করে।

সাংকেতিক নাটক আসলে একটি আধুনিক নাট্যপ্রকরণ। আগেও হয়তো এর বীজ ছিল, কিন্তু সাংকেতিক বা প্রতীকী আন্দোলনের পূর্বে এ জাতীয় নাট্যরচনা সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে রূপকের ব্যবহার দীর্ঘকালের—বিভিন্ন উদ্দেশ্যেই অবশ্য, এবং নাটকে তা ব্যবহারের জন্য আধুনিক মনস্কতার কোন প্রয়োজন নাও থাকতে পারে। আমাদের পঞ্চতন্ত্রের গল্প থেকে শুরু করে আধুনিককালে বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্যের' আখ্যানগুলি, এমনকি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'তোতাকাহিনীও' রূপকধর্মী। ইংরেজি সাহিত্যে বুনিয়নের 'পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস', স্পেনসারের 'ফেয়ারি কুইন,' জোনাথন সুইফটের 'গালিভার্স ট্র্যাভেলস্' ইত্যাদি সমস্ত রচনাকেই রূপকধর্মী বলা চলতে পারে। রূপকধর্মী রচনা যে কতো প্রাচীন তা বোঝাবার জন্য সমালোচক অ্যাব্রামস্ ঈশপের গল্প এবং চসারের দু-একটি রচনার নামও করেছেন। সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না করে রূপক ও সাংকেতিক রচনার প্রভেদটি ভালো করে জেনে রাখা দরকার, তাহলে কোনও নাটকের সঠিক শ্রেণী নির্ণয়ে আমাদের অসুবিধা হবে না।

রূপক ও সাঙ্কেতিক নাটকের পার্থক্য

প্রথমত, রূপকের কাজ বক্তব্য বিষয়কে গোপন করে তার একটা প্রতিরূপ খাড়া করা। অর্থাৎ রূপক-কাহিনীতে দুটি কাহিনী চলে সমান্তরালভাবে—একটি আপাত-কাহিনী, যার অন্তরালে আত্মগোপন করে লেখক দ্বিতীয় কাহিনীটি বলতে চান। বুদ্ধিমান পাঠক আপাতকাহিনীর পেছনে অবশ্য সেই দ্বিতীয় কাহিনীটিকেও বুঝতে পারেন। পারাই স্বাভাবিক, কারণ লেখক দ্বিতীয় কাহিনীটির ওপর বেশি জোর দিতে চান এবং সেটিকে পরিস্ফুট করার জন্যই প্রথম কাহিনীটির পরিকল্পনা করেন। আসলে প্রচ্ছন্ন কাহিনীটিই মূল্য কাহিনী যেটি বিভিন্ন কারণে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকাশ করার অসুবিধা তাঁর থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' কাহিনীটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে প্রাথমিক ভাবে আমরা পেয়েছি

একটি লোভী বাঘের গল্প যে তার নিষ্ঠুর হত্যালীলার স্বপক্ষে বেশ কিছু কথা বলে যায়। আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি এর সমান্তর ভাবে লেখক বলতে চান ইংরেজের আগ্রাসী মনোভাব, উদ্যত লোভ এবং পরিকল্পিত শোষণকার্যের কথা; সে কথা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারেন। এই কারণেই অ্যাব্রাম্‌স্‌ রূপক বা Allegory-র সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে—"An allegory is a narrative in which the agents and action, and sometimes the setting as well, are contrived not only to make sense in themselves, but also to signify a second, correlated order of persons, things concepts, or events."

সংকেত বা প্রতীক বলতে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার সৃষ্টি বুঝি। এই ধরনের সৃষ্টি সম্বন্ধে আর্থার সিমন্সের অভিমত—"It is an attempt to spiritualise literature, to evade the old bondage of exteriority...in this endeavour to disengage, the ultimate essence, the soul of whatever exists can be realised by the consciousness."

এখানেও অবশ্য আপাতকাহিনীটির অন্তরালে অন্য কোন কথা থাকে, কিন্তু কোন সমান্তর কাহিনী থাকে না—থাকে একটা অনুভূতি বা অব্যক্ত সংবেদন, যাকে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব বলেই প্রতীকধর্মী একটি কাহিনী লেখককে বেছে নিতে হয়। সাংকেতিক নাটকের কাহিনী স্বাভাবিক কারণেই রূপকের মতো নিটোল হয় না এবং প্রকৃত কাহিনী গোপন রাখার দায়ও তার থাকে না—রহস্যময় ভাবে, ইঙ্গিতে ও প্রতীকের সাহায্যে তা অব্যক্ত সেই অনুভূতির প্রতি আকর্ষণ করে যে অনির্বচনীয়কে বচনীয় করবার অসম্ভব প্রয়াস থাকে সাংকেতিক কাহিনীর।

দ্বিতীয়ত, রূপক কাহিনী স্পষ্ট বোঝা যায়—যেমন বোঝা যায় তার আপাত-কাহিনী তেমনি তার নেপথ্য কাহিনী। কিন্তু সাংকেতিক নাটকে বা অন্যান্য আখ্যান-ধর্মী সাহিত্যে এই স্পষ্টতা মোটেই থাকে না। তার নেপথ্যে যে অনুভূতি লেখক সঞ্চারিত করতে চান তা বোঝা পাঠকের পক্ষে আরো শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে অবশ্য নাট্যকারের কিছু করবার থাকে না, কারণ যে অনুভূতি অত্যন্ত গভীর ও প্রায় অনির্বচনীয়, তাই তিনি প্রকাশ করতে চান। এই অনুভূতি প্রকাশের জন্য তিনি যেমন প্রতীকধর্মী কাহিনী নির্বাচন করেন, তেমনি নীলকণ্ঠ পাখির পালক, লোহার জাল, রক্তকরবী প্রভৃতি কিছু প্রতীক গ্রহণ করে থাকেন। এই সব প্রতীক এবং ব্যঞ্জনাময় ভাষার সাহায্যে বক্তব্য পরিবেষণের চেষ্টা করা ছাড়া তাঁর কোন উপায় থাকে না।

তৃতীয়ত, রূপকের আবেদন সম্পূর্ণত বুদ্ধির কাছে, সংকেতের আবেদন বোধের কাছে। এই কারণেই বুদ্ধিমান পাঠক রূপকের দ্বিতীয় কাহিনীর অর্থ খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারেন, কিন্তু যথার্থ অনুভূতিশীল মানুষ ছাড়া সংকেতের রহস্য উদ্ধার করা অথবা লেখকের ব্যঞ্জনার কাছাকাছি পৌঁছোন পাঠকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

চতুর্থত, সমালোচকের পক্ষে রূপক নাটকের অর্থ বিশ্লেষণ করা বা তার ব্যাখ্যা করা মোটামুটি ভাবে সহজ, কারণ বুদ্ধিপ্রধান নাটকের অর্থ মননশীল সমালোচকের পক্ষে বিশ্লেষণ করতে না পারার কোন কারণ নেই। সাংকেতিক নাটক অনুভূতিগ্রাহ্য হওয়ার জন্য একদিকে যেমন সমালোচক নিজেই তার রহস্যে বিভ্রান্ত হয়ে যান, অন্যদিকে আর একটা সমস্যাও আছে—একটি গভীর অনুভূতির বিষয়কে যতোটা ভালোভাবে বলা সম্ভব, ঠিক সেইভাবেই উপস্থাপিত করা হয় একটি নাটকে। তাকে এর চেয়ে ভালোভাবে বোঝানো আর সম্ভব নয়—অন্য যে-কোন ভাবে বোঝাতে গেলে সেই সুন্দর সৃষ্টির তুলনায় তা অসুন্দর হতে থাকে। সেই কারণে রূপকের ব্যাখ্যা আমাদের তৃপ্ত করে, সাংকেতিক নাটকের ব্যাখ্যা আমাদের সেভাবে সন্তোষ দান করতে পারে না।

পঞ্চমত, রূপক নাটক উদ্দেশ্যমূলক এবং সেই কারণেই রূপকার্থ স্পষ্ট হয়ে গেলেই, অর্থাৎ নাটকটি অর্থবোধকভাবে শেষ হলেই, দর্শক তৃপ্তি লাভ করেন। তিনি নাট্যকার যা বলতে চান তার অর্থ বুঝতে পারেন এবং তাঁর অন্তরে আর কোন প্রশ্ন বা অস্বস্তি থাকে না। কিন্তু সংকেতের ক্ষেত্রে তা হয় না। যে দর্শক গভীর অনুভূতির সাহায্যে নাটকের মূল ব্যঞ্জনার কাছাকাছি উপনীত হতে পারেন তিনি নাট্যকারের গভীর অনুভবের সিংহদ্বারে পেঁছে যান। এবার নাটকটি সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের অনুভূতি অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং যে গভীর অনুভূতির সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন তাঁর তীব্রতা তাঁকে অভিভূত ও এক আনন্দিত অতৃপ্তি দান করে। রূপক ও সংকেতের পার্থক্য বিষয়ে অনেকেই মন্তব্য করেছেন, এখানে সাংকেতিক কাব্য-আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ইয়েটসের একটি বক্তব্য উদ্ধার করছি—"A symbol is indeed the possible expression of some invsible essence, a transparent lamp about a spiritual flame while allegory is one of the many possible representations of an embodied thing."

● একটি বাংলা রূপক-নাটকের ব্যাখ্যা

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংকেত এবং সাংকেতিক ব্যঞ্জনা কখনোই একেবারে অনুপস্থিত থাকে না, কিন্তু নাটকের শ্রেণী বিচার করার সময় মূল প্রবণতা এবং সঠিক প্রকৃতিই লক্ষ করা উচিত। সেদিক থেকে বিচার করলে, রথ, পথ, রশি প্রভৃতি অনেক সংকেতের ব্যবহার থাকলেও মূলত রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' নাটককে রূপক নাটকের শ্রেণীতেই ফেলা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি, অন্তত রূপক ও সাংকেতিক নাটকের যে পার্থক্যগুলি আমরা চিহ্নিত করেছি সেই সূত্রে বিচার করলে।

এমনিতেই 'কালের যাত্রা'-র যা আয়তন তাতে তাকে নাটিকা বলাই ভালো।

মোট তিনটি অংশে বিচ্ছিন্ন এই নাটকের মূল অংশ প্রথমে সন্নিবিষ্ট 'রথের রশি', দ্বিতীয় অংশ 'কবির দীক্ষা' একটি দীর্ঘ কবিতামাত্র এবং 'রথযাত্রা' 'রথের রশি'-র পুনরাবৃত্তি। 'রথের রশি' অংশের প্রথমেই দেখি রথযাত্রার মেলায় সম্মিলিত মেয়েদের দুশ্চিন্তা, কারণ 'রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ।' তাদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেবার জন্য সন্ন্যাসী এসে বলেন—

'সর্বনাশ এল।
বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।'

মেয়েরা আতঙ্কিত হয়, ব্যাপারটা বোঝে না, মনে করে তারা মেলা দেখতে এসেছে—অথচ পুজো আনে নি, তাই এই অঘটন। তারা ছোটে পুজো আনতে। এরপর নাগরিকরা আসে সেখানে, ঘটনাকে তারা অন্যভাবে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সন্ন্যাসী এসে তাদেরও ভয় দেখান। মেয়েরা এরপর ফিরে এসে তাদের অনুষ্ঠানিক আচার-অনুষ্ঠান শুরু করে দেয়। 'দড়ি-নারায়ণ'-কে প্রসন্ন করবার জন্য তাতে ঘি, দুধ, পঞ্চগব্য, গঙ্গাজল ঢালা শুরু হয়। নানা নারী নানা মানতও করে ফেলে। এতেও যখন রথের চাকা নড়ে না, সন্ন্যাসী এসে বলে যান—

'কালের পথ হয়েছে দুর্গম।
কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।'

এই শুনে 'রাস্তা-ঠাকুর'কে পুজো দিতেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে মেয়েরা।

এরপর আসে সৈনিকরা, তাদের কথায় জানা যায় ব্রাহ্মণের মন্ত্রে রথের চাকা ঘোরে নি, তারপর স্বয়ং রাজাও হাত লাগিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। নাগরিকদের আলোচনায় শোনা যায়, শূদ্রদের বাড় বেড়েছে বলেই এই অঘটন। এক নাগরিকের কাছে জানা যায় এ যুগে 'চলে কেবল স্বর্ণচক্র।' তাই রাজা ডাক দিয়েছেন শেঠ-জিকে। সৈনিকরা বিশ্বাস করে না, তাদের হাতে যে রথ চলে না তা চলবে ধনপতির হাতে। ধনপতি আসার আগে আরো একটা খবর পাওয়া যায়, 'নর্মদা-তীরের বাবাজিকে আনা হয়েছিল / দড়িতে হাত লাগাবার জন্যে'। তাঁর হাত লাগামাত্র 'রথের চাকা বসে যেতে লাগল মাটির নিচে।' কিন্তু ধনপতিও এসে যখন ব্যর্থ হলেন মন্ত্রী তখন মেয়েদেরই ডাকলেন আবার, যদি তাদের ভক্তির জোরে রথ চলে। সে চেষ্টাও চলে, কিন্তু কোন কাজ হয় না। তখন চরের মুখে শোনা যায় শূদ্রেরা দলে দলে ছুটে আসছে, রথ নাকি তারাই চালাবে। তারা এসে পড়ে, দলপতির সঙ্গে তর্ক বাধে পুরোহিতের, সৈনিকের, মন্ত্রীর। কেউ তাদের বাধা দিতে পারেন না যখন, তখন সবাই দ্বিধায় জর্জরিত—ওদের আটকানো হবে, না ওদের কাজে সাহায্য করা হবে। এই দ্বিধার মাঝখানেই ওরা হাত দেয় দড়িতে, এবং রথ চলে।

কবি আসেন এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে, বললেন অন্যান্য শ্রেণীর মাথা অত্যন্ত উঁচু ছিল বলেই ঠাকুর এবার নিচুর দিকে ফিরেছেন। তবে এই নিচু শ্রেণী যদি কোনদিন গর্বে অন্ধ হয়ে মনে করে তারাই চালাচ্ছে রথ, তবে আসবে আবার উল্টোরথের পালা।

এই রথ যাত্রার মেলা এবং রথ না চলা উপলক্ষে রাজা, মন্ত্রী, ধনপতি ইত্যাদি নিয়ে প্রায় রূপকথার মতো যে আখ্যান নির্মাণ করা হয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যায়, তার আড়ালে একটি সমান্তর কাহিনী চলেছে। এই নেপথ্য-কাহিনীর মূল সূত্র পাওয়া যাবে কবির ৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৯ তারিখে লেখা শরৎচন্দ্রকে একটি চিঠিতে। সেখানে তিনি লিখেছেন—'মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ-বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানবসম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে,···তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসত্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।'

বেশ বোঝা যায়, সমাজ-প্রগতির মার্কসীয় দৃষ্টির কথাই এখানে দ্বিতীয় সমান্তর কাহিনী হিসাবে অগ্রসর হয়েছে। এই তত্ত্বদর্শনের মূল কথা হল, যে-কোন সমাজ-সভ্যতার প্রথম অবস্থায় নেতৃত্ব দেন ব্রাহ্মণ্যসমাজ। তাঁদের মন্ত্রতন্ত্র এবং বিধিনিষেধ স্বয়ং নৃপতিও মানতে বাধ্য হতেন। অবশ্য এর পর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রে এক ধরনের সামঞ্জস্য দেখা যায়, বা বলা যায় কোথাও কোথাও সামান্য বিরোধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র রাজতন্ত্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু রাজশক্তির সামর্থ্য নির্ভর করে ধনিকশ্রেণীর ধনসঞ্চয়ের ওপর, এ বিষয়ে যখন ধনিকশ্রেণী সচেতন হয় তখন ফিউডাল আধিপত্য ঘুচে সমাজের প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ায় বুর্জোয়া শ্রেণী বা ধণিক শ্রেণী। কালের রথ দাঁড়িয়ে থাকে না, সে যতোই অগ্রসর হয় ততোই শূদ্রসমাজ বা শ্রমিকসমাজ সংগঠিত হয়, তারা বুঝতে শেখে বুর্জোয়া শ্রেণীর মুনাফার মৌলিক উপাদান তাদের শ্রম। এই বোধে উদ্দীপ্ত হলে শ্রমজীবী শ্রেণীর জাগরণ ঘটে এবং সমাজের নেতৃত্ব যায় তাদের হাতে। সমাজ-বিবর্তনের এই সত্য আমাদের সমাজ বলে নয়, পৃথিবীর অনেক সমাজ সম্বন্ধেই সত্য এবং আমাদের সমাজও যে ঠিক এই পথেই বিবর্তিত হয়ে এসেছে, নাটকে বিভিন্ন শ্রেণীর সংলাপ স্মরণ করলেই তা বোঝা যাবে।

নাটক আরম্ভ হওয়ার সামান্য পরেই দ্বিতীয় নাগরিকের মুখে শুনি—

'সেদিন নেইরে
যেদিন পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ।
ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।'

এরপর যখন শোনা যায় রাজা নিজেও হাত লাগিয়ে পারেননি চাকা নড়াতে এবং বণিককে ডাকা হয়েছে রথচক্র সচল করতে, প্রথম সৈনিক বলেছে,

'রথ যদি চলে বেনের টানে
তবে গলায় অস্ত্র বেঁধে জলে দেব ডুব।'

তৃতীয় সৈনিক বলেছে—

'এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে,
পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।'

কিন্তু ধনপতিও যখন ব্যর্থ হয়, সর্বনাশের আশঙ্কা তার মনেই সবচেয়ে আগে আসে, সেটাই স্বাভাবিক। সে বলে,

'আজ যারা চোখে পড়ে না
কাল তারা দেখা দেবে সবচেয়ে বেশি।'

এবং দিয়েওছে তাই। শূদ্রদল ছুটে আসছে শুনে মন্ত্রী সবচেয়ে বুদ্ধিমান সত্য-দ্রষ্টার মতো কথা বলেছেন—

'বাধা দিয়ো না ওদের।
বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।'

শেষ পর্যন্ত ওরাই পেরেছে কালের রথচক্র সচল রাখতে। আমাদের দেশে অবশ্য সে অবস্থার সৃষ্টি এখনো হয়নি, বণিক সভ্যতার অগ্রগতিই আমরা দেখেছি। কিন্তু শ্রমজীবীর মধ্যে চেতনার লক্ষণ ধীরে ধীরে যে ভাবে দেখা দিচ্ছে তাতে সামাজিক এই বিবর্তনও অসম্ভব নয় বলেই আমাদের মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজে সাধারণভাবে ভাববাদী ও সৌন্দর্যবাদী কবি হয়ে এই বস্তু-বাদী চিন্তার সঙ্গে কেমন করে পরিচিত হয়েছিলেন ও তাকে নিজের শিল্পকীর্তির সত্য করে নিয়েছিলেন, এই চিন্তা যদি আমাদের বিস্মিত করে, তবে আমরা অভিভূত হবো এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি। শ্রমজীবী মানুষ সমাজের কর্তৃত্ব হাতে তুলে নিলেই সমাজের বিবর্তন বন্ধ হয়ে যায় না, সে দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল। কালের প্রবাহে অধিকারের খাতবদল হয়, কিন্তু সমাজে মানববন্ধন থাকলে সে কালের রথ এমনিই চলে—অধিকার যার হাতে সে যখন ভাবে আমিই চালক, অনর্থ তখনই ঘটে। শ্রমজীবী মানুষের হাতেও এ অনর্থ ঘটবে—

'একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই।
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।'

অন্তত এই চিৎকৃত ভাষণগুলি আমাদের দেশে এবং আমাদের কালেই কারো কারো শোনা বলে মনে হতে পারে, যা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন আজ থেকে অনেক বছর আগে।

এবার রূপক-সাংকেতিকের লক্ষণ মিলিয়ে বিচার করলেই আমরা দেখতে পাবো, প্রথমত, একটা মোটামুটি স্পষ্ট প্রতিরূপ এই আখ্যানের আছে, মানে এই রূপকথা-সুলভ আপাতকাহিনীর।

দ্বিতীয়ত, আমাদের এই কাহিনী এবং নেপথ্যকাহিনীর ব্যাপারটা বুঝে নিতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না, যদিও দাঁড়, রাস্তা, পথ, গর্ত প্রভৃতিকে প্রায় সংকেতের মতো ব্যবহার করা হয়েছে। আসলে, এই বায়বীয়প্রায় নাটকে নারী চরিত্রগুলিই জীবন্ত এবং বাস্তব। তারা যে আচার-অনুষ্ঠানকেই ভক্তি বলে মনে করে, সংস্কারকেই দেবতাজ্ঞানে পুজো করে, এই ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠা করার জন্যই ওই বস্তু গুলির ব্যবহার, প্রতীক হিসাবে ততোটা নয়।

তৃতীয়ত, এই নাটকের আবেদন যতোটা না হৃদয়ের কাছে, ততোটা যে বুদ্ধির কাছে, এ কথা রবীন্দ্রনাথের অতিবড়ো ভক্ত-সমালোচকও অস্বীকার করতে পারবেন না।

চতুর্থত, রূপক নাটক বলেই 'কালের যাত্রা' অথবা আরো সঠিক অর্থে 'রথের রাশি' নাটকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার পর তা দর্শক বা পাঠকের কাছে সরলতর ও সহজগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। সাংকেতিক নাটকের ব্যাখ্যা নাটককে এতো প্রাঞ্জল করতে পারে না।

পঞ্চমত, নাটক সমাপ্ত করে যে তৃপ্তি আমরা পাই, তাও প্রমাণ করে এই নাটকের শ্রেণী রূপকই, সাংকেতিক নয়।

● একটি বাংলা সাঙ্কেতিক নাটক

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'কে আমরা বিশ্লেষণের জন্য গ্রহণ করতে পারি রূপক, সাংকেতিক অথবা তত্ত্বনাটক—নাটকের কোন্ শ্রেণীতে এর স্থান হতে পারে, এ বিষয়ে সুধী পণ্ডিতদের মধ্যেই মতভেদ আছে। আমরা এই নাটককে সাংকেতিক নাটক হিসাবেই চিহ্নিত করতে চাই এবং কেন তা চাই তার কারণগুলি অবশ্যই উল্লেখ করবো কিন্তু তার আগে পুনর্বার স্মরণ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের নাটকে রূপক ও তত্ত্ব অনেক সময়ই এমন ভাবে জড়িয়ে থাকতে পারে যে তাঁর সাংকেতিক নাটককেও আমরা পুরোপুরি রূপক-বর্জিত বা তত্ত্বনিরপেক্ষ হয়তো বলতে পারি না। আসলে নাটকে কোন ব্যাপারটা প্রাধান্য পেয়েছে এবং রসপরিণতিতে তা ঠিক কী ধরনের আবেদন সৃষ্টি করেছে সেটাই প্রধান কথা।

'রক্তকরবী' নাটকের দৃশ্যপট একটিই—মাটির তলায় শ্রমিকরা সোনা খননের কাজে যেখানে নিযুক্ত আছে, সেই যক্ষপুরী। এর কালসীমা সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও নেই এবং সেই কারণেই এ নাটকে কালের মাত্রা যে এক অভিনব ব্যাপ্তি লাভ

করেছে এ বিষয়ে কবি-সমালোচক শ্রী শঙ্খ ঘোষের মনোজ্ঞ আলোচনা আমাদের অনেকেরই পড়া আছে। নাটকের কাহিনী বলতে সঠিক ভাবে কিছু নেই, অন্তত প্রথাগত ভাবে যাকে আমরা নাট্যকাহিনী বলে থাকি। তার ওপর যে কাহিনী আছে তাতেও রহস্যময়তা প্রচুর। যক্ষপুরীতে যারা কাজ করেছে তারা যে এককালে মাটির ওপরে ফসল ফলাতো, অর্থাৎ তারা ছিল কৃষক, এ কথা বোঝা যায়। অবশ্য এখন নামটাম ভুলে তারা অনেকেই পরিণত হয়েছে সংখ্যায়। সোনার মাদকতায় ভুলিয়ে, ধর্মের নেশা ধরিয়ে তাদের যন্ত্রের মতো কাজ করানো হয়; কিন্তু সামান্য কেউ কেউ এর মধ্যে ব্যতিক্রম—যেমন ৬৯ ঙ সংখ্যাধারী বিশু পাগল। সে তার দুঃখসাধনার কথা ভুলতে পারে না। যক্ষপুরীতে ঢুকেছে প্রাণময়ী এক নারী, নন্দিনী। যক্ষপুরীর রাজা, যিনি জালের আড়ালে থেকে নিষ্প্রাণ দৃঢ়তায় যক্ষপুরীর সমস্ত কাজকর্ম পরিচালনা করেন, তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করাই 'ঈশানী পাড়ার' নন্দিনীর ব্রত। সে জানে এ কাজে সে সহায়তা পাবে রঞ্জনের, যে যক্ষপুরীতে ঢুকে পড়েছে—এই খবর তার জানা আছে। নাটকের একেবারে শেষে রাজা নিজেই জালের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখা যায় জালের মধ্যে মৃত রঞ্জন পড়ে আছে। রাজা বুঝতে পারেন নিজের ভুল, বলেন—"আমি যৌবনকে মেরেছি—এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি।" তারপর আমরা দেখি নিজের বিরুদ্ধে নিজেই লড়াই করবার জন্য ধ্বজা ভেঙে ফেলে রাজা পথে বেরিয়ে পড়েছেন।

কাহিনীর এই সংক্ষিপ্ত আভাস থেকেই বুঝতে পারা যাবে, এখানে সমান্তরাল কাহিনীর প্রশ্ন দূরে থাক, ঠিকমতো বলতে গেলে আপাতগ্রাহ্য কোন বাইরের কাহিনীই গড়ে ওঠেনি। নন্দিনী কেন যক্ষপুরীতে আসে, রঞ্জন তার সঠিকভাবে কে হয়, রাজার এই জাল ছিন্ন করা এবং তা থেকে তাঁকে উদ্ধার করার দায়িত্ব সে কেন নেয়, যক্ষপুরীর প্রায় প্রত্যেকটি শ্রমিককেই সে কেন চেনে, যক্ষপুরীর ভেতরে বসে সে বার বার ফসলকাটার গান কেন গায়, এ সব কিছুই আমাদের কাছে রহস্য হয়েই থাকে। এর কাহিনী আমাদের অনেক কিছুর দিকে ইঙ্গিতে ডাক দিয়ে যায় বটে, কিন্তু স্পষ্ট করে যেন কিছুই বলে না। এই সুস্পষ্ট আপাতকাহিনীর অভাবও সমান্তর দ্বিতীয় কাহিনীর অভাব একদিকে যেমন রূপক নাটক হিসাবে একে অভিহিত করবার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়, অন্যদিকে সাংকেতিক নাটক হিসাবে এর দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করে—কারণ এমন এক রহস্যময়তা এই কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে যাতে লেখকের অনির্বচনীয় এক অনুভব এর মধ্য থেকে আভাসিত হয় অথচ সঠিকভাবে ধরা দেয় না। একেই যে সংকেতের প্রাণ বলা যায়, সিমন্সের পূর্বোল্লিখত মন্তব্য স্মরণ করলেই তা বোঝা যাবে।

দ্বিতীয়, রক্তকরবীর ব্যাখ্যা সঠিকভাবে করা যায় না, বেশি ব্যাখ্যা করতে গেলে এর সৌন্দর্যহানি ঘটবে মনে করেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাবধান করে দিয়ে বলেছেন,

রক্তকরবীর পাপড়ির আড়ালে অর্থ খুঁজতে গেলে অনর্থ ঘটবে। তিনি শুধু মনে রাখতে বলেছেন, এটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি। গল্পাংশ এখানে নিটোল হয়নি তা নিটোল করা সম্ভব নয় বলেই। কিন্তু রক্তকরবীর মঞ্জরী, জালের আবরণ, ধ্বজাপূজার ধ্বজা ইত্যাদি প্রতীক এখানে যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যে যায় না, এই সত্যই ইঙ্গিত করে এটি সাঙ্কেতিক নাটক হতে পারে।

তৃতীয়ত, এ কথা না মেনে উপায় নেই যে, 'রক্তকরবী' নাটকের যদি কোন আবেদন থাকে তবে তা হৃদয়ের কাছে, বুদ্ধির কাছে নয়। বার বার পাঠ করলে বা একটি অত্যন্ত মনোযোগী পাঠে আমরা এর ব্যঞ্জনা বা গভীর অর্থের কিছুটা হয়তো অনুভব করতে পারি কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে এর কাছে পেঁছিনো প্রায় অসম্ভব বলেই আমাদের মনে হয়।

চতুর্থত, 'রক্তকরবী' নাটক ব্যাখ্যা করার অনেক চেষ্টা সমালোচকগণ করেছেন। কেউ বলেছেন আমেরিকার ধনতন্ত্রের স্বরূপ দেখে ব্যথিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে যক্ষপুরীর সঙ্গে তুলনা করেছেন, কেউ বলেছেন এই নাটকে আমরা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের এক কল্পিত চেহারা দেখতে পাই—এ ব্যাপারে আতঙ্কিত হয়েই কবি এ নাটক লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভাবে এই নাটক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন—কখনো বলেছেন এটি কর্ষণজীবী সভ্যতার সঙ্গে আকর্ষণজীবী সভ্যতার দ্বন্দ্ব, কখনো বলেছেন এটি আসলে রামায়ণেরই আধুনিক রূপ, এই নাটকের রাজা এক দেহে রাম ও রাবণ। এই নাটককে মানবিক সংকট এবং মানবিক ভাবনার নাটক হিসাবেও কেউ কেউ ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি এই নাটকের পক্ষে একটি মানবিক ব্যাখ্যাই সংগত। কিন্তু এই যে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন ভাবে এর ব্যাখ্যা করেন, কেউ সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হন না এবং আমরা কোন ব্যাখ্যাতেই যেন নাটকের নিহিতার্থ সম্পূর্ণ করে পাই না, রবীন্দ্রনাথ যে বার বার এই নাটকের ব্যাখ্যা করতে নিষেধ করেন, আমরা যতো ব্যাখ্যা করি ততোই নাটকের প্রকাশিত রূপের চেয়ে তা অসুন্দর হয়ে পড়ে—এই যাবতীয় ঘটনাই প্রমাণ করে এই নাটকের প্রকৃতি সাঙ্কেতিক, রূপক নয়।

পঞ্চমত, এই নাটক সমাপ্ত করার পর পরম তৃপ্তিতে আমরা সমাচ্ছন্ন হতে পারি না। রাজা কেমনভাবে নিজের বিরুদ্ধে লড়াই-এ যোগ দিতে চলে যান, সবাই শেষ পর্যন্ত নন্দিনীর জয়ধ্বনি দেয় বলে কেন, নন্দিনীর কাজ সমাপ্ত করবার জন্য বিশু পাগল তার রক্তকরবীর কঙ্কন কেন হাতে তুলে নেয়—তার গভীর ব্যঞ্জনা আমাদের মনের মধ্যে গিয়ে বাজতে থাকে, কিন্তু রূপকের মতো স্বচ্ছ ব্যাখ্যায় তা আমাদের বুদ্ধিতে ধরা দেয় না। তাই আমরা বুঝতে পারি এ নাটক আরো বহুদিন আমাদের মনোরম অতৃপ্তিতে ভরিয়ে রাখবে—বিশু পাগলকে তার দুখজাগানিয়া যেমন জাগিয়ে রেখেছিল, আমাদেরও এ নাটক জাগিয়ে রাখে। সুতরাং সমস্ত দিক বিবেচনা করে একে সাঙ্কেতিক নাটক বলা ছাড়া কোন উপায় নেই বলেই আমাদের মনে হয়।

দ. আন্দোলনে উদ্ভূত কিছু বিশিষ্ট শ্রেণী

সাংকেতিক নাটককে সঠিকভাবে আন্দোলনভিত্তিক নাট্যশ্রেণীর অন্তর্গত মনে করাই সংগত হতো বোধহয়। বাস্তবতাবাদী নাটকের স্থূল বাস্তবকে অনুসরণের প্রতিক্রিয়াতেই উনবিংশ শতকের শেষের দিকে সাংকেতিক নাটকের উদ্ভব ঘটেছিল। ইংরেজি সাহিত্যে ইয়েটস্, জার্মান নাট্যকার হাউপ্টমান এবং কিছু আইরিশ নাট্যকারের অবদান এক্ষেত্রে স্মরণীয় হয়ে আছে। অবশ্য নিছক গদ্য ভাষায় নাটক লিখেও যে সাংকেতিক ব্যঞ্জনা রবীন্দ্রনাথ আনতে পেরেছিলেন তাতে সাংকেতিক নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের অবদানকেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে হবে।

বাস্তবতাবাদী নাটকের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। আবেগের চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে বেশি করে আশ্রয় করা, বাস্তব সংসারকে সাহিত্যের বৃত্তে নিয়ে আসা এবং সামাজিক চেতনাকে প্রাধান্য দেওয়া বাস্তবতাবাদী নাট্য-আন্দোলনের কয়েকটি প্রধান দিক। দার্শনিক পরিমণ্ডলে উদ্ভূত এই আন্দোলন সাহিত্য জগতে আসে প্রধানত গুস্তাভ ফ্লবেয়রের 'মাদাম বোভারী' উপন্যাসের মাধ্যমে, পরে ইবসেনের 'দি ডল্‌স্ হাউস', ইউজিন ও'নীলের নাটক এবং অবশ্যই বার্নার্ড শ-এর অবিস্মরণীয় নাটক এই ধারায় রচিত হয়।

আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত নাটকের মধ্যে **ক্ল্যাসিক নাটকের** নাম আমরা করতে পারি, যার মধ্যে স্পষ্ট দুটি উপবিভাগ করা যেতে পারে, প্রাচীন ক্ল্যাসিক নাটক এবং নব্য ক্ল্যাসিক নাটক। সব রকম নিয়মকানুন এবং বিধিনিষেধ দৃঢ়ভাবে মেনে চলাই ক্ল্যাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য। আবার এই শৃংখলার বাড়াবাড়িতে জন্ম নেয় সব রকম রীতিনীতি লঙ্ঘন করার প্রবণতা থেকে উদ্ভূত **রোম্যান্টিক নাটক**। ইংল্যাণ্ডে ও স্পেনেই এই ধরনের নাটকের জনপ্রিয়তা বেশি দেখা যায়, বাংলা নাটকেও রোম্যাণ্টিক মানসিকতার পরিচয় কিছুটা বেশি ধরা পড়েছে বলেই আমাদের মনে হয়।

এক্সপ্রেশনিস্ট বা অভিব্যক্তিবাদী নাটকের উদ্ভব ঘটে মোটামুটি ভাবে বর্তমান শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে (১৯১৫—১৯২৫), যদিও এই আন্দোলনের উদ্ভবের সঙ্গে পূর্বসূরী স্ট্রিণ্ডবার্গের নাম উল্লেখ করতেই হবে। বাস্তবতার প্রতিক্রিয়াতেই এই আন্দোলনের উদ্ভব। বস্তুজগৎকে শিল্পী নিজের মানসিকতায়—তা যতোই আবেগময় বিক্ষুব্ধ বা অস্বাভাবিক হোক না কেন, দেখে থাকেন এবং সেই ভাবেই এই ধরনের নাটক রচনা করেন। জার্মান নাট্যকার জর্জ কাইজার, আর্নস্ট্ টলার এবং বারটোল্ট ব্রেখ্ট্-এর নাম উল্লেখ করতে হবে।

অ্যাবসার্ড নাটক বা থিয়েটার অব দি অ্যাবসার্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাহিত্যজগতের অন্যতম বিশিষ্ট নাট্য-আন্দোলন। এর উৎস খুঁজতে গেলে হয়তো অনেক পেছনে সরে যাওয়া সম্ভব, তবে আমাদের মনে হয় প্রকৃত অর্থে উনিশ শতকের ফরাসী নাট্যকার অ্যালফ্রেড জারি-কেই এর পথিকৃৎ বলা সংগত। এই ধরনের নাটকে কোন সুগ্রথিত প্লট থাকে না, তেমন নাটকীয়তাও থাকে না—বরং

জীবন সম্বন্ধে আপাত অবহেলা বা অশ্রদ্ধার ভাবই ফুটে ওঠে পরস্পর-অসংলগ্ন অবাস্তব কিছু ঘটনার সজ্জায়। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে একটি গভীরতর বাস্তববোধই এই জাতীয় নাটককে নিয়ন্ত্রিত করে। ইউজিন আয়োনেস্‌কো-র নাম এই আন্দোলনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। সেই সঙ্গেই উল্লেখ করতে হবে স্যামুয়েল বেকেট-এর 'ওয়েটিং ফর গেডো'-নাটকটির কথা। বাংলা নাটকে এর শ্রেষ্ঠ রূপকার সম্ভবত মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'ক্যাপ্টেন হুররা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—অবশ্য প্রথম সাড়া জাগিয়েছিল বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি।

ক. উপন্যাসের সাধারণ পরিচয়: বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব—মানুষের জীবনকথা শোনার প্রাথমিক আগ্রহ—উপন্যাসের জীবনদর্শন—ঔপন্যাসিকের বক্তব্য—সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপের অভাব। খ. উপন্যাস ও নাটক: উপন্যাসকে 'পকেট থিয়েটার' বলা হয় কেন—উপন্যাসের বেশি জনপ্রিয়তার কারণ—নাটক ও উপন্যাসের সাধারণ উপাদান—উপন্যাসের বিশেষ উপাদান। গ. উপন্যাসের বৃত্ত: সাধারণ পরিচয়—গল্প ও বৃত্তের পার্থক্য—এই পার্থক্য স্পষ্ট করার জন্য কিছু উপন্যাসের আলোচনা—বৃত্তের সাধারণ বিভাগ—সরল বৃত্ত—জটিল বৃত্ত—যৌগিক বৃত্ত। ঘ. উপন্যাসের চরিত্র: চরিত্রচিত্রণের গুরুত্ব—বৃত্ত ও চরিত্রের আপেক্ষিক প্রাধান্য—কিছু উপন্যাস অবলম্বনে বিচার। ঙ. উপন্যাসের উদ্ভব: প্রেক্ষিত ও পূর্বসূত্র: প্রেক্ষিতের বিচার—রোমান ও নভেল্লা—পিকারেস্ক নভেল। চ. নভেল ও রোম্যান্স: রোম্যান্স সম্বন্ধে ভুল ধারণার উৎস—রোম্যান্সের সঠিক লক্ষণ ব্যাখ্যার বিভিন্ন দিক—রোম্যান্সের শ্রেণীবিভাগ ও তার পরিচয়—একটি কাব্যিক রোম্যান্স হিনাবে 'কপালকুণ্ডলা'র সার্থকতা-বিচার। ছ. উপন্যাসের শ্রেণীবিচার: সাধারণ আলোচনা—নভেলের প্রকৃতিগত বিভাগ—নভেলের বিষয়ভিত্তিক বিভাগের উপযোগিতা—বিষয়ভিত্তিক বিভাগের বৈশিষ্ট্য বিচার। জ. ঐতিহাসিক উপন্যাস: সাধারণ আলোচনা—একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের সার্থকতা বিচার। ঝ. সামাজিক উপন্যাস: সাধারণ আলোচনা—একটি সামাজিক উপন্যাসের বিচার: ঞ. রাজনৈতিক উপন্যাস: সাধারণ আলোচনা—একটি রাজনৈতিক উপন্যাসের তাৎপর্য নির্ণয়। ট. আঞ্চলিক উপন্যাস: সাধারণ আলোচনা—একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ। ঠ. মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস: এর বিচার ও শ্রেণীভুক্তিকরণ সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর কেন—একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ। ড. বিষয়ভিত্তিক অন্যান্য শ্রেণী: সাধারণ আলোচনা—কারা-উপন্যাস—অন্যান্য—উপসংহার।

ক. উপন্যাসের সাধারণ পরিচয়:

উপন্যাস আধুনিক জীবনের গদ্যকাব্য। এক তীব্র জীবনমুখিতা ও বাস্তবনিষ্ঠতা এর উপজীব্য বলেই আধুনিক কাল ছাড়া উপন্যাসের উদ্ভব ঘটা সম্ভব ছিল না। বাংলা উপন্যাসের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস সন্ধান করতে গিয়ে শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মধ্যযুগীয় সাহিত্যে তার উৎসমুখ নির্দেশ করলেও, আমরা মোটামুটি ভাবে নিঃসন্দিগ্ধ যে আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসা জাগ্রত হবার আগে উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না। তিনি অবশ্য একটা কথা একেবারে ঠিক বলেছেন, ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের দেশে যে-সব নতুন ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রধানতম হল উপন্যাস। উপন্যাসের আবির্ভাবের জন্য আরো যে দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপরিহার্য ছিল তারা হল, বাস্তবতাবোধ এবং ব্যক্তিত্ববোধ। এই দুটি মানসিক গুণের বিকাশ ভিন্ন উপন্যাসের উদ্ভব, অন্তত প্রকৃত উপন্যাসের, সম্ভব নয়।

মানুষের জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ এবং সেই জীবনকে সাহিত্যের বিষয় হিসাবে দেখবার আগ্রহ—এক কথায় বলা যায় মানুষের জীবনের গল্প শুনবার উৎসাহ থেকেই উপন্যাসের জন্ম। ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিক ড্যানিয়েল ডিফোর উপন্যাসকে বলা হয়েছে 'truth-teller', বলা হয়েছে 'narrative realism', স্যামুয়েল রিচার্ডসনের রচনার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'A faithful and chaste copy of real life and manners.' বাংলা সাহিত্যে প্রথম দিকের যে-সব ঔপন্যাসিক প্রয়াস গড়ে ওঠে সেখানেও আমরা সমকালীন জীবনাগ্রহই বেশি লক্ষ করেছি। কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'-র দুটি খণ্ডে অবশ্য নক্সাই রচনা করেছিলেন, কিন্তু তৎকালীন জীবনের বাস্তব রেখাচিত্র সেখানে ধরা পড়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা চলে, যদিও এই রচনাটি প্রকৃতিতে উপন্যাসের খুবই কাছাকাছি। শ্রীমতী মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাতেও জীবনাগ্রহ আমরা স্পষ্টভাবেই লক্ষ করি।

বরং তুলনামূলক ভাবে যেন মনে হয় সমকালীন জীবন ও মানুষের প্রতি বঙ্কিম-চন্দ্রের আগ্রহই বুঝি কিছুটা কম ছিল, নইলে প্রথম উপন্যাসেই তিনি আশ্রয় করবেন কেন ইতিহাসের তুষারাবৃত অতীত, অথবা দ্বিতীয় উপন্যাসেই এমন এক কাব্যিক বা তাত্ত্বিক বিষয় যার সঙ্গে অন্তত চোখে দেখা জীবনযাত্রার বিশেষ কিছু মিল নেই। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এই গ্রন্থ নয়, শুধু এটুকু বলাই এখানে যথেষ্ট হবে যে, প্রথম পর্বে উপন্যাসের মাধ্যমে আমার গল্প শুনতে চেয়েছি—এমন আধুনিক স্বাদের গল্প যা ভগবদ্‌বিশ্বাসচর্চিত নয়, রূপকথার অপ্রাপ্ত-মনস্ক অবাস্তব কাহিনী নয়, আধুনিক মানুষকে তৃপ্ত করার মতো এক সাহিত্য-প্রকরণ, ইংরেজিতে প্রথম পর্বে যাকে বলা হতো story-teller। তবু কী গুণে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা story-teller নয়, উপন্যাস, তার দুটি প্রধান দিক হল তাঁর বিশিষ্ট জীবনদর্শন, জীবনদর্শনের সমগ্রতা এবং সুস্পষ্ট বক্তব্য—তবু এর সঙ্গে অবশ্যই অন্বিত হবে তাঁর সুগভীর বাস্তবতাবোধ এবং পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা উৎপাদনের ক্ষমতা। বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ করেই উপন্যাসের এই বিশেষ গুণগুলিকে সংক্ষেপে চিনে নেওয়া যেতে পারে।

উপন্যাসের বিশিষ্ট জীবনদর্শন বলতে আমরা বুঝি জীবনকে দেখবার এক মৌলিক জীবনদৃষ্টি, ইংরেজিতে যাকে বলা হয়েছে attitude towards life জীবনকে দেখবার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতেই বার বার পালটে যায়—পল্লীজীবনের কাহিনী কখনো পাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিস্ময়মুগ্ধতা, কখনো শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজের কর্কশ বীভৎসতা, কখনো বা বিভূতিভূষণের রোম্যান্টিকতা—কিন্তু কখনোই বাস্তবতাকে ক্ষুন্ন না ক'রে। এই ব্যাপারটাই আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, বাস্তবকে আহত না করেও জীবনদৃষ্টির ভিন্নতার জন্য একই জিনিস আমরা

বিভিন্ন ভাবে দেখতে পারি এবং পালটে যেতে পারে তার আস্বাদ। পালটেছেও তাই, বিধবার একমাত্র পুত্র—এই ব্যাপারটি দীর্ঘকাল বাংলা কথাসাহিত্যে আমাদের অশ্রু আকর্ষণ করে এসেছে, জগদীশ গুপ্তের গল্পে তা ব্যঙ্গের উপকরণে পরিণত হয়েছে; ধীবর শ্রেণীর জীবনসংগ্রাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমরেশ বসু, দুজনেরই রচনার বিষয় হয়েছে এবং কঠোর ভাবে বাস্তবতা রক্ষা করা সত্ত্বেও তাঁদের রচনার স্বাদ পৃথক হয়েছে জীবন-দৃষ্টির ভিন্নতার জন্যই।

জীবনদর্শনের সমগ্রতা বা totality of life এমন একটি বস্তু যা উপন্যাসকে শুধু যে আংশিকতার দোষ থেকে মুক্ত করে তাই না, তাকে ঔপন্যাসিক মহত্ত্বে উন্নীত করে। একটি চরিত্রের বিচ্ছিন্ন আচরণের বিবৃতি যেমন তার খণ্ডিত পরিচয়মাত্র, সামগ্রিকভাবে এবং অখণ্ডভাবে চরিত্রটি সম্পর্কে ধারণাই যেমন প্রকৃত চরিত্রকে বোঝাতে পারে, তেমনি একটি আধুনিককালের খণ্ডচিত্র থেকে লেখক জীবনদর্শনের সমগ্রতায় উপনীত হতে পারেন, অথবা বিশেষ কালের কোন ঘটনা দেখেও তাতে জীবনদর্শনের অখণ্ডতা খুঁজে পেতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাই পেয়েছিলেন, তাই 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম' নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে জীবনদর্শন আমরা খুঁজে পাই, 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামক সাময়িক জীবনচর্যাতেও তার ব্যত্যয় আমরা দেখিনা।

জীবন সম্বন্ধে লেখকের নিজের একটা ব্যাখ্যা থাকে, থাকতেই হয়, উপন্যাসকে যদি সত্যিই উপন্যাস হয়ে উঠতে হয়। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থে শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—'আত্মহীন দেহ যদি বা সম্ভব, বক্তব্যহীন উপন্যাস কদাচ সম্ভব নয়। বক্তব্যহীন উপন্যাস উপন্যাসই নয়।' এই বক্তব্য অবশ্যই প্রচ্ছন্ন থাকবে, যেটা বঙ্কিমচন্দ্র অনেক সময়ই রাখতে পারেননি—'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে একটি গোটা পরিচ্ছেদই ব্যয় করেছেন জীবন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তা করেননি, তবু 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-য় তাঁর বক্তব্য বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না, যেমন হয় না তারাশঙ্করের 'গণ-দেবতা' উপন্যাসের বক্তব্য বুঝতে বা বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' পড়ে জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বুঝে নিতে।

উপন্যাস সম্বন্ধে সাধারণভাবে ধারণা গঠন করতে হলে আর একটা কথা জেনে রাখা অত্যন্ত দরকার যে, উপন্যাসের কোন সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ (art form) বোধহয় এখনও নির্ণীত হয়নি। রিচার্ডসনের হাতে ইংরেজি উপন্যাসের যে সূচনা ঘটেছিল সেই 'পামেলা' রচিত হয়েছিল পত্রাকারে। এরপর সার্থক উপন্যাসের আরো কতো রূপান্তর আমরা লক্ষ করি, এবং তার প্রত্যেকটিকেই স্বীকার করে নিতে আমরা বাধ্য হই। অর্থাৎ নাটকের যেমন এক বিশেষ শিল্পরূপ আছে, কবিতা-বিচারের শুধু বিষয়গত নয়, আঙ্গিক মানদণ্ডও কিছু আছে—উপন্যাসের সম্বন্ধে ঠিক সে ধরনের স্পষ্ট নির্দেশ কিছু নেই। আসলে সে তো উপন্যাসের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও

নেই। সামারসেট মম দশটি বিখ্যাত উপন্যাসের যে সংকলন প্রকাশ করেন এবং তার যে ভূমিকা লেখেন সেই দুটিই বিখ্যাত হয়ে আছে এই কারণে যে, উপন্যাসগুলি প্রকৃতিতে এতোই পৃথক যে একটিকে উপন্যাস বললে অপরটিকে তা বলা শক্ত হয়ে পড়ে ; সে কথা ভূমিকাতে কৌতূহলোদ্দীপকভাবে তুলে ধরেছেন সংকলক। শিল্প-রূপ সম্বন্ধেও সেই একই কথা। আজও কোনও উপন্যাস সম্বন্ধে যখন তার উপন্যাস-প্রকৃতি বিষয়ে বিতর্ক ওঠে—যেমন বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', আমরা বুঝতে পারি তা মূলত তার বিচিত্র শিল্পরূপের জন্যই।

উপন্যাসের এই সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপের অভাব ঘটেছে মূলত দুটি কারণে। প্রথমত অনেক ব্যাপক অর্থে ও বিস্তৃত পটে জীবনকে ধরার চেষ্টা করেছে উপন্যাস। জীবনের এই বৈচিত্র্যের জন্য বিষয়ের মতোই, তার শিল্পরূপে নানা রকমের বৈচিত্র্য ঘটে গেছে যাদের কোনটিকেই অস্বীকার করা পাঠক ও সমালোচকের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, কোন বিশেষ রূপজিজ্ঞাসার অতৃপ্তি থেকে উপন্যাস নামক প্রকরণটির সৃষ্টি হয়নি, যেমনটি কোন কোন সাহিত্যিক আন্দোলনে ঘটে থাকে বলে আমরা জানতে পেরেছি। মূলত আধুনিক মানুষের গল্প শোনা এবং গল্পের সেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যই উপন্যাসের জন্ম, তাই শিল্পরূপের ব্যাপারে কোন অতৃপ্তি পাঠকের জাগেনি।

খ. উপন্যাস ও নাটক :

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে উপন্যাস ও নাটকের মৌলিক উপাদান একই—সেই কাহিনী, চরিত্র এবং মানবিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি উৎসাহ। আসলে বোধহয় উপন্যাস তার উদ্ভবের জন্য অনেকটাই দায়ী নাটকের কাছে। উপন্যাসের উদ্ভবের পর নাটকের চেয়ে তার জনপ্রিয়তার দ্রুত বৃদ্ধিটাও অস্বাভাবিক নয়। কারণ নাটক প্রকৃতিগত ভাবেই একটি মিশ্র শিল্প। কেউ শুধু পড়বার জন্য নাটক কেনে না, কিনলেও সে নাটকের জাত আলাদা ; নাটকের সাফল্য নির্ভর করে তার অভিনয় মঞ্চসজ্জা, আলোক-সজ্জা ইত্যাদি অনেক কিছুর ওপর। খুবই স্বাভাবিক, নাটক শিল্প হিসাবেও বস্তুগত। কিন্তু উপন্যাস প্রকৃতিতেই অনেকটা আত্মগত এবং নাটকের মতো বাইরের অন্য কিছুর ওপরই নির্ভরশীল নয়। অথচ নাটকের অনেক কিছুই তার আছে। সম্ভবত সেই করণেই মারিয়ন ক্রফোর্ড একে আখ্যা দিয়েছিলেন 'পকেট থিয়েটার'। কথাটি উপন্যাসের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক খুঁজতে গেলে মনে রাখাটা খুবই দরকারী। কারণ নাটকের মতো উপন্যাসের উপভোগ্যতার এতো প্রতিবন্ধকতা নেই—সাহিত্যকের নিজস্ব সৃষ্টি ছাড়াও অন্যান্য এতো কিছুর ওপর উপন্যাসকে নির্ভর করতে হয় না, তার একমাত্র অভাব প্রত্যক্ষ দর্শনের, কল্পনায় সেটা তাকে পুষিয়ে নিতে হয়।

নাটক অপেক্ষা উপন্যাসের জনপ্রিয়তা এবং দ্রুত এই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির আর একটা কারণ হল, সাহিত্য-প্রকরণের মধ্যে নাটক সবচেয়ে বিধিবদ্ধ প্রকরণ, নিয়ম-কানুন একেবারে সুদৃঢ়ভাবে বাঁধা। অন্যদিকে উপন্যাস, অন্তত আঙ্গিকের দিক থেকে, সবচেয়ে শিথিল ধরনের প্রকরণ। এর মানেই অবশ্যই এই নয় যে নাটকের চেয়ে উপন্যাসে লেখা সহজ, বরং এর উল্টোটাও হতে পারে—নাটকের বাহ্যিক কিছু নিয়ম-কানুন আছে বলেই তার সুযোগ নিয়ে নাটকের চেহারা অন্তত কেউ খাড়া করতে পারে ; আসল কথাটা হল এই যে উপন্যাস রচনায় কারো এগিয়ে আসাটা সহজ বিশেষ প্রস্তুতি ছাড়াই, সাফল্যের প্রশ্ন পরে।

নাটক ও উপন্যাসের উপাদান, বিষয়বস্তু, উপস্থাপন-ভঙ্গি ইত্যাদিতে অনেক মিল আছে বলেই আমরা, সব সময় সঠিক চিন্তা ভাবনা না করেই অবশ্য নাটকের সঙ্গে অন্বিত কিছু পরিভাষা বা বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের ওপর চাপিয়ে দিই বা সেই সূত্রেই তাদের বিচার করি। যেমন কোন উপন্যাসকে আমরা ট্র্যাজেডি হয়েছে কিনা ভাবতে বসি, তার মধ্যে নাটকীয় বা অতিনাটকীয়তা খুঁজি, অথবা নাটকীয়তা কেমন আছে বিচার করি—যদিও একথা কখনো ভাবি না, যে উপন্যাসের মধ্যে 'নাটকীয়' লক্ষণ থাকাটা তার পক্ষে যুক্তিযুক্ত কিনা। এ প্রশ্নের মীমাংসা এই গ্রন্থে করার প্রয়োজন নেই, আমাদের বক্তব্য, দুটি প্রকরণের মধ্যে আঙ্গিক বাদ দিয়ে প্রচুর সাদৃশ্য আছে বলেই এ হেন সমালোচনা এসে যায়। নাটকের ভাষায় বললে সেগুলিকে এইভাবে বিবৃত করা যায়।

প্রথমত, কিছু বা কোন একজন মানুষ কোনও মারাত্মক কাজকর্ম কিছু করে ফেলেছেন বা তার দ্বারা উদ্ভূত যন্ত্রণার শিকার হয়েছেন—সেই সব ঘটনা এবং কাজকর্মের বর্ণনাই আমরা নাটকে পাই, যাকে এক কথায় বলা হয় নাটকের প্লট বা বৃত্ত। দ্বিতীয়ত যাঁরা এই সব কাজকর্ম করেন বা এর প্রতিক্রিয়ায় আলোড়িত হন তাঁরাই হলেন নাটকীয় চরিত্র, বা শুধুই চরিত্র। তৃতীয়ত, চরিত্র যে বচনের দ্বারা তার আনন্দ-দুঃখ-বিস্ময় ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে থাকে তাকেই আমরা বলি সংলাপ। চতুর্থত, যেসব কাজকর্ম সংঘটিত হয়, নাটকের চরিত্রগুলি যে আনন্দ-বেদনায় আলোড়িত হন তার একটি নির্দিষ্ট সময় থাকে ; সে বিষয়ে সচেতনতাকে নাটকে বলা হয় কালগত ঐক্য—নাটকের ত্রিবিধ ঐক্যের অন্যতম যে কালের মাত্রা, আধুনিক কালে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পঞ্চমত, যাকে রচনার বা উপস্থাপনার ভঙ্গি ও বাচনশৈলি, অ্যারিস্টটল যাকে বলেছেন 'ডিক্‌শান'। এই যে পাঁচটি নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হল এখানে, তার প্রত্যেকটি উপন্যাসের অনিবার্য উপাদান এবং তারা প্রায় নাটকের মতো একই ভাবে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে উপন্যাসে। এর সঙ্গে অবশ্য আরো একটি বৈশিষ্ট্য উপন্যাসের আছে যা থেকে নাটক বঞ্চিত এবং যা থাকা নাটকের পক্ষে ক্ষতিকর। এটিকে বলা যেতে পারে, জীবনকে ঔপন্যাসিক ঠিক কীভাবে দেখেছেন তার প্রকাশ, এক কথায় Attitude

towards life বা জীবনদৃষ্টি। এটি অবশ্য সোচ্চার না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে তা স্পষ্ট ভাবেই বলে ফেলেছেন, 'বিষবৃক্ষের' মতো উপন্যাসে সে কথা বলার জন্য একটি গোটা পরিচ্ছেদই ব্যবহার করে ফেলেন—কিন্তু জগদীশ গুপ্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মতো সাহিত্যিকের সেই জীবনদৃষ্টি কম বেশি প্রচ্ছন্ন অথচ সুনিশ্চিত ভাবেই উপস্থিত। এই ব্যাপারটা সব শেষে উল্লেখ করা হলেও এটি উপন্যাসের প্রাণস্বরূপ, কোন সন্দেহ নেই তাতে। কেবলমাত্র এই একটি গুণেই কোন উপন্যাস মহৎ উপন্যাস হয়, কোন উপন্যাস তা হয় না। অরণ্যজীবন বা নাগরিক জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য আরণ্যক আশ্রয় অনেকেই খুঁজেছেন, কিন্তু হাডসনের 'গ্রীন ম্যানশন্‌স্' বা থোরু-র 'ওয়ালডেন' যে উপন্যাস হয় না, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' যে উপন্যাস হয়ে ওঠে তার প্রধান কারণ জীবনকে দেখার এই সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি। একই কারণে ধীবর সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ে লেখা দুটি উপন্যাসের মধ্যে সমরেশ বসুর 'গঙ্গা-'য় বাস্তবতার পরিচয় অনেক দৃঢ় ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও সমালোচকগণ মনে করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' মহত্তর উপন্যাস।

গ. উপন্যাস বৃত্ত :

নাটকের বৃত্তগঠনের যে স্পষ্ট নিয়ম আছে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেরকম কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা বিধিনিষেধ নেই। এই কারণে কিছু দুর্বলতাকে উপন্যাস-যেমন প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে, তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারটাও এই শিল্পপ্রকরণেই সম্ভব হয়েছে। একটা অসুবিধাই শুধু প্রধান হয়ে উঠেছে যে, উপন্যাসের বৃত্তের সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকায় তার আয়তনটাও আমাদের সহ্য করে নিতে হয়েছে এবং আয়তনভিত্তিক কোন আপত্তি আমরা তুলতে পারছি না। বঙ্কিমচন্দ্র তেমন দীর্ঘ কলেবরের উপন্যাস লেখেননি, কিন্তু পরবর্তীকালে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ লিখেছিলেন 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস নিয়ে এ প্রশ্ন সেকালে এবং একালে অনেকেরই মনে জেগেছে। 'দেখতে হবে জায়গা পেয়েছে না জায়গা জুড়েছে,' একথা বলে রবীন্দ্রনাথ আমাদের ক্ষোভের প্রশমন করতে পারেন নি। এই কিছুদিন আগেও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর 'ইস্পাতের স্বাক্ষর' উপন্যাসের শুধু দীর্ঘ কলেবরের জন্যই উল্লিখিত হতেন যদিও উপন্যাসটি অন্যান্য কারণেও মনে রাখবার মতো ; পরে বিমল মিত্রের বিশাল উপন্যাসগুলি তাঁর খ্যাতি লোপের কারণ হয়। উপন্যাসের কলেবরের জন্য সাময়িকপত্র বা সাহিত্যপত্রের দায়িত্বও কম নয়। রবীন্দ্রনাথকে মাসিক পত্রিকার দাবি মেটাবার জন্য কাহিনীকে দীর্ঘায়িত করতে হয়েছে, সে কথা তিনি নিজেই বলেছেন। আজও আমরা দেখি, সাময়িক পত্রিকায় পূজা-সংখ্যায় একবারে প্রকাশযোগ্য উপন্যাসের আয়তন ছোট হয়, ধারাবাহিকের আয়তন বড়ো হয়—

সম্পাদকদেরই অনুরোধে, উপন্যাসের নিজস্ব প্রয়োজনে অনেক সময়ই নয়। এ ব্যাপারটা সম্ভব হয় উপন্যাসের বৃত্তগঠনের নির্দিষ্ট নিয়ম নেই বলেই।

তবে সুনির্দিষ্ট না হলেও নিয়ম কিন্তু আছে। গল্প বলাই উপন্যাসের একমাত্র কাজ নয়, তা আমরা দেখেছি, এবং সেই জন্যই উপন্যাসের গল্প বা story-র সঙ্গে তার বৃত্ত বা plot-এর একটা স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা সম্ভব। এই পার্থক্যের প্রকৃতি অত্যন্ত সহজ ভাষায় আমাদের বুঝিয়েছেন E.M. Forster তাঁর অতিহ্রস্ব অথচ অতিখ্যাত গ্রন্থ Aspects of the Novel-এ। তিনি দেখিয়েছেন গল্প বলার সময় মানুষের কৌতূহলবৃত্তিকে তৃপ্ত করলেই চলে, কিন্তু বৃত্ত নির্মাণ করবার সময় তার যৌক্তিকতা বজায় রাখতে হয়, তাকে একটা কার্যকারণ-শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলতে হয়। গল্পের এই বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি করাই বৃত্তের প্রধান কাজ বলে, গল্পে থাকে কেবলই গল্প বলে মানুষকে তৃপ্তি দেবার আগ্রহ, কিন্তু সেই গল্প যখন উপন্যাসের প্লটে পরিবর্তিত হবে তখন ঔপন্যাসিককে আরো পরিকল্পনা অনুযায়ী, সুচিন্তিত ছক অনুযায়ী অগ্রসর হতে হবে। গল্পে গল্পকথকের এই ছক থাকে না, থাকে কেবল পরিবেষণ-নৈপুণ্য, কিন্তু উপন্যাসে থাকে সুচিন্তিত একটা পরিকল্পনা-বিশ্বাসযোগ্যতা ও যুক্তি নির্ভরতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ; এটাই এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য। একটা উদাহরণ না দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে না।

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসের কথাই ধরা যাক। একটি মেয়ের যদি আদর্শ স্বামী এবং দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে এই অস্থির-চিত্ততা তার এবং সংশ্লিষ্ট আরো কিছু মানুষের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে—এই হতে পারে 'গৃহদাহ' উপন্যাসের মূল গল্প। অচলা নামক একটি মেয়ের জীবনে যখন এই অস্থিরচিত্ততা দেখা যায় সমালোচক তাকে দোলাচল বৃত্তি বলে আক্রমণ করতে পারেন, মহিমের সঙ্গে বিবাহ হবার পরও অচলার স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধেয় বচনকে হিন্দু রমনীর পক্ষে অস্বাভাবিক বলে মন্তব্য করতে পারেন, অথবা সুরেশের প্রতি অচলার মনোভাবে ধারাবাহিকতার অভাব লক্ষ করে ঔপন্যাসিকের ক্ষমতায় সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন—এবং এ সবই হতে পারে গঠনমূলক সমালোচনা বা Creative Criticism-এর অভাবে। কোন কথাসাহিত্যিক, বিশেষ করে স্বীকৃত প্রতিভা সম্বন্ধে সমালোচক যখন আলোচনা করেন তখন তাত্ত্বিক বিচারের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হয়ে সাহিত্যিকের সৃষ্টি প্রক্রিয়া যদি একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করেন তাহলে একটি সৃষ্টিকে সার্থক করে তোলার ব্যাপারে তাঁর বিপুল প্রয়াস সমালোচকের নজর এড়াতে পারে না।

অচলার দোলাচল বৃত্তি আমাদের চোখে পড়ে, অথচ তার নামকরণ যে তার আচরণকে ব্যঙ্গ করে, এ কথা আমরা খেয়াল করি না ; আমরা খেয়াল করি না তাঁর এই নায়িকা যে অস্থিরমতি, সে কথা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য কতোটা চেষ্টা শরৎচন্দ্র করেছেন। দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে ধারণা একটি মেয়ে লাভ করে

তার মায়ের কাছ থেকে, স্বামী সম্বন্ধে আচরণীয় কার্যকলাপ বিষয়েও সেই একই কথা বলা যায়। অচলার মাকে আমরা 'গৃহদাহ' উপন্যাসে দেখি না। তিনি কখন প্রয়াতা হয়েছেন সঠিক ভাবে না জানলেও আমরা বুঝি, মেয়েকে সাংসারিক জ্ঞান দেবার সুযোগ তাঁর ঘটেনি।

মাকে অকালে হারালে এ সব বিষয়ে সাধারণ ধারণা মেয়েরা বাবার কাছ থেকেও পেতে পারে, অন্তত আদর্শ পিতা এ বিষয়ে কন্যাকে কিছুটা অবগত করা প্রয়োজন বোধ করেন। শরৎচন্দ্র অচলার পিতা হিসাবে যে চরিত্রটি নির্বাচিত করেছেন তাঁর মতো স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, অনুভূতিহীন চরিত্র বাংলা সাহিত্যে কমই সৃষ্টি হয়েছে। তিনি দেনার দায়ে বাড়ি বন্ধক দিতে বাধ্য হন, অথচ বিকালের বরাদ্দ ওভালটিন খেতে তাঁর ভুল হয় না, ঘোড়ার গাড়ি চেপে সমাজে বা প্রমোদ-অনুষ্ঠানে যাবার ব্যাপারেও তাঁকে বিশেষ উদাসীন বলে কখনো মনে হয়নি। স্বার্থের গন্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের পাত্র পরিবর্তন করতে তাঁর তিলমাত্র বিলম্ব হয় না এবং এ ব্যাপারে কন্যার অভিমত গ্রহণ করা তিনি বাহুল্য বিবেচনা করেন। এমন একটি অমানুষ যে কন্যার পরিণয়োত্তর জীবন সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নিজের কর্তব্য পালন করবেন এমন সম্ভাবনা একটুও নেই। অচলার এমন কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমরা দেখিনি যার সঙ্গে সে এ সম্বন্ধে কথা বলতে পারে। সুতরাং দাম্পত্যজীবনের আদর্শ কী হওয়া উচিত, মানুষ হিসাবে ঠিক কী ধরনের গুণাবলী থাকলে তাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করা যায়, এ সব শিক্ষা বা আলোচনার সুযোগ অচলা বিশেষ পায়নি।

এসব কথা হয়তো আমরা তেমন করে ভাবি না, কিন্তু ভেবে দেখলে ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ একটু বেশি বাড়তো এবং গল্প ও বৃত্তগঠনের পার্থক্যও আমরা কিছুটা বুঝতে পারতাম। যেকোন মেয়ের মধ্যে দোলাচলবৃত্তি দেখা যায় না, হিন্দুনারীর সাধারণ সংস্কার ও বেশির মেয়ের মনেই দেখা যাওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং অচলার মনে এই সংস্কারের প্রাবল্য ততোটা না থাকার এবং দোলাচলচিত্ততা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, বা তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য—এক কথায় বৃত্তনির্মানের জন্যই এই চরিত্র-পরিকল্পনা লেখককে করতে হয়েছে। অচলার দোলাচলবৃত্তিকে পূর্ণ ব্যবহার করবার জন্যই এমন দুটি চরিত্র শরৎচন্দ্রকে বেছে নিতে হয়েছে, প্রকৃতিতে যারা সম্পূর্ণ বিপরীত। মহিমকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত অচলা নিয়েছে তার শ্রেয়বোধ থেকে, কিন্তু তার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সংশয় জন্মে দেবার জন্যই মৃণালকেন্দ্রিক উপকাহিনীর সৃষ্টি করতে হয়েছে লেখককে। অচলার মনের দোলাচলতাকে আশ্রয় করতে পারে, তাতে প্রলুব্ধ হতে পারে—ঠিক এই ভাবেই সরল, বলিষ্ঠ অথচ প্রচন্ড আবেগপ্রবণ একটি চরিত্র লেখককে সৃষ্টি করতে হয়েছে যার দ্বারা অচলা-অপহরণের মতো একটি কাজ সম্ভব। আবার এই বিপর্যয় সাঙ্গ হয়ে যাবার পর তাতে ভেসে না গিয়ে এই প্রথম সতীত্বের সংস্কার প্রবল হয়ে উঠতে দেখি

আমরা অচলার মধ্যে এবং তাকেও আমরা অস্বাভাবিক ভাবতে পারি না যখন মনে করি সাধারণ বাঙালী মেয়ে হিসাবে অন্তত বিপর্যয়ের দিনে এ সংস্কার তার মনে আসতেই পারে। এই সব চিন্তা-ভাবনা, কার্যকারণ-শৃঙ্খল এবং কার্য-পরম্পরার ভাবনাকেই আমরা বৃত্তনির্মিতি বলে থাকি।

বৃত্ত নির্মাণ সম্বন্ধে সাম্প্রতিককালে আলোচনার অনেক প্রসারণ ঘটলেও মৌলিক ধারণা হিসাবে আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, গঠনের দিক থেকে তিন ধরনের বৃত্তের কথাই সমালোচনাসূত্রে বলা হয়—সরল বা simple, জটিল বা complex এবং যৌগিক বা compound প্লট। সরল বৃত্তে একটিই কাহিনী থাকে, ঔপন্যাসিক সেই কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর সাহায্যে উপন্যাসটি এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। জটিল এবং যৌগিক বৃত্তে থাকে একাধিক কাহিনী। উপন্যাসের প্রথম যুগে তা যখন ছিল এক ধরনের গল্পকথন বা story-teller, তখন কাহিনীর আকর্ষণ সৃষ্টি করবার জন্যই মূল কাহিনীর পাশাপাশি একাধিক ছোটখাট কাহিনী সৃষ্টি করার কথা ভাবা হতো, কিন্তু আধুনিককালের সচেতন পাঠক যখন বুঝতে পেরেছেন উপন্যাস মানে জীবনেরই ব্যাখ্যা, কিম্বা চরিত্রের মনস্তত্ত্ব এবং তার বিচিত্র কাণ্ডকারখানাই উপন্যাসের আসল মজা, তখন একাধিক কাহিনীর আকর্ষণটা কমে এসেছে।

সরল বৃত্তে থাকে একটিই কাহিনী, এ কথা বলা হয়েছে, কিন্তু উদাহরণ দেওয়া হয়নি। উদাহরণ হিসাবে আমাদের মনে পড়বে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের কথা, যেখানে গোবিন্দলাল-ভ্রমর-রোহিণীর বৃত্তেই কাহিনী আবর্তিত হয়েছে, অন্য কোন ছোট কাহিনীর দরকার হয়নি। জটিল বৃত্ত এবং যৌগিক বৃত্তে একাধিক কাহিনী থাকে, এ কথা বলা হলেও শুধু কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধিই কিন্তু তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় তাদের অন্য উদ্দেশ্যও থাকে এবং তার ভিত্তিতেই আমরা বুঝতে পারি তাদের প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন। জটিল বৃত্তে মূল কাহিনী থাকে একটিই, এবং যখন সেই উপন্যাসের কথা বলা হয় তখন আমরা বুঝি মূল কাহিনী কোনটি। অন্যান্য যে কাহিনী থাকে, তাদের ভূমিকা মূল কাহিনীর পরিপুষ্টি সাধনের সঙ্গেই যুক্ত অর্থাৎ মূল কাহিনীর ওপর তারা নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে যৌগিক বৃত্তের উপন্যাসে এই ধরনের কোন মূল কাহিনী থাকে না, থাকে আপাতবিচ্ছিন্ন এমন কিছু কাহিনী যাদের সবাইকে মূল কাহিনী ধরা যায়—আয়তনে তারা যতোই ক্ষুদ্র হোক না কেন। তবে বিচ্ছিন্ন মনে হলেও তাদের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় সংগতি থাকে, সেটা বুঝতে পারা যায় লেখকের মানসিকতা এবং গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে।

আসলে বৃত্তের গঠন যেমনই হোক না কেন, উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব এক জীবনদর্শন এবং জীবনভাবনা থাকে, উপন্যাসে সেটাই তিনি প্রকাশ করতে চান। যখন মূল কাহিনী নির্বাচন করার পরও তাঁর মনে হয় তাঁর বক্তব্য সমান্তর কোন উপকাহিনীর দ্বারা আরো শক্তিশালী করা যাবে তখন তিনি এই ধরনের উপকাহিনী

সৃষ্টি করেন। আবার তিনি যখন ভাবেন যে বিশেষ জীবনচিত্র তিনি পরিবেষণ করেছেন তা স্পষ্টতর হবে বিপরীত কোন চিত্র দেখালে, তখন মূল কাহিনীকে আরো স্পষ্ট করার জন্য তার বিপরীত প্রেক্ষিত হিসাবেই একটি উপকাহিনী সন্ধান করতে পারেন। আমাদের সৌভাগ্য, উপকাহিনী-সৃষ্টির এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের দৃষ্টান্তই ধরা পড়বে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উপন্যাসে, তার নাম 'বিষবৃক্ষ'। অসংযত প্রবৃত্তি মানুষের জীবন কেমন বিষময় করে তুলতে পারে সেটাই এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং লেখকের জীবনদর্শনও বটে। নগেন্দ্রনাথের প্রবৃত্তির এই অসংযম তিনি দেখিয়েছেন উপন্যাসের মূল কাহিনী হিসাবে কুন্দর প্রতি তার আকর্ষণে। প্রবৃত্তির অসংযম দুটি জীবনকে কেমন ছারখার করে দিতে পারে তার সমান্তর অথচ তীব্রতর চিত্র ও বীভৎসতর পরিণাম আমরা দেখতে পাই দেবেন্দ্র-হীরার উপকাহিনীতে। আবার সেই একই সঙ্গে বিপরীত প্রেক্ষিত আঁকার দৃষ্টান্ত রয়েছে শ্রীশচন্দ্র-কমলমণি-সতীশের উপকাহিনীতে। নগেন্দ্রের বিব্রান্ত জীবন স্ফুটতর হয় শ্রীশ ও কমলের সুস্থ এবং সুন্দর দাম্পত্যজীবনের ছবিতে। অবশ্য আর একটি ইঙ্গিতও এই উপকাহিনী থেকে আমরা পাই। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হলো সন্তান—শ্রীশ-কমলের উপকাহিনীতে সতীশচন্দ্রের বাড়াবাড়ি রকমের ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য, এটি ভালো করে দেখিয়ে দেওয়া যে, নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর জীবনে সন্তানহীনতাই তাদের বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করেছে।

যৌগিক বৃত্তে কাহিনীগুলির নায়ক একজন হতে পারেন, আবার অনেকেও হতে পারেন। একজন নায়ক হলেই যে সেগুলিকে স্বতন্ত্র কাহিনী মনে হবে না তার এমন কোন মানে নেই। যেমন শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন কাহিনী আছে—অন্নদাদির গল্প, অভয়ার গল্প, রাজলক্ষ্মীর গল্প, কমলতার গল্প, কিন্তু বেশির ভাগ কাহিনীর সঙ্গেই শ্রীকান্ত জড়িয়ে আছে বলেই তাদের অবিচ্ছিন্ন মনে করার কোন কারণ নেই। প্রত্যেকটি কাহিনীধারার মধ্যে যে কেন্দ্রীয় ঐক্য আছে তা হল পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী অথচ সবচেয়ে রহস্যময় অনুভূতি প্রেমকে মানবিক ও সামাজিক অধিকারের পরিবর্তনশীল অনুপাতে দেখা। এই অধিকার কতোটা মানবিক এবং কতোটা সামাজিক, তার এক পরীক্ষাই যেন এই উপন্যাসে করতে চাওয়া হয়েছে। অবশ্য তার বিশ্লেষণ এখানে নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক হবে না। আপাতবিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলির নায়ক একজন নন, এরকম উদাহরণও বাংলা কথাসাহিত্যে আছে, সাম্প্রতিক সাহিত্যে তো আছেই। রমাপদ চৌধুরীর প্রথম দিককার উপন্যাস 'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' এবং সাম্প্রতিককালের উপন্যাস 'আকাশ প্রদীপের' নাম আমরা এই সূত্রে উল্লেখ করতে পারি। দুটি উপন্যাসেই কাহিনীগুলি বিচ্ছিন্ন এবং আপাত-অসম্পূর্ণ, অথচ মনোযোগী ও অনুভবী পাঠক-পাঠিকার কাছে এর সংযোগসূত্র এবং লেখকের অনুচ্চারিত বক্তব্য বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না।

ঘ. উপন্যাসের চরিত্র :

উপন্যাসে যেহেতু সংগঠিত একটা প্লট বা বৃত্ত থাকে, অন্তত সাধারণ পাঠক সেই বৃত্তায়িত কাহিনী পাঠ করতে আগ্রহী, আমাদের কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন মনে জাগতেই পারে—গল্পের প্রয়োজনেই কি চরিত্রেরা আসে, গল্পই কি নিয়ন্ত্রণ করে চরিত্রকে অথবা গল্পকে গতি দান করাই কি চরিত্রের প্রধান কাজ, নাকি চরিত্রকে পরিস্ফুট করতেই গল্পের উদ্ভাবনা করেন ঔপন্যাসিক এবং শেষ পর্যন্ত গল্পের পরিবর্তে কিছু চরিত্রের মধ্য দিয়েই লেখক বেঁচে থাকেন।

এসব প্রশ্ন একেবারে উপন্যাসসৃষ্টির প্রথম যুগে আমাদের মনে আসেনি, কারণ তখন গল্প শোনার আগ্রহই আমাদের মধ্যে ছিল প্রবল এবং উপন্যাস এক ধরনের story-teller গোছের ব্যাপার হিসাবেই আমাদের ভালো লেগেছিল। কিন্তু উপন্যাসে আমাদের কাছের মানুষের গল্প শুনতে গিয়ে আমরা কখন যে সেই মানুষটাকেই ভালোবেসে ফেলেছি—মানুষের গভীরগোপন অনুভূতির রহস্য আমাদের আলোড়িত করেছে আমরা বুঝতে পারি নি। তখন আমাদের মনে হয়েছে পরিচিতের ছদ্মবেশে এই অচেনা মানুষকে চেনাই প্রকৃত আনন্দ এবং উপন্যাস আমাদের গল্প শোনায় বলে তা এতো প্রিয় নয়, চেনা মানুষের আড়ালে এই অচেনা মানুষকে আমরা খুঁজে পাই বলেই আমাদের এতো আনন্দ হয়। এই চেতনা থেকেই মানুষ ক্রমশ চরিত্রচিত্রণের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে, এক সময় এই বিশ্বাসের আধিক্য থেকে মানুষ গড়ে তুলেছে Death of plot নামক সাহিত্যিক আন্দোলন, আজকের দিনেও ফরাসী Anti-novel-এর মূল রহস্যটা চরিত্রচিত্রণের স্বাধীন ও বেপরোয়া মনোভাবের ওপরই অনেকটা নিহিত।

যে কোন ব্যাপারেই চরমপন্থী হলে, সৃষ্টিধর্মের চেয়ে স্রষ্টার উৎকেন্দ্রিকতা বড় হয়ে ওঠে। আধুনিক মানুষের কাছে গল্প শোনার আকর্ষণ অনেকটা কম হবেই, অন্তত আধুনিক মনোভাবাপন্ন মানুষের কাছে। কিন্তু তাই বলে গল্পের চাহিদা যে একেবারেই নেই এমন কখনোই নয়—কোন কালেই তা হয় না এবং হয় না বলেই উপন্যাসে বৃত্তগঠনকে একেবারে উপেক্ষা করবার উপায় কখনোই থাকে না। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস-সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন তিনি প্রথমে কতকগুলি চরিত্র নির্বাচন করে নেন, পরে তাদের স্বাভাবিক আচার-আচরণই নিয়ন্ত্রণ করে গল্পকে। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হলেও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কাহিনী-বৃত্ত আমাদের কাছে কখনোই আকর্ষণীয় মনে হয় না।

আসলে, নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রীক সাহিত্যাচার্য অ্যারিস্টটল যা বলেছিলেন—বৃত্ত এবং চরিত্র দুটিই ট্র্যাজেডির অপরিহার্য উপাদান কিন্তু চরিত্রই অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আধুনিক দৃষ্টিতে উপন্যাস সম্পর্কেও সেটাই সত্য বলে আমাদের মনে হয়। কাহিনীগ্রন্থনের দক্ষতা উপন্যাসের একটি

লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এবং উপন্যাস রচনা করতে গেলে তার বস্তু সম্বন্ধে কিছুটা পরিকল্পনা ঔপন্যাসিককে করতেই হবে। কাহিনীভাগের দায়িত্ব সম্পর্কে উপন্যাসিক যদি পুরোপুরি অসচেতন থাকেন তাহলে লেখকের প্রক্ষিপ্ত চিন্তা হতে পারে, চরিত্র সম্বন্ধে চমকিত উদ্ভাস হতে পারে, বিচ্ছিন্ন নক্সা বা sketch হিসাবে তাকে অত্যন্ত মূল্যবানও আমরা মনে করতে পারি, কিন্তু উপন্যাস নামক শিল্প-প্রকরণের শিল্পরূপ সম্বন্ধে যাবতীয় অস্পষ্টতা সত্বেও ভালো উপন্যাস হিসাবে তাকে স্বীকার করে নিতে আমরা পারবো না।

এই কারণেই আমরা দেখি আধুনিক উপন্যাসে প্লট রচনা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন ঘটেছে, প্লট গ্রন্থণে কিছু শৈথিল্যও হয়তো কেউ কেউ দেখিয়েছেন কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ বর্জন করার প্রবণতা বিশেষ নেই। আজকের দিনে 'দুর্গেশনন্দিনী' হয়তো লেখা হয় না, কিন্তু 'লালবাঈ' বা 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' লেখা হয়। 'বিষবৃক্ষের' মতো কাহিনী-ভারগ্রস্ত উপন্যাসের কথা হয়তো আমরা চিন্তা করি না, কিন্তু মাঝে মাঝে বুদ্ধদেব বসুকেও লিখতে হয় 'তিথিডোর'-এর মতো উপন্যাস, বিমল করের 'অসময়' চরিত্র ও বক্তব্যপ্রধান উপন্যাস হয়েও তাই গল্পও বলে মোটামুটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে।

চরিত্র সম্বন্ধে আধুনিক লেখক বেশি আগ্রহী হবেন এটাই স্বাভাবিক, কারণ উপন্যাস যে গল্প শোনায় তা মানুষের গল্প বলেই বেশি আকর্ষণীয়, নিছক গল্প বলে নয়। লেখক যখন একটি নিটোল গল্প বেছে নেন তখনও কিন্তু মানুষের বিচিত্র জীবনচর্চাই তাঁর আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকে। শৈলজানন্দের কয়লাকুঠির গল্প সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' বা 'টানাপোড়েন'-এর কথা ভাবলেই আমাদের এই উক্তির সারবত্তা বোঝা যাবে। অথবা মনে করা চলে মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসগুলির কথা; সেখানে গল্প আছে, কিন্তু তা আছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে উপস্থিত করার জন্যই। একই ঔপন্যাসিক কখনো গল্প শুনিয়েছেন, কখনো আবার গল্প বর্জন করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও আমরা অনেক পাই। শরৎচন্দ্র যতোই চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহের কথা বলুন, তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসে আমরা মোটামুটি নিটোল গল্পের শরীরই পাই যা তৈরি হয়েছে গূঢ় মনস্তত্ত্ব এবং সূক্ষ্ম সেণ্টিমেণ্টের মালমশলা দিয়ে। অথচ শরৎচন্দ্রও 'শেষ প্রশ্ন'-এর মতো উপন্যাস লিখেছেন যেখানে গল্প তৈরি করার ব্যাপারে তাঁকে শতকরা দশ ভাগও আগ্রহী মনে হয়নি। গল্প একেবারেই তৈরি করবো না, গল্প হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলে বরং তা ভেঙে দেবো—এই ধরনের মানসিকতা ছিল সে কালের জগদীশগুপ্তের; এ কালে দেবেশ রায় বা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে খানিকটা এই মনোভঙ্গির লেখক বলতে পারি। সেই জগদীশ গুপ্তও কিন্তু 'সুতিনী' উপন্যাসে গল্পগ্রন্থনের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন—সে আগ্রহ যতোই কম বলে মনে হোক বিশুদ্ধ গল্পকথকদের তুলনায়, কিন্তু আগ্রহ তিনি নিঃসংশয়িত ভাবেই দেখিয়েছেন। গল্পপ্রধান উপন্যাসের জন্যই প্রধানত খ্যাতি

সমরেশ বসুর, এমনকি ছোটগল্পের আসরেও বিশুদ্ধ গল্পহীন ছোটগল্প তিনি লেখেননি বিশেষ। অথচ 'বিবর' 'পাতক', 'প্রজাপতি'—এই ধারার উপন্যাসে গল্পের সচলতা বা প্লটগ্রন্থন তিনি প্রায় বর্জন করেছেন। এ কালের দুই শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। সুনীল জানেন তাঁর প্রিয় পাঠক শুনতে ভালবাসেন, তাই গল্প তিনি বর্জন করেন না, অথচ ছোট ছোট কিছু কথায়-বর্ণনায়-সূক্ষ্ম মন্তব্যে চরিত্রকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। তুলনায় চরিত্রসৃষ্টিতেই আগ্রহ বেশি শীর্ষেন্দুর, কিন্তু প্লটগ্রন্থনের ঔপন্যাসিক বুদ্ধিও যে তাঁর কম নেই এবং এ বিষয়েও যে তিনি যথেষ্ট সজাগ, তাঁর দীর্ঘ উপন্যাসগুলি তার প্রমাণ।

ঙ. উপন্যাসের উদ্ভব : প্রেক্ষিত ও পূর্বসূত্র :

উপন্যাস নামক সাহিত্য-প্রকরণের উদ্ভব এবং এর পূর্বসূত্র সন্ধান করতে গিয়ে আলোচকগণ প্রায়ই সাহিত্যের মধ্যযুগে নিপুণ পর্যবেক্ষণ চালান। এর সম্ভাব্য কারণ, উপন্যাস বলতে ঠিক যে দুধরনের রচনা এখন বুঝে থাকি—নভেল ও রোম্যান্স, সে দুটিরই পূর্বসূরী মধ্যযুগে সন্ধান করা সম্ভব। কিন্তু উপন্যাসের উদ্ভবের যে প্রেক্ষিত উপন্যাসের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্লেষণ করেছেন তাতে আমাদের এ কথা অত্যন্ত নিঃসন্দিগ্ধ ভাবেই বিশ্বাস করা উচিত যে আধুনিক যুগের আগে, বা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে, আধুনিক মানসিকতা জন্ম নেবার আগে, উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভব ছিল না। তিনি যে বিশিষ্ট মন্তব্যগুলি করেছেন তা এই যে, প্রথমত, 'সর্ব শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে উপন্যাসই সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত'; দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং আত্মমর্যাদাবোধের জাগরণভিন্ন উপন্যাসের উদ্ভব সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, সামাজিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভও এর আবশ্যিক শর্ত। এই কারণেই তাঁর অভিমত—"পৃথিবীর কোন দেশেরই পুরাতন সাহিত্যে উপন্যাসের দর্শন মিলে না। উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্বই এই যে, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক সামগ্রী।"

এই কারণেই উপন্যাসের স্বীকৃতি একটি পৃথক প্রকরণ হিসাবেই দিতে হবে এবং মধ্যযুগীয় কোন সাহিত্য-প্রকরণের সঙ্গে যদি তার কোন দূরাগত সম্পর্কসূত্র থাকেও তবে মধ্যযুগীয় সেই সাহিত্যলক্ষণের সঙ্গে উপন্যাসকে নির্বিচারে মেলানো মোটেই যুক্তিসংগত হবে না।

বাংলায় উপন্যাস বলতে যেমন আমরা ইংরেজি নভেল ও রোম্যান্স উভয়কেই বুঝি, বেশির ভাগ ইউরোপীয় ভাষাতেও উপন্যাসের প্রতিশব্দ হল 'রোম্যান'। এতেও মনে হয় রোম্যান্স ও নভেল ব্যাপারদুটি খুব কাছাকাছি, কারণ রোম্যান্স

শব্দটি নিশ্চয়ই মধ্যযুগীয় রোম্যান্স শব্দ থেকেই গঠিত হয়েছে। ইংরেজিতে নভেল শব্দটি এসেছে ইতালীয় শব্দ 'নভেল্লা' শব্দ থেকে যার সঠিক অর্থ হল ছোট্ট একটা নতুন জিনিস—অর্থাৎ গদ্যে লেখা ছোট নতুন ধরনের রচনা। চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে ইতালী দেশে এই ধরনের রচনা ছিল খুবই জনপ্রিয়—এদের মধ্যে কিছু ছিল বেশ গুরুগম্ভীর রচনা, কিছু ছিল কুৎসামূলক। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ বোক্কাচিও-র 'ডেকামেরন'।

নভেলের উৎস যদি একভাবে মনে করা যায় এই নভেল্লা-কে, তবে অন্যভাবে আর এক রকমের রচনাকেও এর পূর্বসূরী মনে করেন কেউ কেউ। এই ধরনের রচনা প্রথম উদ্ভূত হয় স্পেনে, ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দে—এগুলি পিকারেস্ক আখ্যান বা পিকারেস্ক নভেল নামেই পরিচিত। অবশ্য স্পেনে এর উদ্ভব হলেও ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই জাতীয় আখ্যান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং প্রায় সর্বত্রই তা লেখা হচ্ছিল। এই আখ্যান আসলে দস্যু ডাকাতদেরই গল্প, যারা অসামাজিক কাণ্ডকারখানা করলেও সাধারণ পাঠকের কাছে তারা বীরপূজা পেতো। পরবর্তী কালেও এই ধরনের রচনা অনেক লেখা হয়েছে। ফরাসী ভাষায় লেখা 'জিল ব্লাস' পিকারেস্ক আখ্যানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলা ভাষায় লেখা 'রঘু ডাকাত' বা শশধর দত্তের 'দস্যুমোহন' এই জাতীয় রচনা। কোন কোন রচনায় নভেল্লা ও ও পিকারেস্কের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে, যেমন সারভানতিসের লেখা 'ডন কুইক্‌জোট।' একে আধুনিক উপন্যাসেরও পূর্বসূরী বলা যেতে পারে।

সাধারণ ভাবে দেখা গেল নভেল ও রোম্যান্স দুইই উৎসমুখে প্রায় অভিন্ন হয়ে ছিল, আধুনিক কালেও উপন্যাস বলতে আমরা এই দুটি শাখাকেই বুঝে থাকি। এদের মূলগত কোন প্রভেদ আছে কিনা বুঝবার জন্য প্রসঙ্গটি স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

চ. নভেল ও রোম্যান্স :

বাংলায় যাকে আমরা সাধারণভাবে বলি উপন্যাস, ইংরেজীতে তা দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—নভেল এবং রোম্যান্স। মধ্যযুগে যে জাতীয় রচনা রোম্যান্স হিসাবে পরিচিত ছিল তা বীরত্বব্যঞ্জক এক ধরনেরর অবাস্তব ও অতিরঞ্জিত কল্পকাহিনী বলে প্রচলিত ধারণা এই যে, নভেল বলতে বোঝায় আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ পরিচিত মানুষের জীবনকাহিনী এবং রোম্যান্স হল উচ্ছৃঙ্খল কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে লেখা বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এক ধরনের রচনা। বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা যাঁরা করেছেন তাদের কারো কারো মধ্যে এই ধারণা এখনো বর্তমান, অন্তত এ বিষয়ে তাদের আলোচনাগ্রন্থ পাঠ করলে তাই মনে হয়। ইংরেজি সাহিত্যের

আদিযুগের উপন্যাস আলোচনায় এই জাতীয় ধারণা আমরা দেখি। যেমন অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে লেখা Progress of Romance গ্রন্থে Clara Reeve লিখেছেন—"The Novel is a picture of real life and manners, and of the time in which it is written. The Romance, in lofty and elevated language, describes what never happend nor is likely to happen."

একথা যদি সত্যি হতো, অর্থাৎ রোম্যান্স যদি হতো উচ্ছ্বাসময় ও বর্ণাঢ্য ভাষায় এমন জিনিসেরই বর্ণনা হতো যা কখনো ঘটেনি বা ঘটতে পারে না, তাহলে তাকে আর যাই বলা হোক উপন্যাস বলা চলতো না। কারণ, মধ্যযুগে কোন প্রকরণের কী ধর্ম ছিল তা জানার চেয়েও একথা জানা অনেক বেশি আবশ্যক যে বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রধান শর্ত। আধুনিকালের যে সাহিত্য-প্রকরণ বাস্তবতা ও বিশ্বাস-যোগ্যতাকেই প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছে, তার একটি প্রধান বিভাগ অবাস্তব কল্পনাবিলাস কখনোই হতে পারে না। যদি তা হতো তাহলে তাকে উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বিভাগ হিসাবে আমরা কখনোই মেনে নিতাম না। দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম যে দুটি আখ্যান রচনা করেন—'দুর্গেশনন্দিনী ও 'কপালকুণ্ডলা', তারা বিশুদ্ধ রোম্যান্স হিসাবেই অভিহিত হতে পারে। এই দুটি রোম্যান্স রচনা করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা দিয়েছি বাংলা উপন্যাসে সার্থক পথিকৃতের সম্মান, অথচ সমসাময়িক সমস্যা নিয়ে আখ্যান রচনা করা সত্ত্বেও প্যারীচাঁদ মিত্র বা হুতোম প্যাঁচাকে সে সম্মান আমরা দিতে পারিনি—এই ঘটনাই প্রমাণ করে, রোম্যান্স জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কল্পনাবিলাস হতে পারে না।

কথাটা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি তাঁর 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন মধ্যযুগের রোম্যান্সের সঙ্গে উপন্যাসের অন্যতম বিভাগ হিসাবে স্বীকৃত রোম্যান্সের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তাঁর মতে, "আধুনিক রোমান্সও বাস্তবতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া সত্যের কঠোর সংযম স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রোমান্সের জগতেও আর অতিপ্রকৃত বা অবিশ্বাস্যের কোন স্থান নাই।"

আধুনিক কালের পাশ্চাত্য সমালোচকও যে ব্যাপারটা স্বীকার করেন এ কথা বোঝাবার জন্য এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত Theory of Literature (লেখক René Welleck এবং Austin Warren) নামক বিখ্যাত গ্রন্থের বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করতে পারি—"the novel develops from the lineage of non-fictitious narrative froms—the letters, the journal, the memoir or biography, the chronicle, the history;...The romance on the otherhand, the continuator of the epic and the midieval romance, may neglect verisimilitude of detail (the reproduction of individuated speech in

dialogue, for example), addressing itself to a higher reality, a deeper psycholoy."

আসলে বাস্তবতাই উপন্যাসের প্রধান শর্ত বলে তা নভেল ও রোম্যান্স উভয় প্রকার উপন্যাসেরই বিশিষ্ট লক্ষণ—রোম্যান্সকে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ও কল্পনাচারী মনে করার কোন কারণ নেই। উপন্যাস মানেই মানবিক অনুভূতি ও মানবিক দুর্বলতার কাহিনী। যখন এই কাহিনী লেখক সংগ্রহ করেন তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, চেনা মানুষ ও পরিচিত জীবন-চর্যা থেকে, তখন সৃষ্টি হয় নভেলের; যখন এই ধরনের কোন মানবিক কাহিনীর সন্ধান লেখক পেয়ে যান ইতিহাসের বৃত্ত থেকে এবং সেই কাহিনী অবলম্বন করে উপন্যাস রচনা করেন তখন জন্ম হয় রোম্যান্সের। তবে রোম্যান্সের ক্ষেত্রে 'detail'-এর যে প্রয়োজন নেই বলা হয়েছে Theory of Literature গ্রন্থে, বা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে বলেছেন 'সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবী এত প্রবল বা সর্বগ্রাসী নহে' সে কথার উপযুক্ত ব্যাখ্যা পেতে গেলে আমাদের অ্যারিস্টটলের শরণাপন্ন হতে হবে। এর উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি, এখন পুনর্বার তা স্মরণ করছি।

ইতিহাসের সত্য ও কাব্যের সত্যের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে অ্যারিস্টটল দেখিয়ে ছিলেন ইতিহাস ঘটমান সত্য বা possibility-এর কথাই বলে, কাব্য আশ্রয় করে সম্ভাব্য ঘটনা বা probables-কে। অর্থাৎ ঘটেছে, এই ব্যাপারটাই যখন ইতিহাসের প্রধান বিবেচ্য, কাব্যের বিবেচনার বিষয় তখন তার সম্ভাব্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। এই সম্ভাব্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতাই নভেল ও এবং রোম্যান্সের সম্বন্ধসূত্র, কারণ উপন্যাসেরও তা প্রধান শর্ত। নভেল ও রোম্যান্সের পার্থক্য এই যে, নভেল যখন সম্ভাব্য ঘটনা বা probable possibity কে গ্রহণ করে, রোম্যান্স তখন সম্ভাব্য অঘটন বা probable impossibility-কেও গ্রহণ করতে পারে; কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রেই probability বা সম্ভাব্যতাকে বজায় রাখতেই হবে, নইলে তাকে আমরা উপন্যাস বলতে পারবো না।

রোম্যান্স বলতে অবশ্য তার দুটি বিভাগের কথা বোঝায়—ঐতিহাসিক রোম্যান্স এবং কাব্যিক রোম্যান্স। কোন মানবিক আখ্যান যখন লেখক সংগ্রহ করেন ইতিহাসের পরিমণ্ডল থেকে তখন তাকে আমরা বলি ঐতিহাসিক রোম্যান্স কিন্তু লেখক যখন সম্পূর্ণ কল্পনা থেকে তা উদ্ভাবন করেন তখন তাকে আমরা বলি কাব্যিক রোম্যান্স। অবশ্য ঐতিহাসিক রোম্যান্সের সঙ্গে নভেলের পার্থক্য যতো স্পষ্ট ভাবে বোঝানো হয়েছে, কাব্যিক রোম্যান্সের সঙ্গে নভেলের পার্থক্যটা ততো স্পষ্ট এতে বোঝা যাচ্ছে না, সুতরাং সেই পার্থক্যটা আর একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

উপন্যাস রচনা ও কাব্যরচনার পদ্ধতিগত একটা বিরাট পার্থক্য আছে। উপন্যাসের লেখক তাঁর বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে, চোখে দেখা মানুষ এবং

তাদের জীবনযাপন থেকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং সেই অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী সংগ্রথিত প্লটবিন্যাসের সাহায্যে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের প্রথমে আসে অভিজ্ঞতা, তারপর আসে সিদ্ধান্ত। পক্ষান্তরে কবির মনে প্রথমেই আসে সিদ্ধান্ত বা একটি ধারণা, সেই সিদ্ধান্ত বা ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি কল্পিত কাহিনী রচনা বা সৃষ্টি কর্মে উৎসাহী হন। এই যে ঔপন্যাসিক ও কবির সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বৈপরীত্য দেখানো হল, এটা না মেনে যখন ঔপন্যাসিক কবির পদ্ধতিতে সৃষ্টিকার্যে আগ্রহ দেখান—অর্থাৎ আগে একটি ধারণা মনে লালন করেন ও পরে তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কল্পিত পটভূমি, চরিত্র ও কাহিনী সৃষ্টি করেন তখন কাব্যিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট এই উপন্যাসকে বলে কাব্যিক রোম্যান্স। নভেলের পদ্ধতির চেয়ে এর সৃষ্টিপদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। একটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা আর একটু স্পষ্ট হবে বলে মনে হয়।

"যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিককর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ দেখিতে না পায় এবং সমাজের কিছু জানিতে না পায়, কেবল বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেউ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে"—এই প্রশ্ন যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র সে কথা এইভাবে তাঁর 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে জানিয়েছেন। এই চিন্তা এবং সে সম্বন্ধে প্রাক্-সিদ্ধান্ত নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এর দু বছর পরে রচনা করেন তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা।' একটি ধারণা থেকে এই উপন্যাসের জন্ম—তাকে সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত করবার জন্য তিনি পরিবেশ নির্বাচন করেছেন, বিচিত্র চরিত্রের উদ্ভাবন করেছেন, কল্পিত কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ পদ্ধতির দিক থেকে কাব্যিক রীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও একটি উপন্যাসের জন্ম হয়েছে। এই কারণেই একে বলা যায় কাব্যিক রোম্যান্স।

একটা কথা এই প্রসঙ্গেই অত্যন্ত ভালোভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, কাব্যময় ভাষায় লেখা হয়েছিল বলেই 'কপালকুণ্ডলা' কাব্যিক রোম্যান্স নয়—যদিও এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই যে 'কপালকুণ্ডলা'-র ভাষা কোন প্রথম শ্রেণীর কবি ভিন্ন কারো পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়; কপালকুণ্ডলা কাব্যিক এই কারণেই যে পদ্ধতিগত ভাবে এই উপন্যাসে কাব্যিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। 'কপালকুণ্ডলা' রোম্যান্স এই কারণে যে এই উপন্যাসে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা সচরাচর ঘটে না, অর্থাৎ তা Possible নয়। আমরা কেউই উপন্যাসে বর্ণিত নির্জন সমুদ্রতটে কাপালিক-প্রতিপালিতা ওরকম সুন্দরী নারীর কথা খুব সহজে ভাবতে পারি না এবং সঙ্গীদল পরিত্যক্ত অবস্থায় বিভ্রান্ত ভাবে সেখানে ঘুরতে

থ্রতে ওই অপরূপ নারীর কণ্ঠে 'পথিক তুমি পথ হারাইছ ?' শুনবো এ কথা ভাবতে পারি না—যদিও তার সম্ভাবনা থাকলে অনেকেই হয়তো হাজার বার পথ হারাতে রাজি আছি।

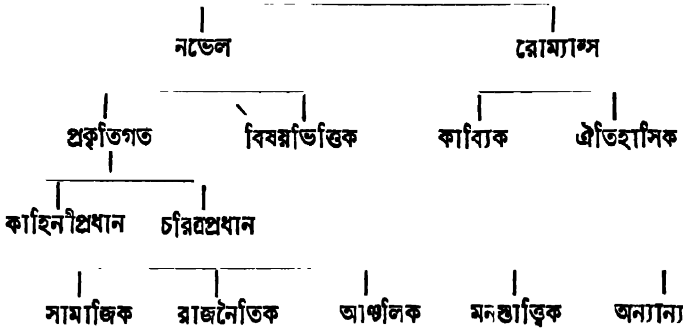
আবার 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসও, কারণ রোম্যান্সও উপন্যাসেরই একটি বিভাগ মাত্র। তাই ঘটমানতা (possibility) না থাকলেও এর সম্ভাব্যতা (probability) এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়েছে। লক্ষ করলেই বোঝা যাবে আদ্যন্ত কাল্পনিক এবং সাধারণভাবে কিছুটা অবিশ্বাস্য এই কাহিনী শুরু হয়েছে এইভাবে—"প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল।" অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির জন্যই কাহিনীকে তিনি পিছিয়ে নিয়ে গিয়েছেন আড়াইশো বছর, যাকে তিনি বর্তমানের কাহিনীও বলতে পারতেন; অথচ মোটামুটি সঠিক সময়ের ('মাঘ মাসের রাত্রিশেষে') উল্লেখ করেছেন ওই একই কারণে। এটি অবশ্য রোম্যান্স রচনায় তাঁর পরিচিত পদ্ধতি, প্রসঙ্গত প্রথম উপন্যাসটির সূচনা-বাক্য ও স্মরণ করা যেতে পারে—"৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।"

উপন্যাসে বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টির যে প্রয়াস সূচনা থেকে আমরা দেখতে পাই, শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। সেই কারণেই ভিক্ষুককে গয়না দেবার পর তার উদ্‌ভ্রান্ত পলায়ন এবং কপালকুণ্ডলার চিন্তা 'ভিক্ষুক দৌড়িল কেন ?' উপন্যাসে এসেছে, পতি-সোহাগবঞ্চিতা শ্যামাসুন্দরীর প্রসঙ্গ এসেছে এবং মতিবিবির সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ যোগ করে দেওয়া হয়েছে। এই সব কারণেই এমন একটি অ-সাধারণ বিষয়ও সম্ভাব্যতার স্পষ্টতায় বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে, কাব্যিক রোম্যান্স হিসাবেও তা অনবদ্য হয়ে উঠেছে বলেই এর প্রচুর স্বীকৃতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় R. W. Fraser-এর এই অবিস্মরণীয় মন্তব্য—"Outside in 'Mariagé de Loti' ther is nothing comparable to the 'Kopala Kundala' in the history of Western fiction."

ছ. উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ

বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে—নভেল ও রোম্যান্সই এর সবচেয়ে লক্ষণীয় এবং অন্তরঙ্গ বিভাগ। অবশ্য আর একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে রোম্যান্সেরও যে উপবিভাগ সম্ভব, সেও আমরা দেখেছি। সেভাবে দেখতে গেলে নভেলেরও উপবিভাগ সম্ভব, এবং তার সংখ্যা অনেক বেশিই

দাঁড়াবে, কারণ এর প্রকৃতিগত একটা উপবিভাগ যেমন হতে পারে, তেমনি হতে পারে বিষয়গত উপবিভাগ। বিষয়গত উপবিভাগের আলোচনা, অর্থাৎ উপন্যাসের বিষয়বস্তু-ভিত্তিক আলোচনা সাধারণভাবে প্রকরণগত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না বলে মনে হতে পারে; তবে এরও কিছুটা সার্থকতা আছে। আগে উপন্যাসের শ্রেণিবিভাগটি একটি ছকের সাহায্যে দেখবার চেষ্টা করা যাক—



নভেলের প্রকৃতিগত বিভাগের কথা, ঠিক বিভাগ হিসাবে না হলেও, উল্লেখ করা হয়েছিল। উপন্যাস সৃষ্টির আদিযুগে কাহিনীর ওপরই প্রাধান্য থাকে খুব স্বাভাবিক ভাবেই— কারণ গল্পের আকর্ষণই তখন পাঠকের কাছে প্রধান। এরপর যখন চরিত্রের আচরণ এবং তার অন্তর্লশায়ী মনস্তত্ত্ব আমাদের অভিভূত করে তখন গল্পের চেয়েও অনুভূতির এই দিক্-পরিবর্তন আমাদের আকর্ষণ করে বেশি। যে-কোন একটি ব্যাপারে আতিশয্য দেখা গেলে তার প্রতিক্রিয়ায় অন্য দিকটি পরবর্তীকালে আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রে এসে যায়। এই কারণেই উপন্যাসে কখনো গল্পের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, কখনো চরিত্রচিত্রণের।

নভেলের বিষয়বস্তু অনুসারে তার শ্রেণীগত নাম পরিবর্তিত হয়ে থাকে, যেমন সামাজিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস প্রভৃতি। বিষয়-অনুযায়ী এই পরিবর্তন যেহেতু প্রকৃতিগত পরিবর্তন নয়, কোন সমালোচক প্রকরণ-ভিত্তিক আলোচনায় তাদের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী নাও হতে পারেন। এই মতকে অসম্মানিত না করেও বলা যায় বিষয়ের বিভাগ প্রকরণ হিসাবেও তাদের কিছু বৈশিষ্ট্য দান করে, এবং তার চেয়েও বড়ো কথা এই ধরনের শ্রেণীবিভাগের যৌক্তিকতাও সাহিত্যালোচনার এই প্রবেশিকা-পুস্তকে ব্যাখ্যা করে রাখা ভালো; তাতে অনাবশ্যক অনেক বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণার হাত থেকে অব্যাহিত পাওয়া যাবে।

উপন্যাসের বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ কিছুটা জটিল ও বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে এই কারণেই যে, ঔপন্যাসিক প্রকৃতি এবং উপন্যাসের লক্ষণও এর সঙ্গে মিশে থাকে। সামাজিক, আঞ্চলিক, মনস্তাত্ত্বিক প্রভৃতি লক্ষণ উপন্যাসমাত্রেরই এমন নির্বিশেষ বা সাধারণ লক্ষণ যে প্রায় সব উপন্যাসেই এই লক্ষণগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে। তাই কোন বিশেষ উপন্যাসকে এদের মধ্যে একটি লক্ষণের ভিত্তিতে নামকরণ প্রাথমিকভাবে অযৌক্তিক বলে মনে হতে পারে। যেমন, উপন্যাস আধুনিক জীবনের আলেখ্য বলেই যে সমস্যা সেখানে আলোচিত হয় প্রায়শই তা সামাজিক সমস্যা হবারই সম্ভাবনা থাকে এবং যে সব পাত্রপাত্রী উপন্যাসে সৃষ্ট হয় তারাও নিঃসন্দেহে সামাজিক মানুষই হয়ে থাকে। সুতরাং সামাজিক হওয়াকে উপন্যাসের সামান্য ধর্ম বলেই আমরা মনে করতে পারি। একই ভাবে বলতে পারি, আধুনিক মানুষ তার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ও মানবিক অধিকার সম্বন্ধে সচেতন বলেই রাজনীতি এখন আধুনিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া একটি গণতান্ত্রিক দেশের অধিবাসী হিসাবে যাকে রাজনৈতিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হয়, নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে পরোক্ষ উপায়ে সাহায্য করতে হয়, রাজনীতি সম্বন্ধে অসচেতন হওয়া তার পক্ষে উচিত নয়। এই কারণেই আধুনিক মানুষের জীবনালেখ্যে রাজনীতিও একটি সামান্য ধর্ম হিসাবেই বিবেচিত হতে পারে। 'আঞ্চলিক উপন্যাস' নামকরণটিই আমাদের অস্বস্তিকর মনে হতে পারে এই কারণে যে উপন্যাস যেহেতু একটি বিশেষ অঞ্চলের মানুষেরই কাহিনী, সুতরাং আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য কিছু পরিমাণে তো সেখানে থাকতেই পারে—সব উপন্যাসেই এ ঘটনা ঘটতে পারে। আর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আমরা কেন চিন্তা করবো সে ব্যাপারটাই আমাদের বোধগম্য না হতে পারে, কারণ উপন্যাস যখন আধুনিক মানুষের কাহিনী তখন মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও তো তার অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য—মানুষের জটিল ও অনধিগম্য মনের রহস্যই যদি ধরার চেষ্টা না করা হল তাহলে তা আধুনিক মানুষের গল্প হল কেমন করে। সেদিক থেকে চিন্তা করতে গেলে মনস্তাত্ত্বিক রহস্যকে বাদ দিয়ে উপন্যাস কেমন করে লেখা হয় সেটাই তো আমরা ভেবে পাইনা।

ঠিক এই কারণেই উপন্যাসের শ্রেণীবিচার করবার সময় নানা ধরনের বিভ্রান্তি দেখা দেয়। কেউ যাকে বলছেন সামাজিক উপন্যাস অন্য কেউ তাকে বলেন রাজনৈতিক, কারণ সামাজিক উপন্যাসে রাজনীতি অবশ্যই থাকতে পারে—এবং সেক্ষেত্রে কাউকে ভুল প্রতিপন্ন করা আমাদের পক্ষে খুব শক্ত হয়ে পড়ে। আবার কোন রাজনৈতিক উপন্যাসকে যখন কেউ বলেন মনস্তাত্ত্বিক, কিম্বা এর উল্টো ব্যাপারটাই যখন ঘটে তখনও আমরা অসহায় হয়ে পড়ি, কারণ রাজনৈতিক উপন্যাসে যেমন মনস্তত্ত্ব থাকতেই পারে, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেও তেমনি রাজনীতি।

সুখের কথা, এই সব বিভ্রান্তি দূর করার সঠিক উপায় আছে, কারণ ব্যাপারটা সত্যিই এতোটা ভ্রান্তিমূলক নয় এবং সামান্য ধর্ম হিসাবে একটি উপন্যাসে উল্লিখিত

সব কটি লক্ষণ থাকলেও শ্রেণীভিত্তিক নামকরণ অযৌক্তিক নয় এবং আমরা সুনির্দিষ্ট ও নিঃসংশয়িত এক মাপকাঠিতেই এই ধরনের বিচার করে থাকি। সেই মাপকাঠি ও শ্রেণী-বিভক্তিকরণের ব্যাপারটাই আমাদের ভালো করে জেনে রাখতে হবে।

উপন্যাসের সামান্য ধর্ম হিসাবে অনেক লক্ষণই থাকতে পারে কিন্তু একটি বিশেষ উপন্যাসকে, কিংবা বলা যায় একটি বিশেষ শ্রেণীর উপন্যাসকে, নিয়ন্ত্রণ করে একটি বিশেষ ধর্ম—একে বলা যায় তার কেন্দ্রীয় শক্তি, যে শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ ও চালনা করে। যেমন সামাজিক মানুষ নিয়ে উপন্যাস রচিত হবে, একে উপন্যাসের কোন বিশেষ ধর্ম মনে করার কোন কারণ নেই, কিন্তু এক-এক সময়ে একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যাই যখন কোন বিশেষ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি হয়ে ওঠে তখনই উপন্যাসের শ্রেণী সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে উঠি—তা বিধবাবিবাহের সমস্যা হতে পারে, একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়ার গল্প হতে পারে, অথবা হতে পারে আরো সাম্প্রতিক কালের এক ইউনিটের পরিবার এবং সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতার সমস্যা। অবশ্য শুধু সামাজিক সমস্যা নিয়ে রচিত উপন্যাসকেই আমরা সামাজিক উপন্যাস আখ্যা দিতে পারি না, আমাদের দেখতে হবে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি সামাজিক ব্যক্তির মতো আচরণ করেছে কিনা এবং সমাজের সেই সমস্যা লেখক যথার্থভাবে মনে রাখতে পেরেছেন কিনা—এক কথায় সামাজিক সমস্যা সেই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি কিনা। উদাহরণ সন্ধান করলে বলা যায়, বিধবাবিবাহ এক সময় আমাদের সমাজে একটি প্রবল সমস্যা হিসাবেই উপস্থিত ছিল এবং এ নিয়ে প্রচুর নাটক ও উপন্যাস রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সামাজিক নাটক ও উপন্যাসের সংখ্যা খুব বেশি নয়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে কুন্দনন্দিনীর ওপর জোর করে বৈধব্য চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সমস্যাটি সম্পূর্ণ স্বয়ংঘটিত। বরং তুলনামূলক ভাবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে এই সমস্যা ঔপন্যাসিক জটিলতার অনেকটা কাছে এসেছে—রোহিনীর সমগ্র আচার-আচরণ এবং নীতিবিগর্হিত কার্যকলাপ তার বৈধব্যের যন্ত্রণা থেকে উৎসারিত মনে হতে পারে। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'সমাজ' উপন্যাসে বিধবাবিবাহের সমস্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'-র মতই সচকিত ভাষণ দিয়েছেন প্রায় সর্বত্র, এই সমস্যা যে কতো গভীর তা বার বার আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, সুশীলা ও দেবীপ্রসাদের মাধমে একটি বিধবাবিবাহ সম্পাদন করে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, কিন্তু আসল সমস্যাটিকেই তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। যে সমাজে সমান কুলমর্যাদার পাত্র না পাওয়া গেলে পরবর্তী সময়ে সামাজিক কাজকর্মের অসুবিধা দেখা দেয়, সেখানে বিধবাকে বিবাহ করলে প্রকৃত সমস্যার উদ্ভব হয় সে বিবাহের পর থেকেই। অথচ বিবাহেই উপন্যাসের উপসংহার টেনে দিয়ে রমেশচন্দ্র তাঁর ঔপন্যাসিক দায়িত্ব শেষ করেছেন।

রাজনৈতিক উপন্যাস বিচার করতে গেলেও আমাদের এই অভিন্ন সূত্রেই তা করতে হবে। রাজনীতি অল্পবিস্তর সব উপন্যাসেই থাকতে পারে, রবীন্দ্রনাথের

'ঘরে-বাইরে'-তে আছে, 'চার অধ্যায়'-এ আছে—সাম্প্রতিককালে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসেও আছে। কিন্তু যখন শ্রেণী হিসাবে তাদের রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যায় কিনা বিচার করতে হবে তখন দেখতে হবে রাজনৈতিক সমস্যাই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন কিনা এবং সমস্ত রকমের জটিলতা রাজনৈতিক কারণেই হচ্ছে কিনা ; এক কথায় রাজনীতি সমগ্র উপন্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করছে কিনা। এইভাবে বিচার করতে গেলে অনেক সময়ই দেখা যাবে রাজনীতি উপন্যাসের সমসাময়িক প্রেক্ষিত পরিস্ফুট করবার জন্য বা আবহ রচনার জন্য যতোখানি ব্যবহৃত হয়েছে, উপন্যাসের প্রকৃত সমস্যা বা জটিলতা সৃষ্টির জন্য ততোখানি নয়। অবশ্য এর বিপরীত দৃষ্টান্তও থাকতে পারে। রাজনীতির স্রোত আপাতভাবে অত্যন্ত ক্ষীণ অথচ তার অন্তঃসলিলা স্রোত সর্বদাই অনুভূত হচ্ছে, এরকম হতেই পারে।

বস্তুত 'আঞ্চলিক উপন্যাস' অভিধাটিও প্রায় এই কারণেই অর্থবহ হয়ে ওঠে। উপন্যাসের কাহিনী বিশেষ কোন অঞ্চলে ঘটবেই, কিন্তু সেই অঞ্চলের যদি নিজস্ব কোন চরিত্র থাকে, যদি পাত্রপাত্রী সেই অঞ্চলসম্ভব মানুষ হয় এবং অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়, অর্থাৎ যে অঞ্চলে উপন্যাসটি গ্রথিত হয়েছে সেই অঞ্চলটিই যদি হয়ে ওঠে উপন্যাসের একটি অনির্দেশিত চরিত্র, তখন উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক অভিধায় চিহ্নিত করি আমরা। তবে বিচারের সূক্ষ্মতা সবচেয়ে বেশি দরকার হবে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগে, কারণ মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা নেই বা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা নেই এমন কোন আধুনিক উপন্যাসের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি না। তবু মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস নামক শ্রেণীটি আমরা স্বীকার করে নিই উপন্যাসে যখন মনস্তত্ত্ব থাকে সেই কেন্দ্রীয় ভূমিকায়—নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসাবে।

আমরা এই ধরনের শ্রেণী বিচারের জন্য আরো একটা পরোক্ষ প্রমাণের আশ্রয় নিতে পারি, এবং মনে হয় সেই প্রমাণটিও বিশেষ দুর্বল নয়। উপন্যাসে যার ভূমিকা আমাদের সাধারণ ভাবে বেশি মনে হবে, আমরা যার ভিত্তিতে তার শ্রেণী-ভুক্তি করতে মনস্থ করবো, মনে মনে সেই ব্যাপারটিকেই উপন্যাস থেকে সরিয়ে দিয়ে দেখতে পারি উপন্যাসের কী চেহারা হয়। দেখা যাবে অন্য সব লক্ষণ বাদ দিলে, দুর্বলতা সত্ত্বেও উপন্যাসটি নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, কিন্তু ওই কেন্দ্রীয় অবলম্বনচ্যুত হলে সেটি আর দাঁড়াতেই পারে না, উপন্যাসটি লেখারই কোন সার্থকতা থাকে না তাহলে। এই বিচারের পদ্ধতিও আমরা অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারি।

জ. ঐতিহাসিক উপন্যাস

খুব স্থূল অর্থে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে আমরা বুঝি এমন উপন্যাস যার পটভূমি হচ্ছে ইতিহাস এবং বেশ কিছু চরিত্র গ্রহণ করা হয়েছে ইতিহাস থেকেই।

উপন্যাসের মূল সমস্যাটি যেন সেই ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেই থাকে এবং ইতিহাসের ধারণাই যেন অব্যাহত থাকে, এটাও আমরা প্রত্যাশা করি। সেই জন্যই স্থূল ভাবে দেখতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-ও যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লুৎফউন্নিসা'-ও তাই ; আবার ডিকেন্সের 'এ টেল অব টু সিটিজ' যেমন ঐতিহাসিক উপন্যাস, স্ট্রাফের 'কুইনহো হল'-ও তাই। সূক্ষ্ম অর্থে অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্য তাৎপর্য আছে, তবে সে কথা বলার আগে এর যে দু-একটি প্রকারভেদের কথা সমালোচকগণ উল্লেখ করেছেন তার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসকে কোন কোন সমালোচক দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন— বিশুদ্ধ ও মিশ্রধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস। উপন্যাসে যখন ইতিহাসই থাকে পুরোপুরি ভাবে এবং রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ঐতিহাসিক রস' সেই রসস্ফূর্তির দিকে যখন ঔপন্যাসিকের সম্পূর্ণ সচেতনতা থাকে, তখন তাকে বলে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস, যেমন কেনেথ রবার্টস্-এর 'নর্দওয়েস্ট প্যাসেজ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', রমেশচন্দ্র দত্তর 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' প্রভৃতি। মিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসকে উপলক্ষ করে রাজনৈতিক বা সামাজিক অবস্থাও প্রধানভাবে বর্ণিত হতে পারে। এর উদাহরণ হিসাবে আমরা আনাটোল ফ্রান্সের 'থেইস', থ্যাকারের 'এসমণ্ড', রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি', হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' প্রভৃতি উপন্যাসের নাম করতে পারি।

প্রায় একই ধরনের আর-একটি বিভাগ কেউ কেউ করে থাকেন। তাঁদের মতে ঐতিহাসিক উপন্যাস দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে পারে—প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস। প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্যেই সম্পূর্ণ ভাবে আস্থা রাখেন ঔপন্যাসিক, যেমন রমেশচন্দ্র দত্তর 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত'। ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস বলে তাদের যেখানে বিভিন্ন প্রয়োজনে ইতিহাসকে আশ্রয় করেন লেখক কিন্তু তাঁদের আসল উদ্দেশ্য থাকে অন্য—ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠ থাকার চেয়ে কাল্পনিক কাহিনী পরিবেষণেই তাঁদের আগ্রহ থাকে বেশি। এর উদাহরণ হিসাবে স্কটের 'কেনিলওয়ার্থ', 'আইভ্যান হো', জর্জ এলিয়টের 'রমলা', টলস্টয়ের 'ওয়র এ্যান্ড পীস্', রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ' প্রভৃতির নাম করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের সঠিক লক্ষণ বুঝে নিতে হলে আমাদের আরো সূক্ষ্ম বিচার করতে হবে। এর জন্য প্রাথমিক ভাবে প্রয়োজন 'পোয়েটিক্স্' গ্রন্থে অ্যারিস্টটলের ঐতিহাসিক সত্য ও কাব্যিক সত্যের প্রভেদবিষয়ক মন্তব্যগুলি স্মরণ রাখা। সেগুলি ইতোপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, সুতরাং পুনর্বার তা উল্লেখের বোধহয় কোন প্রয়োজন নেই।

ঐতিহাসিক উপন্যাস কাকে বলে তা বিচার করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে

হবে, এটি প্রাথমিক ভাবে উপন্যাস—'ঐতিহাসিক' তার বিশেষণমাত্র। সুতরাং প্রথমে তাকে উপন্যাস হতেই হবে, এবং উপন্যাস হতে গেলে তাকে এমন মানবিক অনুভূতির গল্প শোনাতেই হবে যা আধুনিক মানুষকে আকর্ষণ করে—যার মধ্যে তথ্য নয়, হৃদয়ের আকুলতাই প্রধান। যদি এইরকম কোন মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ কাহিনী ইতিহাসে লেখক সন্ধান করতে পারেন তবেই তিনি ইতিহাসকে তাঁর কাহিনী-সূত্র হিসাবে বেছে নেবেন। ইতিহাসে অনেক জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাত্রার বিবরণ থাকে, বিলাসী রাজার কথা থাকে, বিলাসিনী নবাবজাদীর কথা থাকে—কাহিনী-প্রিয় অপ্রাপ্তমনস্ক পাঠকের আগ্রহ তা নিশ্চয়ই আকর্ষণ করতে পারে, কিন্তু আধুনিক পাঠক সর্বদাই সন্ধান করবেন মানবিক কাহিনী—তা যেখান থেকেই আহরণ করা হোক না কেন। সম্ভবত এই কারণেই খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা এতো দুরূহ। একটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ করলেই এই দুরূহতার পরিচয় পাওয়া যাবে।

● একটি বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশ্লেষণ :

বিশ্লেষণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসটি গ্রহণ করাই আমরা সমীচীন বিবেচনা করি, কারণ ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র কম লেখেননি—বিশুদ্ধ সামাজিক উপন্যাস ছাড়া প্রায় সর্বত্রই ইতিহাস অনুপ্রবেশ করেছে, অথচ তিনি নিজেই বলেছেন—"আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"

অবশ্য এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন 'রাজসিংহের' চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায়, তাই আলোচনার জন্য আমাদের এই উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণকেই গ্রহণ করা উচিত। এর আরো একটা কারণ এই যে, প্রথম সংস্করণের রাজসিংহ এবং চতুর্থ সংস্করণের রাজসিংহের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য। এই সর্বশেষ সংস্করণে এর আয়তনই যে পাঁচগুণ বেড়েছে তাই নয়, জেবউন্নিসা উপাখ্যান এবং ঔরঙ্গজেবের দুর্বলতার কাহিনী একেবারে নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই সর্বশেষ সংস্করণেরই সমালোচনা করেছিলেন এবং দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আবিষ্কার করেছেন—এক, এর তীব্র গতি, এবং দুই 'বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।' কিন্তু সম্ভবত একটি ত্রুটিপূর্ণ দিকও এই সমালোচনায় আছে, যেখানে তিনি ইতিহাস ও উপন্যাসঅংশকে পৃথকভাবে গ্রহণ করে তার নায়ক-নায়িকা বিচার করেছেন। এই দুই অংশ যদি সত্যিই পৃথক হয়ে থাকে তবে তাকে কখনোই সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাবে না। এ বিষয়ে আমাদের বিশ্লেষণ আমরা উপস্থিত করছি।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে মূল কাহিনী চঞ্চলকুমারীর, তিনি মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজীবের হাত থেকে বাঁচবার জন্য রাজপুত বীর রাজসিংহের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রাজসিংহ তাঁর সাধ্যমত রণনৈপুণ্য প্রকাশ করে চঞ্চলকুমারীর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। এই মূলকাহিনীর সঙ্গে অন্তত দুটি উপকাহিনী আমরা পাই—প্রধান দরিয়া-জেবউন্নিসা-মবারক প্রণয়বৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয় নির্মল-কুমারী-মানিকলাল-ঔরঙ্গজীব কাহিনী। সমগ্র উপন্যাসে যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা নিতান্ত কম নেই, রাজপুত-মোগলের দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ ইতিহাসের একটি পর্যায়কেও লেখক বিশ্বস্তভাবেই অনুসরণ করেছেন, তবু বলতে হবে তিনি নির্বাচন করেছেন কিছু মানবিক কাহিনী যার অন্তর্বাহিনী ঐকসূত্র প্রেম। চঞ্চলকুমারীর প্রেম বীরপূজা হিসাবে অভিহিত হতে পারে। রাজকুমারী কেবল নিজের রাজ্য উদ্ধার করবার জন্যই রাজসিংহকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কিনা, প্রবীণ রাজসিংহকে পতিত্বে বরণ করার ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র সংকোচ আছে কিনা, সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ হয়েই এই রাজপুত বীর তাঁকে পত্নী হিসাবে বরণ করেছিলেন।

তবে এর সঙ্গে উপকাহিনী হিসাবে জেবউন্নিসার যে বিচিত্র প্রেমাকর্ষণের আখ্যান লিপিবদ্ধ হয়েছে তেমন চিত্তাকর্ষক এবং রোমহর্ষক কাহিনী ইতিহাসের বৃত্ত ছাড়া সংগ্রহ করা নিশ্চয়ই সম্ভব হতো না, অথচ এর মানবিক আবেদন আমাদের অভিভূত করে। জেবউন্নিসা আজন্ম রাজকীয় গর্বে প্রতিপালিত হওয়ার জন্য এটাই বিশ্বাস করতেন যে নবাবজাদীর জন্য প্রেম নয়, কারণ প্রেমে অনেক দুঃখ আছে—তিনি ভোগ করবেন এবং তাঁর প্রতি প্রেমমুগ্ধ মবারকের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করবেন, কিন্তু তার প্রতি প্রেমের আকর্ষণ কখনই বোধ করবেন না। এই অত্যাচার, লাঞ্ছনা ও আঘাতের ছদ্মবেশে মবারকের প্রতি প্রেম যে কখন জাগ্রত হয়েছে হৃদয়ে, জেবউন্নিসা বুঝতেও পারেননি, পারলেন যখন তখন তাঁর নবজন্ম ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ আলোচনার অবিস্মরণীয় পংক্তিগুলি উদ্ধার করার প্রলোভন সামলানো শক্ত—"বিলাসিনী জেবউন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাটদুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য।...তাহার পরে আর সুখ পাইল না। কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেবউন্নিসা সম্রাটপ্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলার ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অন্তত জগৎবাসিনী রমণী।"

ঔরঙ্গজীব ও নির্মলকুমারীর যে বিক্ষিপ্ত উপকাহিনী এই উপন্যাসে পরিবেষিত হয়েছে, সেখানেও ইতিহাসের ঔরঙ্গজীব মানবিক মহিমায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন। সেই কারণেই আমরা বুঝতে পারি লেখক উপন্যাসের দাবি মিটিয়েছেন সবচেয়ে আগে। অর্থাৎ ইতিহাস থেকে তিনি এমন আখ্যানই নির্বাচন করেছেন অথবা সেই কাহিনীকে এমনভাবে উপস্থিত করেছেন যাতে তার মানবিক আবেদনই প্রাধান্য পায়। তাই রাজসিংহ বড়ো যোদ্ধা ছিলেন অথবা ঔরঙ্গীব—এই প্রশ্নের চেয়ে আমাদের অনেক

বেশি আকর্ষণ করে রাজসিংহ মানুষ হিসাবে কতো বড়ো ছিলেন এবং সম্রাট ঔরঙ্গজীব ইতিহাসের পাতা থেকে সজীব মানুষ হিসাবে কতোটা ধরা দিয়েছেন। হতে পারে উপকাহিনী, তবু জেবউন্নিসা-মবারকের আখ্যান, চতুর্থ সংস্করণেই যার প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি, তাই আমাদের অনেক বেশি আকর্ষণ জাগায়।

অথচ ইতিহাস এইসব চরিত্র সম্বন্ধে যে প্রতীতি বা Impression তৈরি করে তা থেকে কোন বড়ো রকমের বিচ্যুতিও যে আমরা এই উপন্যাসে দেখতে পাই না, একটি দীর্ঘ আলোচনায় যদুনাথ সরকার সে কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেইসব স্থানেই কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন যেখানে দুটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সংযোগ সাধন করতে হয়েছে এবং ইতিহাস যেখানে বিশেষ কোন তথ্য দিতে পারে নি। যেমন, ইতিহাস আমাদের এই ধারণাই দেয় যে ঔরঙ্গজীব-দুহিতা জেবউন্নিসা সত্যই ছিলেন অত্যন্ত বিলাসী এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির নারী। পরবর্তী জীবনে তাঁর চরিত্রে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে ইতিহাস স্পষ্ট করে কিছুই বলে না এবং তারই সুযোগ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটি অপূর্ব প্রেমের বৃত্তান্ত নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন। এতে ইতিহাসের মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয়নি, অথচ উপন্যাসের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে বিপুল ভাবে। লেখকের বিশিষ্ট ভাষা ব্যবহার যে এ ব্যাপারে তাঁকে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে, এ কথাও সুনিশ্চিত ভাবে আমাদের স্বীকার করতে হবে।

ইতিহাসের বিচ্যুতিকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে ত্রুটিকে বলা হয় কালানৌচিত্ত-দোষ বা Anachronism, এই উপন্যাসে সেই ধরনের কোন ত্রুটিও আমরা দেখতে পাই না। যে যুগের কাহিনী লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন, সেই যুগের পরিবেশ ও বাস্তবতা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সজাগ। আসলে সব রকমের উপন্যাসেই সম্ভাব্যতার নিয়ম তিনি প্রখরভাবে মেনে চলেছেন, এই কারণেই তাঁর প্রথম রচিত তিনটি উপন্যাস রোম্যান্সজাতীয় হলেও আমরা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ ঔপন্যাসিকের সম্মান দান করেছি।

ফলত, সেই সম্ভাব্যতার (probability) সচেতন বোধে, ঔপন্যাসিক বিষয় হিসাবে মানবিক কাহিনীর প্রতি প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপে, ঐতিহাসিক প্রতীতির সুরক্ষায় এবং সর্বোপরি ইতিহাস ও আন্তরিক অনুভূতির সুসমঞ্জস বিন্যাসে 'রাজসিংহ' যে একটি সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসে পরিণত হয়েছে এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

খ. সামাজিক উপন্যাস

সামাজিক উপন্যাসের স্বরূপ এক কথায় বোঝাতে গিয়ে অ্যাব্রামস্ তাঁর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন, "The sociological novel emphasizes the

influence of social and economic conditions on characters and events." অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সঙ্গে সমাজসংস্কারের বাসনা ঔপন্যাসিকের থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে—বাসনা যদি বা থাকে তা অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্টই থেকে যায়, সমস্যাটির প্রতিফলনই এই ধরনের বেশির ভাগ উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সাধারণভাবে লেখা অনেক উপন্যাসেই তৎকালীন সমাজ বা রাষ্ট্রনীতি অনিবার্য-ভাবে এসে পড়ে, কিন্তু যখন শ্রেণীবিভাগের জন্য উপন্যাস বিচার করা হবে তখন দেখতে হবে একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যাই তার প্রধান উপজীব্য কিনা। যে চরিত্রগুলি উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে, সমাজ বা গৃহীত সেই সামাজিক সমস্যার দ্বারা তারা আলোড়িত কিনা সে কথাও চিন্তা করে দেখা দরকার। কয়েকটি উপন্যাসের উদাহরণ দিলেই এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রকৃতি বোঝা যাবে। কিংস্‌লে-র 'ঈস্ট', ডিকেন্সের 'হার্ড টাইম্‌স্‌', মেরি স্টো-র 'আংকল টম্‌স্‌ কেবিন', আপটন সিন্‌ক্লেয়ার-এর 'দি জাঙ্গল্‌', বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রমেশচন্দ্র দত্তর 'সমাজ' ও 'সংসার', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সহরতলি', রমাপদ চৌধুরীর 'আকাশ প্রদীপ' প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত।

● একটি বাংলা সামাজিক উপন্যাস

সামাজিক উপন্যাসের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য আমরা একটি বাংলা সামাজিক উপন্যাসের ব্যাখ্যা করতে পারি। সমাজসচেতন লেখক হিসাবে খ্যাত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লী সমাজ' উপন্যাসটি আমাদের আলোচনার জন্য গৃহীত হতে পারে।

নরনারীর ব্যক্তিগত সমস্যা, এবং অধিকাংশ সময়েই প্রেমঘটিত সমস্যা, শরৎচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই থাকে। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসেও একটি প্রেমঘটিত আখ্যান আছে, সেটি রমা ও রমেশের প্রেমাকর্ষণের ফল্গুধারা; কিন্তু সামাজেতিহাসের আলোড়িত ঘটনাধারায় তা প্রায়শই চাপা পড়ে যায়। গ্রাম থেকে বহুদিন নির্বাসিত এবং পশ্চিমের কোন শহরে বড়ো হওয়া রমেশ গ্রামে ফিরতে বাধ্য হয় পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে। গ্রাম সম্বন্ধে রোম্যাণ্টিক অনেক ধারণা তার ছিল, তার ওপর আদর্শবাদী এই যুবকের মনেও গ্রামের উন্নতির অনেক পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু প্রধানত জ্ঞাতিশত্রু বেণী ঘোষাল-সহ গ্রামের অন্যান্য মাতব্বর ও ব্রাহ্মণশ্রেণীর অপদার্থ গ্রাম্য দলাদলি ও জঘন্য স্বার্থপরতায় ক্রমে ক্রমে তা অন্তর্হিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই গ্রাম্য চক্রান্তের শিকার হয়ে তাকে জেলে যেতে হয় এবং যখন গ্রাম থেকে ফিরে যাওয়াই সে মনস্থ করেছে তখন গ্রামের লোকেরা তাকে স্বীকৃতি জানায়, রমেশ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে বলে মনে হয়।

এই উপন্যাসকে আমরা সামাজিক শ্রেণীতে ফেলতে পারি এই জন্য যে, সমস্যাটি নিঃসন্দেহে পল্লীসমাজের। অর্থনৈতিক দিক থেকে হৃতশ্রী পল্লীর জীবনে যে গ্রাম্য দলাদলি এবং ঘৃণ্য স্বার্থপরতা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার প্রকৃতি এবং তা নিরসনের উপায় এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। গ্রামের লোকেরা এত শোষণের, শিকার হয়েছে যে কোন মানুষের সৎ উদ্দেশ্যকে তারা বিশ্বাস করে না, বিবেক বর্জন দিয়ে নিজেদের সামান্যতম লাভও তারা উৎসাহের সঙ্গে সংগ্রহ করে নেয়, ভালোমানুষিকে তারা মানুষের দুর্বলতা মনে করে। গ্রাম সম্বন্ধে রোম্যাণ্টিক ধারণা যখন রমেশের ক-দিনেই চলে যায় এবং গ্রামজীবনে সে হাঁফিয়ে ওঠে, তখন গ্রামেরই এক অসাধারণ মহিলা জ্যাঠাইমা তাকে বলেছিলেন সমস্যাটিকে আন্তরিক-ভাবে বিচার করতে। বাইরে থেকে অগভীরভাবে দেখলে গ্রামের মানুষের এই স্বার্থপরতা এবং নীচ দলাদলি অসহ্য বলেই মনে হবে, কিন্তু সমস্যাটিকে বিচার করতে চাইলে এদের একজন হিসাবেই সেটি তাকে দেখতে হবে। তখন বোঝা যাবে, এর জন্য দায়ী দুটি কারণ—এক ॥ অর্থনৈতিক অবমূল্যায়ন, এবং দুই ॥ শিক্ষার অভাব। অর্থনৈতিক দুরবস্থার চরমে পৌঁছানোর ফলেই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রায় লোপ পেয়েছে এবং সামান্যতম স্বার্থের সন্ধান পেলে মানুষ তা গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হচ্ছে। দীননাথের মতো বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যে আচরণ করেন তা ঘৃণ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এই আচরণের মূলে নিহিত আছে এই করুণ অর্থনৈতিক অবস্থা। ব্যাপারটি প্রায় নৃশংসতার পর্যায়ে চলে গেলেও সুস্থ অনুভবী মন এই চরম সমস্যাটি উপলব্ধি করতে পারবে। কুঁয়াপুর গ্রামে প্রথম এসেই ধর্মদাস চাটুজ্যে এবং গোবিন্দ গাঙ্গুলির যে ঘৃণ্য কলহ রমেশ দেখেছে, তাতে পল্লীসমাজ সম্বন্ধে বীতস্পৃহ হওয়া তার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। জ্যাঠাইমাই তাকে বুঝিয়েছেন—'এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্বল—তা যদি জানিস রমেশ, এদের উপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হবে।'

দ্বিতীয় কারণ যে শিক্ষার অভাব, সে কথাও জ্যাঠাইমাই রমেশকে বলেছিলেন। রমেশের সমস্ত অভিযোগ প্রায় নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন এই ঘৃণ্য দলাদলি এবং জঘন্য স্বার্থপরতা কেবল যথার্থ জ্ঞানের অভাবের জন্যই। সেই জন্যই তাঁর অনুরোধ—"আলো জ্বেলে দে রে, শুধু আলো জ্বেলে দে! গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কানা হয়ে গেল; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করে দে বাবা! তখন আপনি দেখতে পাবে তারা কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা ধলো।"

'পল্লীসমাজ'কে সামাজিক উপন্যাস বলে অভ্রান্ত স্বীকৃতি দেবার দ্বিতীয় কারণ, পল্লীসমাজের অন্তর্লীন সমস্যাই গভীরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে উপন্যাসের প্রধান ঘটনাধারা ও চরিত্রের আচরণকে। বেণী ঘোষালের আচরণ অবশ্য এক তরফা, তার কারণ অনুমান করতে বিশেষ সাহিত্যবুদ্ধির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু রমেশের সমস্ত শুভ উদ্যোগ এবং মানবিকতা পল্লীসমাজের জটিলতা

কীভাবে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছি তা আমরা আমাদের সাহিত্যবুদ্ধি দিয়েই বুঝি। এর চেয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ, কোমল এবং আকর্ষণীয় দিক এই উপন্যাসের আছে, সেটি হল রমা ও রমেশের আপাত বোঝাপড়ার অভাব সত্ত্বেও এক গভীর ও আন্তরিক প্রেম। এই প্রেম যে কখনোই প্রকাশ পায়নি তার একটা কারণ নিশ্চয়ই হিন্দু নারী হিসাবে রমার আজন্ম সংস্কারের বাধা—সে যে বিধবা এই সত্য সে নিজেকে কখনোই ভোলাতে পারে না। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বড়ো কারণ হল এই যে, সে ভুলতে পারে না তার গ্রাম্যসমাজকে যাকে সে আজন্ম চেনে—যেখানেই সে এত বড় হয়েছে। রমার কোনরকম দুর্বলতা যদি প্রকাশ পায় রমেশের প্রতি, তাহলে রমার বাড়ির যে-কোন সামাজিক অনুষ্ঠান সমাজপতিরা বয়কট করবেন, ভাই যতীনের ভবিষ্যৎ জীবন বিষময় হয়ে উঠবে, এ কথা রমা ভালো করেই জানে। এ ছাড়াও তার মনে আশঙ্কা, এ জন্য রমেশকে কথা শুনতে হতে পারে এবং সেরকমটা ঘটলে এক-একটি সামান্য আঘাতও তার মনে অসামান্য হয়ে বাজবে। সুতরাং তার সমস্ত আচার ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করেছে সমাজ। এই কারণেই এই উপন্যাসকে আমাদের সামাজিক উপন্যাস আখ্যা দিতে সম্ভবত কোন দ্বিধা থাকবে না।

এও. রাজনৈতিক উপন্যাস

অধিকাংশ সাহিত্য-প্রকরণ জাতীয় গ্রন্থে রাজনৈতিক উপন্যাস নামে কোন পৃথক শ্রেণীর উপন্যাসকে স্বীকার করা হয়নি, অথচ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সাম্প্রতিককালে রাজনীতিমুখ্য উপন্যাসের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং উপন্যাসের আলোচনায় এই শ্রেণীটির উল্লেখ আমাদের বার বার করতে হয়। বিখ্যাত রাজনৈতিক চরিত্র নিয়ে লেখা উপন্যাসের সংখ্যা ইংরেজিতে কম নয়। বাংলায় চাণক্য সেনের 'রাজপথ জনপথ', 'মুখ্যমন্ত্রী' আধুনিক কালে এই জাতীয় উপন্যাসের উদাহরণ।

অবশ্য শ্রেণীটি স্বীকার না করলেও, 'বাংলায় যে রাজনীতি বা বিপ্লবকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস আছে,' একথা বাংলা সাহিত্য-প্রকরণের পথিকৃৎ-গ্রন্থে স্বীকার করা হয়েছে। সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাস লিখেছেন—"বাংলার বৈপ্লবিক জাতীয় আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া কয়েকখানা উপন্যাস লিখিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', গোপাল হালদারের 'একদা,' বনফুলের 'অগ্নি', দীপক চৌধুরীর 'পাতালে এক ঋতু'-র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।"

প্রকৃতিতে রাজনৈতিক হলেও এই শ্রেণীটিকে 'রাজনৈতিক উপন্যাস' নামে তিনি যে স্বীকৃতি দেননি তার কারণ অবশ্য খুব অস্পষ্ট নয়। সম্ভবত রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যকে মিলিয়ে নেওয়া হবে কী সূত্রে, এ ব্যাপারে অস্বস্তি থাকার জন্যই শ্রীশচন্দ্র

খ্যাশ এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমালোচকগণ এই শ্রেণীটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেননি। উপন্যাস যে জীবনকে ধরে, রাজনীতি সেখানে থাকতে পারে কিনা, অথবা রাজনৈতিক জীবন উপন্যাসের বিষয় হতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন ওঠা উচিত বলে আমাদের মনে হয় না, কারণ উপন্যাসের বিষয়বস্তু অত্যন্ত ব্যাপক। প্রশ্ন উঠতে পারে রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রকৃতি কী হবে—নিকোলাই অস্ত্রোভ্স্কি-র 'How steel was tempered' জাতীয় উপন্যাসের সমাজ-বাস্তবতা বা এরকম কোন রাজনৈতিক আদর্শমূলক রচনা, অথবা ডস্টয়ভ্স্কি-র 'The Possessed' উপন্যাসের মতো কেবল একটি রাজনৈতিক বাতাবরণ। এই সমস্যার যে কোন সঠিক সমাধান এখনও হয়নি, সমালোচক কার্লো কপোলা একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে তাই নিয়েই আক্ষেপ করেছেন—"The problem of defining the political novel has not been dealt with in any definitive way; hence the very nature of this particular category of novel—its proper subject matter, its scope, its form remains open to question."

আমরা অবশ্য আমাদের সাধারণ সাহিত্যবুদ্ধিতে বুঝি যে উপন্যাসকে যদি আগে উপন্যাস হতে হয় তবে মানবিক অনুভূতির কাহিনী, মানুষকে আলোড়িত করার কাহিনীই তাকে শোনাতে হবে। এরপর দেখতে হবে মানুষের যে জীবনের কথা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে তার প্রকৃতি রাজনৈতিক কিনা, অর্থাৎ রাজনীতিই এই উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করছে কিনা। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে এটা বিচার করে দেখা, রাজনীতি এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি কিনা—এর অর্থ, রাজনীতি এর সঙ্গে এমন অভ্রান্তভাবে জড়িয়ে আছে কিনা যাতে রাজনীতি বর্জন করলে উপন্যাসটি আর দাঁড়াতেই পারে না। আমাদের বিচারপদ্ধতি স্পষ্টতর হবে একটি বিশেষ উপন্যাসের পর্যালোচনা করলে।

● একটি বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস

সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' এক সময়ের অত্যন্ত সাড়াজাগানো উপন্যাস। এই উপন্যাসটির শ্রেণী সম্বন্ধে বিভিন্ন সুধী সমালোচকের বিভিন্ন মত। কেউ মনে করেন রাজনীতির কথা প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়েছে বলেই একে রাজনৈতিক উপন্যাস আখ্যা দেওয়া উচিত; কারো মতে কারাগারের অভ্যন্তরে সমগ্র উপন্যাস রচিত বলে একে কারা-উপন্যাস বলাই বিধেয়; কেউ মনে করেন এটি মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস, সেই জন্যই এই ধরনের উপন্যাসের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী যে উপস্থাপন-রীতি (চরিত্রকথন মূলক) তাই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে; আবার কেউ কেউ মনে করেন সঙ্কটসঙ্কুল মুহূর্তের বর্ণনায় এবং অবিরত অতীতকথন পদ্ধতির (ফ্ল্যাশ ব্যাক) প্রয়োগে এটি চেতনা-প্রবাহমূলক উপন্যাসের সার্থক সূচনা

করেছে। এইসব মতের কোনটিই সম্পূর্ণ ভুল আমরা বলতে পারবো না, অন্তত ভুল করার যথেষ্ট কারণ যে রয়েছে এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে; কারণ প্রত্যেকটি ব্যাপারই উপন্যাসে উপস্থিত। কিন্তু শ্রেণীবিচারের যে বিশেষ পদ্ধতি আমরা নির্বাচন করেছি তার দ্বারা বিচার করলেই সম্ভবত সঠিক সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারবো।

'জাগরী' উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিশেষ জটিল নয়। পূর্ণিয়াপ্রবাসী এক বাঙালী পরিবারকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাসে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের এক বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। পরিবারের কর্তা গান্ধীবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ এক স্কুলশিক্ষক। আদর্শের কারণেই স্কুলের চাকরি ছেড়ে বাড়িতে গান্ধী-আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ 'মা' চরিত্রটি স্বামীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। যদিও রাজনীতি এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের সূক্ষ্ম পার্থক্য তিনি বোঝেন না, কিন্তু যে কোন ব্যাপারেই অক্লান্ত সেবা ও পরিশ্রমে তিনি কাতর নন। বিলু ও নীলু তাঁদের দুই ছেলে, এই দুই ছেলেকে নিয়ে আনন্দিত ও স্বপ্নসম্ভাবনাময় সংসার কেমন করে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে—রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য কেমন করে পরিবারের তিন সদস্যের মধ্যে ব্যবধান রচনা করতে থাকে, সেটাই উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন। অবশ্য এর কালসীমা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, একটি রাত্রিমাত্র—কিন্তু ভয়াবহ রাত্রি, চারটি চরিত্রকেই জেগে বসে থাকতে হয় কিছু বিক্ষত স্মৃতির মুখোমুখি হবার জন্য। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে বন্দী বিলু ফাঁসির আসামী, রাত্রি প্রভাত হলেই সে আদেশ কার্যকর হবে। স্বামীর সঙ্গে যোগ দেবার অজুহাতে সেখানে 'আওরৎ কিতা'-য় মা ও বন্দী বাবা তো আছেনই। কারার বাইরে আছে শুধু নীলু কিন্তু এ রাতে নিদ্রা তার পক্ষে অসম্ভব, যেহেতু রাজনৈতিক মতের অমিলে সে-ই ধরিয়ে দিয়েছে দাদাকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভয়াবহ পরিণতি ঘটে নি, কিন্তু চারটি চরিত্রের অন্তঃসমীক্ষণে বিচ্ছিন্ন চিন্তার মধ্যে দিয়েও যে মোটামুটি অখণ্ড কাহিনী পাওয়া গেছে তাতে বৃত্ত গঠন বা চরিত্র নির্মাণ, কারো প্রতিই অবিচার করা হয়নি।

'জাগরী'-কে আমরা চেতনাপ্রবাহ মূলক উপন্যাস বলবো কিনা সে প্রশ্ন এখানে সংগত নয়, কারণ এটি মূলত প্রয়োগগত একটি রীতি—যে রীতিতে বিভিন্ন বিষয়ের উপন্যাসই লেখা সম্ভব, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস যার সবচেয়ে ভালো ক্ষেত্র। ঠিক এই কথাই বলা যায় এর চরিত্রকথন মূলক উপস্থাপন রীতি সম্পর্কে। এই রীতিটিও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী হতে পারে কিন্তু অন্য শ্রেণীর উপন্যাসে এটি যে ব্যবহার করা যাবে না, এমন কোন কথা নেই। কারা-উপন্যাস বলে উপন্যাসের একটি শ্রেণী সম্প্রতি স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছে, কিন্তু সেই ধরনের উপন্যাসে আমরা সাধারণত অন্ধকারের জগৎ বা underworld-এর সংবাদই পেয়ে থাকি এবং চরিত্রগুলিও হয়ে থাকে ঘৃণ্য বা আপাতঘৃণ্য। 'জাগরী' উপন্যাসের

তিনটি চরিত্র কারাগারে আছে এই পর্যন্ত, কারাগারের সঙ্গে এই কাহিনীর অন্য কোন সম্পর্ক নেই।

'জাগরী'কে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস মনে হওয়া সম্ভব, খুবই সম্ভব। কিন্তু এর প্রধান কারণ এর চেতনাপ্রবাহমূলক পদ্ধতি এবং চরিত্রকথনমূলক উপস্থাপন রীতি। কাজেই এই বহিরঙ্গ উপকরণকে একবার সরিয়ে রেখে চিন্তা করা যায়, এর শ্রেণীবিচারে যদি তাতে কিছু সুরাহা হয়; এবং সে ভাবে ভাবা আমাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হয় না। এক রাত্রির কাহিনী করতে গিয়েই ঔপন্যাসিককে অতীতচারণ, বিচ্ছিন্ন স্মৃতিচারণ এবং কার্যত চেতনাপ্রবাহ রীতির অনুসারী হতে হয়েছে। একই কারণে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে জবানী দিতে হয়েছে, অন্যভাবে তা আকর্ষণীয় করা যেতো না। কিন্তু যদি এইভাবে অতীতচারিতার মধ্যে না গিয়ে ঘটনা যেমন ঘটেছে—পিতার সুখী সংসার, বিলু ও নীলুর অন্য রাজনৈতিক মতের প্রতি ক্ষীণ উৎসাহ, সেই উৎসাহের বৃদ্ধি ও অন্য রাজনৈতিক দলে যোগদান, বিলু ও নীলুর রাজনৈতিক মনান্তর, শেষে চরম অকৃতজ্ঞ ঘটনা—এইভাবে কাহিনী অগ্রসর হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না। এইরকম প্রত্যক্ষ রীতিতে উপন্যাস অগ্রসর হলে কিন্তু চেতনাপ্রবাহমূলক রীতিও যেমন অনিবার্য মনে হতো না, চরিত্রকথন রীতির পরিবর্তে প্রথম পুরুষের উপন্যাসও আমরা খুব সহজেই মেনে নিতে পারতাম। সে ক্ষেত্রে একে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ভাবার সম্ভাবনা অনেক কমে যেতো। উপন্যাসটি এ ভাবে লিখলে এর রসসংবেদন কমে যেতো কিনা সে কথা কিন্তু আমরা ভাবছিনা, এ বিষয়ে কোন মন্তব্যও করছি না, আমাদের বক্তব্য এ ভাবেও উপন্যাসটি রচিত হতে পারতো—উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা লেখককে বর্জন করতে হতো না।

কিন্তু সে চিন্তা সত্যিই বর্জন করতে হতো যদি লেখক রাজনীতি বাদ দিয়ে এই উপন্যাস লেখার চেষ্টা করতেন। চারটি চরিত্রের গূঢ় মনস্তত্ত্ব এই উপন্যাসে নিশ্চয়ই ফুটেছে, কিন্তু এই মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার উৎস তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যেই নিহিত আছে। দুই ছেলে নিয়ে বাবা-মার সুন্দর সংসারে ফাটল ধরার অন্য কোন রাস্তাই খোলা ছিল না—এই ঘনিষ্ঠ সম্প্রীতির মধ্যে সংশয়, বিদ্বেষ ও অসহনীয়তার ব্যবধান সৃষ্টি করেছে রাজনীতি। সুতরাং রাজনীতিই এই উপন্যাসের নিয়ন্তা, তার কেন্দ্রীয় শক্তি, যাকে বাদ দিলে উপন্যাসটি লেখা সতীনাথ ভাদুড়ির পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না। এই কারণেই আমরা মনে করি, শ্রেণী বিচার করতে গিয়ে রাজনীতিকেই আমাদের এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। মনের কথা এ উপন্যাসে অনেক আছে, তার খুঁটি-নাটি পরিচয় দেবার সামর্থ্যও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় নি, কিন্তু যে দ্বন্দ্ব ও জটিলতা থাকলে সেই বিশ্লেষণ মনস্তাত্ত্বিক অভিধা পেতে পারে, এখানে সেই দ্বন্দ্ব ও আন্তরিক সংঘাত ছিল না। অতীত স্মৃতিরোমন্থন, আসন্ন সর্বনাশের কথা ভেবে সকলের কথা ও শৈশবের ঘটনা মনে পড়া খুব স্বাভাবিক ঘটনা। এর সঙ্গে দুটি চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব বা একটি চরিত্রের দুটি প্রবণতার জটিল সংঘাতের তেমন কোন

মিল নেই। 'জাগরী' উপন্যাসের চালিকা শক্তি রাজনীতি, এর ফলেই চারটি চরিত্র কারাগারে এসেছে, এর জন্যই চরিত্রগুলির জাগর বিষাদ উপন্যাসের কল্পশরীর গঠন করতে পেরেছে, এবং একমাত্র এর অভাবেই উপন্যাসটির পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব ছিল না। সুতরাং 'জাগরী'-কে রাজনৈতিক উপন্যাস আখ্যা দিতে আমাদের কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়।

ট. আঞ্চলিক উপন্যাস

উপন্যাসের শ্রেণী হিসাবে আঞ্চলিক উপন্যাস বা Regional novel স্বীকৃতি পেয়েছে মূলত টমাস হার্ডির 'ওয়েসেক্স নভেলস্' প্রকাশিত হবার পর। একটি বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে উপন্যাস লেখা হলেই যে তা 'আঞ্চলিক' অভিধায় ভূষিত হতে পারে, এমন কিন্তু নয়। অ্যাব্রামস্ এই শ্রেণীর উপন্যাসের পরিচয় দিতে গিয়ে মাত্র একটি দীর্ঘ বাক্যে তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন, তিনি বলেছেন—"The regional novel emphasizes the setting, speech, and customs of a particular locality, not merely as *local color,* but as important conditions affecting the temperament of characters, and their ways of thinking, feeling and acting."

অর্থাৎ বিশেষ অঞ্চলকে বেছে নিয়ে তার বিশিষ্ট প্রবণতা বা উৎসব দিয়ে উপন্যাসে একটি আঞ্চলিক পটভূমি নির্মাণ করলেই তাকে আমরা আঞ্চলিক উপন্যাস বলতে পারি না। আমাদের দেখতে হবে সেই অঞ্চলটির কোন আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, তার একটা জৈবিক চরিত্র আছে কিনা এবং সেই চরিত্র উপন্যাসের প্রধান পাত্রপাত্রীকে প্রভাবিত করেছে কিনা—অর্থাৎ তাদের আচার-আচরণে এ কথা বোঝা যায় কিনা যে তারা ওই অঞ্চলসম্ভব মানুষ। একটি বিশেষ অঞ্চলের যে বৈশিষ্ট্য আছে তা যদি চরিত্রগুলি আত্মসাৎ করে এবং তারাই যদি উপন্যাসে বিচরণ করে, তাহলে ঔপন্যাসিক চরিত্র আসলে অঞ্চলটিরই প্রতিনিধিত্ব করে, অঞ্চলটিই বিশেষভাবে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে উপন্যাসে। এই ভাবেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে হার্ডির উপন্যাসে এগ্ডন হীথের উষর প্রান্তর—এই অঞ্চলের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য চরিত্রগুলির মধ্যে এমন করে খুঁজে পাওয়া যাবে অঞ্চলের সঙ্গে মানুষগুলিকে আর বিচ্ছিন্ন করে দেখাই সম্ভব হবে না। ঠিক এই ভাবেই একাত্ম হয়ে উঠেছে বীরভূমের রুক্ষ রাঢ় প্রকৃতির সঙ্গে অন্বিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু চরিত্র—'বেদেনী' গল্পের রাধিকাকে যাদের মধ্যে সবচেয়ে আগে আমাদের মনে পড়তে পারে, যার অকারণ নিষ্ঠুরতা আমাদের স্তম্ভিত করে। বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্করের প্রসঙ্গেও তাই 'আঞ্চলিক উপন্যাসের' স্বীকৃতি প্রথম দেওয়া হয়েছে।[৮]

আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি দিতে গেলে তাই সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক

বৈশিষ্ট্য, রীতিনীতি প্রকাশ পেয়েছে কিনা সে তো দেখতেই হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রধান ভাবে দেখতে হবে প্রধান চরিত্রগুলি অঞ্চলসম্পৃক্ত হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা। আমরা মনে করি এখানে আরো একটি জিনিস লক্ষ করার দরকার আছে, অন্তত 'আঞ্চলিক উপন্যাস' হিসাবে তার শ্রেণীবিভাগ সঠিক কিনা তা বুঝবার জন্য। একটি বিশেষ অঞ্চলই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি কিনা, বিশেষ আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই উপন্যাসটি নিয়ন্ত্রিত করছে কিনা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য সেই অঞ্চলটিকে বর্জন করে ওই বিশেষ উপন্যাস লেখা সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে। এমন হতে পারে, যে-কোন অঞ্চলেই এমন একটি ঔপন্যাসিক আখ্যান সংঘটিত হওয়া সম্ভব, আবার এমনও হতে পারে যে সেই বিশেষ অঞ্চল ছাড়া উপন্যাসটি দাঁড়াতেই পারে না। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রেই অঞ্চলটির অনিবার্যতা প্রমাণিত হয় এবং উপন্যাসটি আঞ্চলিক বিশেষণে ভূষিত হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের নাম করতে পারি। দোবরু পান্না, ভানুমতী, যুগলপ্রসাদ, মঞ্চী, গণু মাহাতো, ধাতুরিয়া, ধাওতাল সাহু, রাজু পাঁড়ে প্রভৃতি বিচিত্র উজ্জ্বল চরিত্র একেবারে নিষ্প্রভ এবং তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে এদের ভাগলপুরের সেই বিশেষ অঞ্চল থেকে বার করে আনলে। এ থেকেই বোঝা যায়, সেই অরণ্যপ্রকৃতিই এই উপন্যাসের নিয়ামক শক্তি।

● একটি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস

বিশ্রুত কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে বিবেচিত হয়। শ্রেণী হিসাবে একে আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় কিনা চিন্তা করে দেখা যেতে পারে।

উপন্যাসটি রচিত ধীবরগোষ্ঠীর মানুষের জীবনচিত্র হিসাবে। পদ্মা নদীর তীরবর্তী এক গ্রাম কেতুপুর এই উপন্যাসের পটভূমি। সেখানে ভদ্র গৃহস্থের চাপে ধীবরগোষ্ঠীর বাস অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি স্থানে। উপন্যাসে ধীবরদের প্রতিনিধিত্ব করেছে কুবেরের পরিবার—কুবের, তার পংগু স্ত্রী মালা এবং তাদের ছেলে-মেয়ে, যদিও আরো অনেক ধীবর এবং তাদের পরিবার কাহিনী সূত্রে এসেছে। সারা বছর এদের জীবিকা খেয়া পার করা, গহনার নৌকা চালানো এবং টুকিটাকি অন্যান্য এমন সব কাজ যাতে ভরপেট আহারের সংস্থান শক্ত হয়ে পড়ে। এদের কাজের জোয়ার আসে বর্ষাকালে ইলিশের মরশুমে। রাত জেগে ইলিশ ধরার পালা চলে—অবশ্য পরের নৌকায়, নিজের নৌকা ধীবরদের বিশেষ নেই। তাই লাভের বিরাট অংশ চলে যায় অন্যদের কাছেই, তবু এই সময়টাকে তারা অত্যন্ত সুদিন বলেই মনে করে।

উপন্যাসের মানবিক আকর্ষণ শুরু হয় বন্যাবিধ্বস্ত গ্রাম থেকে কুবের তার

বিবাহিতা শ্যালিকা কপিলাকে নিয়ে আসার পর। কপিলা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'জীবন রসের রসিক'—সেই উচ্ছল মেয়েটিকে পেয়ে এতোদিনে কুবের বোঝে পংগু স্ত্রী মালার কাছে সে কী পায়নি। বহু সদস্যের পরিবারে অবহেলিতা কপিলাও বিবাহিতা জীবনে মোটেই সুখী ও স্বচ্ছন্দ নয়। প্রাকৃতিক নিয়মে যা হবার তাই হয়, কুবের ও কপিলা মানসিক দিক থেকে অনেক কাছাকাছি আসে। এদিকে কেতুপুর গ্রামে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হওয়া হোসেন মিয়া নামক মহা শক্তিধর পুরুষ কুবেরকে কিছু অনুগ্রহ দেখাতে শুরু করে। এতে লাভ যেমন আছে আশঙ্কাও তেমনি আছে, কারণ ময়নাদ্বীপ নামে প্রায় বসবাসের অযোগ্য এক পরিত্যক্ত দ্বীপে যে জনবসতি গড়ে তোলার চেষ্টা সে চালিয়ে যাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে, তারই শিকার হতে পারে এতে কুবের। এই আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দাঁড়ায়। একটি মিথ্যা-চুরির অভিযোগ থেকে বাঁচাবার ছুতো করে হোসেন কুবেরকে ময়নাদ্বীপে পাঠাতে চায়, রাজিও হতে হয় কুবেরকে, তবে সে যাবার সময় সঙ্গে নেয় কপিলাকে—"হ, কপিলা চলুক সঙ্গে। একা অতদূরে কুবের পাড়ি দিতে পারিবে না।" এটাই উপন্যাসের অন্তিম বাক্য।

আঞ্চলিক উপন্যাসের আপাতবৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার করতে হলে একথা অস্বীকার করার কোন কারণ নেই যে 'পদ্মানদীর মাঝি'তে আঞ্চলিক স্বাদ অনেকটাই ধরে রাখা হয়েছে। পদ্মানদীর তীরবর্তী একটি ধীবরপল্লীর পটভূমি সাহিত্যিক প্রয়োজনে যতোটা বাস্তব করে তোলা প্রয়োজন ঠিক ততোটাই করেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—সংক্ষিপ্ত এই উপন্যাসে তার বেশি বর্ণনাও নেই, কমও নেই। কুবেরের ঘরদোর এবং বিষয়-আশয়ের একবারের বর্ণনাতেই আমরা তার অবস্থার কথা জেনে যাই। ওই ধরনের পল্লীতে একটি সামান্য ধীবরের জীবনযাত্রা কেমন হতে পারে, তার মানসিকতা কী রকম হওয়া সম্ভব তারও একটি রূপরেখা আমরা গ্রহণ করতে পারি উপন্যাস থেকেই। গ্রাম্যমেলার একবারের যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, পুজোর সময় ঠাকুর দেখার যে গ্রাম্য পরিবেশ একেছেন তা থেকেই অনুভূতিশীল পাঠক সমগ্র পটভূমি অভ্রান্তভাবে চিনে নেবেন। আসলে নিজেকে বাস্তবপন্থী প্রমাণ করবার জন্য লেখককে কষ্ট করে বাস্তব পরিবেশ ও বাস্তব জীবন-চর্যা পরিস্ফুট করতে হয়নি, তাঁর কলমের যে সূক্ষ্ম আঁচড়গুলি পাওয়া গেছে তাতেই ওই অঞ্চল, এবং তাদের অধিবাসী আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এ কাজে লেখককে যোগ্য সহায়তা দান করেছে ওই অঞ্চলের উপভাষা এবং তা রচনায় লেখকের অনায়াস সাফল্য। সাধারণ পাঠক বা ওই ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে ভাষা একটু অস্বস্তির সৃষ্টি করতে পারে ভেবেই মুখের ভাষা তিনি খুব বেশি ব্যবহার করেননি, কিন্তু যেটুকু করেছেন তা এমন অনিবার্য হয়ে উঠেছে যে উপন্যাসের পক্ষে এই আঞ্চলিক উপভাষা হয়ে উঠেছে সম্পদ। অনভ্যস্ত বা অপরিচিত পাঠকের অস্বস্তিও দীর্ঘক্ষণ থাকার কথা নয়, কারণ পটভূমি ও জীবনা-

চরণের সৌজন্যে সেখানকার অপরিহার্য ভাষাও তার বোধগম্যতার কাছাকাছি এসে যায় খুব তাড়াতাড়িই।

এবার চিন্তা করা যায় আঞ্চলিক উপন্যাসের আন্তরিক লক্ষণ। আঞ্চলিক উপন্যাস চরিত্রের আচার-আচরণ, মেজাজ-মর্জি, তাদের চিন্তা-অনুভূতি—সব কিছুকে এমন ভাবে প্রভাবিত করে যে সেই অঞ্চলসম্পৃক্ত মানুষ ছাড়া সেরকম ঘটনাক্রম ঘটতে পারে বা এই আচরণ সম্ভব হতে পারে এটাই আমরা ভাবতে পারি না। অর্থাৎ উপন্যাসের প্রত্যেক কাজেকর্মে অঞ্চলটি অলক্ষ্যে তার নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে নিজেই একটি চরিত্রে পরিণত হয়। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসেও যে সেই ঘটনাই ঘটেছে, একটু চিন্তা করলেই তা আমরা বুঝতে পারি। কুবের এবং কেতুপুরের অন্যান্য ধীবরদের জীবনযাত্রা দেখলেই বোঝা যায় পদ্মা তাদের ওপর কতোটা প্রভাব বিস্তার করেছে। পদ্মানদী তাদের কাছে বিধাতার মতোই শক্তিশালী। পদ্মা প্রসন্ন হলে তার বুকের সম্পদ তাদের লাভ হয়, পদ্মা নদী ক্রুদ্ধ হলে তাদের জীবনে তাণ্ডব নেমে আসে। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই এই আশীর্বাদ এবং অভিশাপ দুটিকেই তারা গ্রহণ করে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই, এ বিষয়ে কোন বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ তাদের নেই। মানুষগুলির জীবনের চিন্তা, তাদের বিশিষ্ট মানসিকতা এবং দুঃখসুখের অনুভূতিও পদ্মার দ্বারা প্রভাবিত। পদ্মা এই মানুষগুলিকে তার প্রতি সমর্পিতপ্রাণ করেছে বলেই তারা অল্পে খুশি—সমগ্র ভদ্র-পল্লী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, অথচ সেভাবে থাকার মতো স্থানের অভাব না হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের পল্লী গুটিয়ে রেখেছে ছোট জায়গার মধ্যে। পদ্মা তাদের জীবনসংগ্রামে রত হতে শিখিয়েছে, মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি বিসর্জন দিতে শিখিয়েছি—তাই নিজেদের ছেলেমেয়ের জন্য বিশেষ মায়ামমতা এই পল্লীর মায়েরা দেখায় না (পংগু হওয়ার জন্য মালা অবশ্য ব্যতিক্রম); সামান্য মুড়ির জন্য দুই ছেলের মধ্যে ঝগড়া লাগলে কুবের মজা দেখে। কুবের রাতে বাড়ি ফেরে না এবং মেজবাবুর যাতায়াত তাদের পাড়ায় বেড়ে গেছে বলে কুবেরের নবজাতক যে মেজবাবুর দান হতে পারে, এ নিয়ে অশ্লীলতম ব্যঙ্গ গণেশ না বুঝেই করতে পারে নির্বোধের মতো। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মেয়ের পা নষ্ট হবার উপক্রম যখন হয়েছে তখন তার পাত্র পাওয়া গেলে কুবের তা ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করে, আবার সেই মেয়েরই পা যখন ঠিক হয়ে আসে তখন বেশি পণ হেঁকে সেই পাত্রকে খারিজ করে দেবার মতো নির্মমতাও কুবেরের চরিত্রেই দেখা যায়। আসলে চরিত্রগুলি একটি সূত্রে বাঁধা এবং সেই সূত্রটি অদৃশ্যভাবে ধারণ করে আছে পদ্মা নদী।

সেই কারণেই উপন্যাসের শ্রেণীবিচারের যে অপর এক সূত্র আমরা উল্লেখ করেছিলাম সেটি এখানে প্রয়োগ করে আমরা দেখতে পাই, 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের বিশিষ্ট চরিত্রগুলি তাদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য হারায় যদি তারা পদ্মা নদীর

তীরবর্তী ওই বিশিষ্ট অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে। গণেশের নির্বোধ সারল্য, কুবেরের বিহ্বল অসহায়তা, কপিলার আচরণের রহস্যময়তা—সব কিছুর নিয়ন্ত্রণ যেন রয়েছে পদ্মার হাতে। ফলে, কুবের-কপিলা সম্পর্কের মনস্তাত্ত্বিক রহস্য মেনে নিয়েও আমাদের বলতে হয়, ওই বিশিষ্ট অঞ্চলের সুনিশ্চিত আশ্রয় ছাড়া উপন্যাসটি রচনা করা সম্ভব ছিল না।

অবশ্য আমাদের এই শ্রেণীনির্ণয়ের পথে একমাত্র বাধা হিসাবে দেখা দিতে পারে 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসের ব্যতিক্রমী চরিত্র হোসেন মিয়া। এই ধরনের চরিত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে কেন, সমগ্র বাংলা কথাসাহিত্যেই বিশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে বলে আমাদের মনে হয় না। সেই কারণেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তবতাবাদী মানসিকতায় এমন একটি চরিত্র কীভাবে লালিত ও প্রকাশিত হল, এ বিষয়ে বহু সমালোচকের বিস্ময় বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গের সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি, হোসেন মিয়াই এই উপন্যাসে একমাত্র চরিত্র যার ওপর পদ্মার কোন প্রভাব নেই। কিন্তু এক অর্থে পদ্মার সঙ্গেই তার সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক, কারণ সে পদ্মার প্রতিস্পর্ধী চরিত্র। পদ্মা তার ক্রূর শক্তির ফাঁদে তার সমস্ত আশ্রিত মানুষকে নত করবেই, এই তার প্রমত্ত বাসনা; পদ্মার শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে তাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে—এই হল হোসেন মিয়ার সংকল্প। তাই পদ্মা যে দ্বীপকে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী ও বন্ধ্যা করে রেখেছে, সেই ময়নাদ্বীপকে পদ্মার গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাতে জনপদ গড়ে তোলার অসাধ্যসাধনে রত হোসেন মিয়া। কেতুপুর গ্রামের মানুষের জীবনে তাই দুই দুর্লঙ্ঘ্য শক্তির প্রতীক পদ্মা এবং হোসেন মিয়া—পদ্মা যেমন তার অদম্য শক্তি দিয়ে দমিত করেছে ধীবর পল্লীর মানুষগুলিকে, হোসেন মিয়াও তাদের জীবনে আবির্ভূত হয় অপ্রতিরোধ্য শক্তি নিয়ে, সে চাইলে তাকে ময়নাদ্বীপে যেতেই হবে, প্রত্যেকটি মানুষ এ কথা জানে।

সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হলেও এ প্রশ্ন মনে আসতে পারে, হোসেন মিয়া কি বাস্তব চরিত্র—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিকতার যে বৈশিষ্ট্য আমরা চিনি তার সঙ্গে এমন একটি চরিত্র খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ কি। এর উত্তরে বলা যায়, সাধারণভাবে যাকে বাস্তব বা real বলে, তার সঙ্গে এই চরিত্রটিকে আমরা নিশ্চয়ই মেলাতে পারি না, কারণ এমন একটি চরিত্র আমাদের প্রায় কারোর অভিজ্ঞতাতেই থাকতে পারে না। কিন্তু probability বা সম্ভাব্যতার বিচারে, কিম্বা এক ধরনের আদর্শান্বিত বাস্তববোধ বা Higher reality দিয়ে যদি আমরা বিচার করি তাহলে আমাদের মনে হবে এই চরিত্রের মধ্যে কোন অসংগতি, অবাস্তবতা বা অবিশ্বাস্যতা নেই। চরিত্রবিচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র এটি নয়, তবু শুধু এইটুকু এখানে আরো জেনে রাখা দরকার যে, সমাজবাস্তবতার জ্ঞানই হোসেন মিয়ার মতো চরিত্রের অস্তিত্ব সমর্থন

করে। একদিন পৃথিবী অধ্যুষিত ছিল বনে-জঙ্গলে, সেই বন কেটে বসতি বসিয়েছিল সেদিনকার আদিম মানুষই। মানুষ যদি একদিন তার অপরিণত মস্তিষ্ক এবং অনুন্নত প্রযুক্তি নিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকতে পারে, তাকে জয় করে থাকতে পারে, তবে আজকের উন্নতবুদ্ধির মানুষ সে কাজ আবার করতে পারবে না কেন। এই অর্থেই হোসেন মিয়া স্বাভাবিক ও বাস্তব চরিত্র—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিচারে নয়, প্রলব্ধ জ্ঞানের সমর্থনে।

১. মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

বিস্ময়ের কথা হলেও এ সত্য আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস নামে স্বতন্ত্র কোন উপন্যাসের শ্রেণী সাহিত্যের প্রকরণবিদরা স্বীকার করেন নি। এর একটা কারণ এই হতে পারে যে মনস্তত্ত্বকে তারা উপন্যাসের বাস্তবতার মতোই এমন এক অপরিহার্য সামান্য ধর্ম বলে মনে করেছেন যা বাদ দিয়ে উপন্যাসের মতো আধুনিক সাহিত্য-প্রকরণ দাঁড়াতেই পারে না। কথাটা এক অর্থে সঠিকও বটে, কারণ উপন্যাস আধুনিক মানুষের কাহিনী এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়া আধুনিক মানুষকে বোঝানো শুধু দুঃসাধ্য নয়, অসম্ভব ব্যাপার। প্রকরণ-বিদ্‌দের এই শ্রেণীকে স্বীকার না করার দ্বিতীয় কারণ এই হতে পারে যে, চরিত্রপ্রধান উপন্যাস বা Novel of character নামক শ্রেণীকে স্বীকার করে নেওয়া বা চেতনাপ্রবাহমূলক রীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া মানেই উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হল—এই বোধও তাঁদের মধ্যে কাজ করে থাকতে পারে। আমাদের আবার বলতে হবে, তাঁদের এই বোধও সম্ভবত ঠিক।

তবে সবটা নয়। প্রথম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলা যায়, মনস্তত্ত্ব অবশ্যই উপন্যাসের সঙ্গে অভ্রান্তভাবে জড়িত, কিন্তু মনস্তত্ত্বই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি এবং তার সমস্ত জটিলতা ও ঘটনাবিবর্তনের নেপথ্য উৎস—ঠিক এই ভূমিকায় মনস্তত্ত্ব সব উপন্যাসে নাও থাকতে পারে। উপন্যাসের প্রধান সমস্যাটিই মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা কিনা সে কথা আমাদের বিচার করতে হবে এবং এটি বিচার করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল মনস্তত্ত্ব বর্জন করে উপন্যাসটি রচনা করা সম্ভব কিনা ভেবে দেখা। মনস্তত্ত্ব বর্জন করলে যে কোন উপন্যাসই দুর্বল হয়ে হয়ে পড়ে, কিন্তু দুর্বল হওয়া আর তা অবলম্বনহীন হওয়া এক কথা নয়। কোন উপন্যাসের শ্রেণী যদি প্রকৃতপক্ষে মনস্তাত্ত্বিক, হয় তবে মনস্তত্ত্ব বর্জন করলে সেই উপন্যাসটি রচনা করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে, অর্থাৎ সেটি রচনা করারই কোন সার্থকতা থাকে না। এ বিষয়ে দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের অভিমত এই যে, চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে অবশ্যই চরিত্রের মনস্তত্ত্ব প্রাধান্য পায়, কিন্তু একই উপন্যাস একই সঙ্গে চরিত্রপ্রধান ও মনস্তত্ত্বমূলক হতে পারে—এই দুই বিভাগের মধ্যে কোন প্রকৃত বিরোধ নেই। চেতনা-প্রবাহমূলক

রীতি আসলে এক ধরনের উপস্থাপন-রীতি, এর সঙ্গে খুব সাধারণ কারণেই উপন্যাসের শ্রেণীকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক নয়।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস ঠিক কী শ্রেণীর উপন্যাস এবং ঠিক কী তা নয়, সে কথা ভালভাবে বুঝতে গেলে একটি বিশেষ উপন্যাসকে যথাযথ বিশ্লেষণ করা দরকার। সেই চেষ্টাই করা যেতে পারে।

● একটি বাংলা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটির শ্রেণী নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়, এর মধ্যে অবশ্য রাজনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক এই দুই শ্রেণীর মধ্যেই প্রকৃত মতদ্বৈত আমরা দেখি। সুতরাং সেইভাবেই এর বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

রাজনীতি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অসহযোগ আন্দোলন এবং বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে বাংলা দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার এক অতি উত্তাল ও অগ্নিগর্ভ সময় এই উপন্যাসের প্রেক্ষিত। উপন্যাসের প্রধান যে, তিনটি চরিত্র আমরা দেখি, তারা তিনজনেই সাধারণভাবে রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার হয়ে পড়েছে। নিখিলেশ ও সন্দীপ একই রাজনৈতিক আন্দোলনসূত্রে পরস্পরের বন্ধু হয়েছে ও সেই বন্ধুত্বের সূত্রেই সন্দীপ নিখিলেশের বাড়িতে এসে উঠেছে। নিখিলেশের স্ত্রী বিমলা এই রাজনৈতিক আন্দোলনে পরোক্ষ অংশগ্রহণের জন্যই সন্দীপের কর্মযজ্ঞে সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছে।

অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাও এই উপন্যাসে বিশেষ কম নয়। নিখিলেশ একেবারেই রাবীন্দ্রিক নায়ক, আদর্শ দাম্পত্যসম্পর্ক বিষয়ে যার চিন্তাভাবনা অত্যন্ত উদার। রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' ও উত্তরকালের গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের আদর্শ সম্বন্ধে যে মনোভাব আমরা দেখি, এখানে সেই মনোভাবই প্রাধান্য পেয়েছে। একটি পুরুষ এবং একটি নারী সামাজিক অনুষ্ঠানের সূত্রে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে নিজেদের একটা অধিকার পায়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সামাজিক সেই অনুষ্ঠান পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রকৃত কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে না—তাদের কাছাকাছি এনে দেয় মাত্র। এবার মানবিক ব্যবহারের দ্বারা তাদের সত্যিকারের ভালবাসার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হয় এবং তা করতে পারলেই তাদের মধ্যে আদর্শ দাম্পত্য-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশ বিবাহসূত্রে বিমলাকে ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে লাভ করেছিল, কিন্তু সামাজিক সূত্রে এই পাওয়াকে সে খুব বেশি মনে করেনি বলেই তার মানসিক উচ্চতা নিজের মতো করবার চেষ্টা করেছিল এবং বাইরের জগতে নিয়ে এসে সে সন্দীপের মতো মানুষের সঙ্গে তার পরিচয়

করিয়ে দিয়েছিল নিঃসংকোচে ; যাতে ঘরে যাকে বিমলা পেয়েছে, বাইরের জগতের মানুষের সঙ্গে তুলনা করে বুঝতে পারে, সেই নিখিলেশই তার জীবনের পুরুষোত্তম। নিখিলেশ এইভাবেই তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল সামাজিক ও মানবিক সূত্রে, ঘরে এবং বাইরে।

রাজনীতি এবং মনস্তত্ত্ব যখন কোন উপন্যাসে এইভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে, তখন উপন্যাসের শ্রেণীবিচারের সঠিক উপায় আমাদের জানা আছে। কোন্ বিশেষ ব্যাপারটি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি, কাকে বাদ দিলে উপন্যাসটি দাঁড়াতেই পারে না, আমরা চিন্তা করতে পারি সে কথা।

রাজনীতি 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে আছে এবং অত্যন্ত প্রবল ভাবেই আছে, কিন্তু তার অস্তিত্ব উপন্যাসের প্রেক্ষিত রচনায় যতোটা, ঔপন্যাসিক সমস্যা রচনায় যে ততোটা নয়, সে কথা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারি। প্রকৃত রাজনৈতিক উপন্যাসে একাধিক প্রধান ব্যক্তিত্বের মধ্যে ব্যবধান রচনা করে দেয় রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্য, যেমনটি আমরা দেখেছি 'জাগরী' উপন্যাসে। এখানে কিন্তু নিখিলেশ এবং সন্দীপ একই মতাদর্শের পোষক এবং সেই সূত্রেই একদা তাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ব্রত নিয়েই নিখিলেশ সমবায় ব্যাংক তৈরি করেছিল, স্বদেশী সাবান প্রস্তুত করার নামে অনর্গল অর্থের অপচয় করেছিল। নিখিলেশ ও সন্দীপের মধ্যে পার্থক্য যদি কিছু থাকে তবে তা রাজনৈতিক মতের নয়, কোন্ পথে সেই মত প্রতিষ্ঠিত হবে—সেই পথের। সন্দীপ যখন ভেবেছে হিংসার পথে, ধ্বংসের পথে গেলেই স্বদেশী আন্দোলন দ্রুত জয়যুক্ত হবে, নিখিলেশ তখন ভেবেছে এভাবে অন্যায়ের আশ্রয় নিয়ে, কেবল উত্তেজনার আগুন পুইয়ে মহৎ কিছু করা যায় না—সত্যিকারের মহৎ কিছু করতে গেলে সমস্ত মানুষকে তা বুঝবার সুযোগ দিতে হবে, জনচেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে, স্বদেশী মদের নেশায় মানুষকে উত্তেজিত করে হঠাৎ কিছু করে ফেললে তার ফল ভালো হতে পারে না।

তবে এর চেয়েও বড় প্রমাণ রয়ে গিয়েছে নিখিলেশ এবং সন্দীপের চরিত্রেই—তারা মানুষ হিসাবে এখানে যতোটা চিত্রিত, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে মোটেই তা নয়। নিখিলেশের তবু একটা ভণিতাহীন রাজনৈতিক মত পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত জীবনে এবং রাজনৈতিক মতে সে একই আদর্শে বিশ্বাসী—মানুষটার মধ্যে কোন স্ববিরোধিতা নেই। কিন্তু সন্দীপের মধ্যে বৈপরীত্য অত্যন্ত প্রবল। সে রাজনৈতিক নেতা হয়ে নিজে প্রচুর ত্যাগ স্বীকারের কথা বলে, যদিও নিজে কোনরকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজি হয় না ; মুখে স্বদেশী জিনিস ব্যবহার ও বিদেশী জিনিস বর্জনের কথা বলে, অথচ বিদেশী জিনিস ব্যবহারে তার কোন অরুচি নেই। সন্দীপের আসল অস্ত্র তার বাগ্‌বিস্তারের ক্ষমতা এবং নারী চিত্তজয়ের স্বাভাবিক ও অনায়াস দক্ষতা—এটা সে অত্যন্ত ভালভাবে জানে ও

তার নিপুণ ব্যবহার করে। এইভাবেই সে রাজনৈতিক নেতা হয়েছে, রাজনৈতিক মতের প্রতি নিষ্ঠা না থাকা সত্ত্বেও। এই ভাবেই সে অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে এবং বিমলার সর্বস্ব অপহরণে এগিয়ে এসেছে। চরিত্রটির কথা অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, রাজনীতি তার লক্ষ্যে উপনীত হবার, উদ্দেশ্যসাধনের হাতিয়ারমাত্র, জীবনের নীতি নয়—সে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হয়ে অন্য যে-কোন পেশা বেছে নিলেও নিজের বাগ্‌বিস্তারের স্বভাবপটুত্ব দিয়ে ঠিক এই জীবনটাই সে যাপন করতে পারতো, এবং হয়তো তাই করতো।

রাজনীতিকে সরিয়ে নিলে উপন্যাসটি অবশ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু তার অস্তিত্ব রক্ষার কোন সমস্যা হয় কি! বোধহয় না। রাজনৈতিক সংগ্রাম এই উপন্যাসে আমরা দেখি নি, তার আবহ অবশ্যই দেখেছি, তার উত্তাপও পেয়েছি। কিন্তু উপন্যাসের যে মূল সমস্যা সেখানে রাজনীতি বর্জিত হলে কী এমন অসুবিধা ছিল। নিখিলেশ এবং সন্দীপ অন্য কোন সূত্রেও পরস্পর বন্ধু হতে পারতো, ব্যবসায়িক সূত্রে বা অন্য যে-কোন ভাবে। নিখিলেশ তার আদর্শ নিয়ে এই ভাবেই বিমলাকে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতো, সন্দীপ তার নারীচিত্তজয়ী বাণ এভাবেই নিক্ষেপ করতো, এর জন্য রাজনৈতিক নেতা হবার কোন প্রয়োজন ছিল না। জটিলতার বৃদ্ধি অনায়াসেই হতে পারতে এভাবে।

উপন্যাসের আবহ যাই হোক আমাদের মনে রাখতে হবে, এই উপন্যাসের নাম 'ঘরে বাইরে' এবং নিখিলেশের দাম্পত্য-আদর্শের পরীক্ষা ও ব্যর্থতাই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যা। নিখিলেশ আদর্শ দাম্পত্যসম্পর্ক বলতে বোঝে স্ত্রীকে ঘরে ও বাইরে সমানভাবে পাওয়া, কিন্তু তার দুর্ভাগ্য সে এমন একটি নারীকে স্ত্রী হিসাবে পেয়েছে যে অত্যন্ত সাধারণ—যার মানসিক উচ্চতা নিখিলেশের ধারে কাছে আসে না। বিমলা মায়ের কাছে পেয়েছে সতীত্বের তেজ, নারীত্বের তিলমাত্র বলিষ্ঠতা সে চরিত্রে বহন করে না; সে চায় এমন একজন বলদৃপ্ত স্বামী যার শাসনে, যার অত্যাচারে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করা যায় এবং সতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখানো যায়। দুর্ভাগ্য দুজনেরই—যে সুন্দরী নয় তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে নিখিলেশ তাকে ভুল ধারণার সুযোগ দিয়েছে, যে উচ্চ মানসিকতার যোগ্য নয় তাকে বিদ্যার আচরণে অনেক বড়ো করে তুলতে চেয়েছে নিখিলেশ। ফলে সন্দীপ তার Lady killer-এর আশ্চর্য যাদু দেখার একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে গিয়েছে—স্বদেশী মন্ত্রের উত্তেজক বাগ্‌জাল বিস্তার করে তাকে মক্ষীরানী বানিয়ে অনায়াসে সে নিখিলেশের কাছ থেকে তাকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে।

সুতরাং দাম্পত্যসম্পর্কের, এই জটিলতা বর্জন করে, এই নিগূঢ় মনস্তত্ত্ব বর্জন করে যদি আমরা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের কথা ভাবি তাহলে তাতে রাজনীতি থাকে বটে কিন্তু 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি থাকে না। পক্ষান্তরে রাজনীতি একেবারে বর্জন করলে উপন্যাসটি হয়তো কিছু দুর্বল হয়ে যায়। (যাঁরা মনে করেন স্বদেশী

আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ অবিচার করেছেন, তাঁদের মতে এমন কি এটি ঈপ্সিতও মনে হতে পারে) কিন্তু উপন্যাসটি নিরাবলম্ব হয় না। সেই কারণেই আমরা মনে করি মনস্তত্ত্বই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় শক্তি, প্রধান চরিত্রগুলির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এ উপন্যাসে যতোটা আকর্ষণীয়, রাজনৈতিক জটিলতা ততোটা নয় ; এবং সেইসব কারণেই সিদ্ধান্তে আসতে আমাদের খুব অসুবিধা হয় না যে উপন্যাসটির শ্রেণী মনস্তাত্ত্বিক।

ঙ. অন্যান্য শ্রেণীর উপন্যাস :

উপন্যাসের বিষয় ও প্রকৃতিভিত্তিক প্রধান শ্রেণীগুলির কথা আমরা উল্লেখ করেছি। এ ছাড়াও অন্য অনেক বিভাগের কথা বিভিন্ন সাহিত্য-প্রকরণমূলক গ্রন্থে পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম বিচার করলে দেখা যাবে, কোন না কোন ভাবে আমাদের উল্লিখিত বিভাগগুলির মধ্যেই তাদের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবু সেগুলির অতি-সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা দিয়ে রাখছি। প্রথমে সাহিত্য-সন্দর্শন' গ্রন্থে শ্রীশচন্দ্র দাশের কয়েকটি বিভাগের কথা বলি।

এক। কাব্যধর্মী উপন্যাস :

এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে—"আখ্যানভাগ নিয়ন্ত্রণ-কুশলতা বা চরিত্র সৃষ্টি অপেক্ষা গ্রন্থকারের কবিদৃষ্টি যে উপন্যাসের জীবনদর্শনকে স্নিগ্ধ ও মধুর করিয়া তোলে, তাহাকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা যাইতে পারে।" আসলে story-teller অথবা Novel of Character—এই দু-ধরনের উপন্যাসের বাইরে কবিত্বময় অনুভূতি নিয়ে লেখা উপন্যাসকে বোধহয় এই পর্যায়ে ফেলা যায়। অবশ্য সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, এই জাতীয় উপন্যাসকে খাঁটি উপন্যাস হিসাবে স্বীকার করতে অনেকে কুণ্ঠিত হবেন, কারণ কবি ও ঔপন্যাসিকের রচনা পদ্ধতিগত ভাবেই পৃথক, এখানে সেই পার্থক্য বজায় রাখা হয় না। এই জাতীয় উপন্যাসের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ভার্জিনিয়া উলফের 'The Waves', রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ও মনীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' ; আমরা এর সঙ্গে যোগ করতে পারি থোরুর 'Walden' বা বুদ্ধদেব বসুর 'প্রভাত ও সন্ধ্যা'।

দুই। গোয়েন্দা উপন্যাস :

এই শ্রেণীটি অবশ্য ইংরেজি বাংলা উভয় সাহিত্যেই বেশ জনপ্রিয় এবং সাধারণ ভাবে মহৎ সাহিত্যের স্বীকৃতি না পেলেও বহু শিক্ষিত ও কৃষ্টিসম্পন্ন মানুষও যে

অবসর বিনোদনের পক্ষে এই ধরনের উপন্যাস বেছে নেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

গোয়েন্দা উপন্যাস বা Detective Novel-এ কাহিনীই মুখ্য। অপরাধী তার দুষ্টবুদ্ধি প্রয়োগ করে একটি এমন অপরাধ সংঘটিত করে যার কোন সূত্র পাওয়া যাবে না এবং তাকে ধরা কোন মতেই সম্ভব হবে না। গোয়েন্দা সেই অপরাধ সূক্ষাতিসূক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে অপরাধের কারণ, উপায় এবং সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করবেন এবং শেষ পর্যন্ত অপরাধীকে ধরে ফেলবেন এটাই এই ধরনের উপন্যাসের সাধারণ ছক। সাধারণভাবে ঘটনার অভিনবত্ব, শেষ পর্যন্ত জাগ্রত কৌতূহল, গোয়েন্দার মতো পাঠককেও পদে পদে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টাই এই সব কাহিনীর বৈশিষ্ট্য এবং সম্ভবত সেই কারণেই মহৎ সাহিত্য হিসাবে একে স্বীকৃতি জানাতে সমালোচকগণ দ্বিধা বোধ করেন। কিন্তু আমরা মনে করি মহৎ সাহিত্যিকের হাতে এই শ্রেণীর উপন্যাসও অতিমাত্রায় সাহিত্য গুণসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। সেক্ষেত্রে একে ঠিক গোয়েন্দা উপন্যাস না বলে বলা উচিত অপরাধমুখ্য সাহিত্য। মানুষের মনের একটি অন্ধকারময় দিক থাকেই—সভ্যতার অগ্রগতি তাকে অবদমিত করে রাখতে পারে, নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। সুযোগ পেলেই মানুষের সেই পঙ্কিল প্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের সেই অন্ধকারময় জটিল মনস্তত্ত্ব যখন এই ধরনের কাহিনীর আশ্রয় হয়, তখন তা আমাদের উপভোগ্য হতে বাধ্য।

ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম এ জাতীয় রচনার সূত্রপাত কবি-সমালোচক এডগার অ্যালান পো-র হাতে; তাঁর দুপাঁকেই প্রথম গোয়েন্দা বলা চলতে পারে। অবশ্য ইংরেজিতে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন সার আর্থার কোনান ডয়েল এবং তাঁর গোয়েন্দা শার্লক হোমস্। হোমসের জনপ্রিয়তা এতোই বেশি ছিল যে Final Problem' নামক একটি গল্পে তাকে মেরে ফেলার পরও পাঠকের অনুরোধে ও চাপে ডয়েল তাকে আবার বাঁচিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আগাথা ক্রিস্টি এবং তাঁর ফরাসী গোয়েন্দা এরকুইল পয়রো (Herculo Poirot) অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। অবশ্য অন্য এক মহিলা-লেখিকা ডরোথী এল্ সেয়ার্স-ও অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর গোয়েন্দা-উপন্যাস রচনা করেছেন।

বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাসের পথিকৃৎ বলা যায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি 'দারোগার দপ্তর' নামে একটি সিরিজ বার করেছিলেন, যার প্রথম বই 'বনমালী দাসের হত্যা'। অবশ্য তারও অনেক আগে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'হরিদাসের গুপ্তকথা।' এরপর কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, (বাঁকাউল্লার দপ্তর), গিরিশচন্দ্র বসু (সেকালের দারোগা কাহিনী) দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি গোয়েন্দা কাহিনী রচনায় এগিয়ে এলেও সে যুগে সবচেয়ে খ্যাতিমান হয়েছিলেন পাঁচকড়ি দে। তাঁর 'মায়াবিনী', 'মনোরমা,' 'নীলবসনা সুন্দরী'—বিশেষ করে 'হত্যাকারী কে?' অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বাংলা গোয়েন্দা উপন্যাসকে সাহিত্য-

পদবাচ্য করে তোলেন প্রথম হেমেন্দ্রকুমার রায়। তাঁর জয়ন্ত-মানিক-সুন্দরবাবু কাহিনী কেবল মনোরঞ্জনই করে না, সাহিত্যিক আস্বাদও দেয় যথেষ্ট। অতঃপর অনেকেই গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছেন এবং আজও লিখে চলেছেন। নীহাররঞ্জন গুপ্ত এবং তাঁর গোয়েন্দা কিরীটী রায় প্রভৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা এবং জটায়ুও কিছু কম জনপ্রিয়তা পায় নি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রসগুণসম্পন্ন গোয়েন্দালেখক হিসাবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়েরই নাম করতে হবে। তাঁর গোয়েন্দা ব্যোমকেশ একেবারে খাঁটি বাঙালী চরিত্র—ছুরি নয় রিভলভার নয়, বুদ্ধিই তার প্রধান অস্ত্র। শুধুমাত্র গোয়েন্দা কাহিনী প্রকাশ করার জন্যই বেশ কিছু সাময়িক পত্রিকার উদ্ভব ঘটে, যথা 'রহস্য রোমাঞ্চ' (সম্পাদক বিমল কর ও অরুণ ভট্টাচার্য), 'রহস্যচক্র' (শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী), 'ডিটেকটিভ' (শ্রী ধ্রুব সরকার) প্রভৃতি : তবে সবচেয়ে বেশি স্থায়িত্ব পেয়েছিল প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে মাসিক 'রোমাঞ্চ' (প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়)।

তিন ॥ বীরত্বব্যঞ্জক উপন্যাস :

ইংরেজি The Name of Adventure অবলম্বনে এই শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে পুরনো পিকারেস্ক নভেলের বিষয়বস্তুও ছিল এই ধরনের বীরত্বের কাহিনী শোনানো, যেখানে বীরের প্রধান কাজ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। উদাহরণ হিসাবে স্টিভেনসন-এর Kidnapped এবং ম্যারিয়াট-এর Mr. Midshipman Easy-র উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলায় আমরা শশধর দত্তর দস্যু মোহন সিরিজ বা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের রঘু ডাকাতের কথা বলতে পারি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চাঁদের পাহাড়' কিশোর উপন্যাস হলেও অবশ্যই এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

চার ॥ হাস্যরসাত্মক উপন্যাস :

নাটকের কমেডির আদর্শে উপন্যাসের এই ধরনের একটি বিভাগ শ্রীশচন্দ্র দাশ করতে চান। ইংরেজিতে যাকে বলা চলে Humourous Novel, তারই আদলে এই বিভাগ। কিন্তু মুশকিল এই যে হাস্যরসাত্মক উপন্যাসের হাসির উৎস নানাদিক থেকে আসতে পারে—চরিত্রের অসঙ্গতি, সামাজিক অসঙ্গতি, রাজনৈতিক মতের অসঙ্গতি অথবা অন্য ধরনের কিছু। কোন প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ, মতবাদ, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করেও হাসির উপন্যাস লেখা যায়। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্য

হয় পৃথক শ্রেণীনির্বাচন করতে হয়, অথবা আমাদের উল্লিখিত কোন শ্রেণীতেই তাকে ফেলতে হয়। সেরকম সূক্ষ্ম উপবিভাগ বা শ্রেণীবিভাগের মধ্যে প্রবেশ না করাটাই আপাতত সমীচীন বিবেচনা করি। বাংলা উপন্যাসের মধ্যে যোগেন্দ্র চন্দ্র বসুর বিদ্রূপাত্মক উপন্যাস 'মডেল ভগিনী', ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কল্পতরু', পরশুরামের রাবীন্দ্রিক আচার-আচরণের প্যারডি 'কচিসংসদ" ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভৌতিক রসিকতা 'কঙ্কাবতী' বা 'ডমরুধর চরিত', শিবরাম চক্রবর্তীর 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।

পাঁচ ॥ সৃষ্টি ও শিক্ষামূলক উপন্যাস :

সমালোচক অ্যাব্রামস্ উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগে এই ধরনের একটি বিভাগের পক্ষপাতী। এদের উৎস যথাক্রমে জার্মান প্রতিশব্দ **Bildungsroman** এবং **Erziehungsroman**। সাধারণত শৈশব থেকে বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত এখানে নায়কের মন ও চরিত্র কেমন বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা গঠিত হয় তা দেখানো হয়ে থাকে—অনেক সময়ই কোন আধ্যাত্মিক সংকটও তার অঙ্গীভূত হয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সমস্ত সংকট কাটিয়ে চরিত্রটি তার নিজস্ব পরিচয় বুঝতে পারে এবং তার করণীয় কর্তব্যগুলিরও সন্ধান পায়। এই ধরনের উপন্যাসের মধ্যে গ্যেটের **'Wilhelm Meisters' Apprenticeship'**, টমাস মানের 'The Magic Mountain' বা সামারসেট মমের **'Of Human Bondage'**-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

ছয় ॥ কারা উপন্যাস :

সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' উপন্যাসটি রচিত হবার পর উপন্যাসের এই ধরনের একটি শ্রেণীবিভাগের কথা সমালোচকগণ আগ্রহের সঙ্গে বলতে শুরু করেছেন এবং এ নিয়ে গবেষণাগ্রন্থও রচিত হয়েছে। কারাগারে যেসব মানুষ আসেন তাঁদের অতীতজীবনে বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক অনেক কাহিনী থাকতে পারে। সে সব কাহিনীর একশোভাগই অপরাধমূলক না হতে পারে, মানুষের প্রবঞ্চনা, আত্মরক্ষার অধিকার, অন্যায় ষড়যন্ত্র—সব কিছুই জড়িয়ে থাকতে পারে সেখানে। তবে কারা উপন্যাসে আমরা সাধারণভাবে বোধহয় প্রত্যাশা করি অন্ধকারময় জগৎ বা under world-এর কথাই। এ বিষয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য (সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে)—"আমি কারাসাহিত্য অর্থে কারাগারে রচিত সমস্ত সাহিত্যকে নির্দেশ করিতেছি না—কারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে উপাদানস্বরূপ ব্যবহার করিয়া যে সাহিত্য রচিত তাহাকেই উক্ত নামে অভিহিত করিতেছি।"

ইংরেজি সাহিত্যে সম্পূর্ণ বা আংশিক কারা উপন্যাসের স্বাদ পাওয়া যাবে কোয়েস্টলারের 'ডার্কনেস অ্যাট নুন' সলঝেনিৎসিনের 'আইভ্যান ডেনিসোভিচ' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং গলসওয়ার্দি'র 'জাস্টিস' নাটকে। বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কারা উপন্যাসের মধ্যে নাম করা যায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণপুরী', সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী', সরোজকুমার রায়চৌধুরীর 'শৃংখল', জরাসন্ধের 'লৌহকপাট', সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া' বা 'স্বীকারোক্তি' প্রভৃতির।

[ক. ছোটগল্পের কথা—উনিশ শতকের বিস্ময় কেন—উদ্ভবের কারণ ।। খ. ছোটগল্পের উৎস-সন্ধান—মধ্যযুগের সাহিত্য—আধুনিক সাহিত্য ।। গ. ছোটগল্প ও উপন্যাস—আকার—সামগ্রিক জীবন ও জীবনের খণ্ডাংশ—বর্ণনার রম্যতা ও সংযম—অন্যান্য রচনা ও চরিত্রসৃষ্টি—বহির্মুখী সৃষ্টি ও অন্তর্মুখী প্রতিভা—চরিত্র সৃষ্টির পার্থক্য—দুটি দৃষ্টান্তের দ্বারা সূত্রগুলি ব্যাখ্যা । ঘ. ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ণয়—বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা বিচার—সংজ্ঞা গঠন । ঙ. ছোটগল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ—ছোটগল্পের একমুখিনতার সঠিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা—ছোটগল্পে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন কীভাবে ঘটে থাকে—ছোটগল্পের বিষয়বস্তু—আধুনিক ছোটগল্পে গল্পহীনতা এবং তার সমালোচনা—ছোটগল্পের সূচনা—ছোটগল্পের উপসংহার—উপসংহারের প্রকারভেদ—কিছু দৃষ্টান্ত ।। চ. ছোটগল্পের বিভাগ-বিভাজন—বিষয়কভিত্তিক বিভাগ—প্রকৃতিমূলক বিভাগ—প্রত্যেকটি বিভাগের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত ।। ছ ছোটগল্পের বৃত্তগঠন—বিভিন্ন প্রকার বৃত্তের দৃষ্টান্ত—এ বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে আমার অসুবিধা ।। জ. ছোটগল্পের ভাষারীতি—স্টাইল কীভাবে গল্পকারের মানসিকতা নির্ণয় করে—বিভিন্ন ভাষারীতি—যথোচিত দৃষ্টান্ত ।]

ক. ছোটগল্পের কথা

ছোটগল্পের উৎস সন্ধান করতে সমালোচকগণ যত অতীতমুখেই যাত্রা করুন, একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে আধুনিক জীবন এবং আধুনিক সমস্যার জটিলতা ছাড়া ছোটগল্প নামক সাহিত্য-প্রকরণটির জন্মলাভ সম্ভব ছিল না। 'ছোটগল্প' বা 'short story' কথাটি শুনে মনে হতে পারে এটি বোধহয় গল্পেরই একটি পরিমাপগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে, কিন্তু বস্তুত তা নয়। আয়তন এর প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নয় এবং 'ছোট যে গল্প'—এই ভাবেও শব্দটি নিষ্পন্ন হয়নি। এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক শিল্পপ্রকরণ। সেই কারণেই ব্রাণ্ডার ম্যাথিউজ 'short' এবং 'story' শব্দ দুটির মধ্যে একটি হাইফেন যুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই কারণেই ছোটগল্পকে বলা হয়েছে—'Peculiar product of the nineteenth century।"

'Peculiar product' কেন, তার উত্তর দিয়েছেন ছোটগল্পের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচক সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—"এ নভেলও নয়—রোমান্সও নয়। এ কবিতার মতো ঐকভাবাশ্রয়ী—অথচ কল্পনামুখ্য নয়, জীবন নির্ভর। আবার সেই জীবনের সামগ্রিকতার প্রতিচ্ছবিও এতে নেই—এতে খণ্ডতার ব্যবহার। সুতরাং এ বস্তু স্পষ্টই অভিনব।"

অবশ্য উনবিংশ শতকের আগে কেন ছোটগল্পের আবির্ভাব সম্ভব ছিল না, এই প্রশ্নের উত্তর এতো সহজে দেওয়া যায় না। উনবিংশ শতকের সূচনাকে সব দিক থেকেই বলা যায় যুগসন্ধির কাল—সমস্ত পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামাজিক

উত্থানপতনকে স্মরণ রেখেই এ কথা বলা সম্ভব। জীবনের পুরনো মূল্যবোধ গুলিকে যখন আর সারবান মনে হয় না, ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার সামঞ্জস্য করা শক্ত হয়ে পড়ে, তখন সর্বত্র দুঃখ-যন্ত্রণা-অনিশ্চয়তা একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দেখা দিতে পারে চোখের সামনে ; এবং ছোটগল্পের প্রথম নিষ্ঠ সমালোচকের মতে 'জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়েই ছোটগল্পের আবির্ভাব।'

তাই উদ্ভবের অব্যবহিত পরে ছোটগল্পে আনন্দ উল্লাস বিস্ময় যাই আসুক, এক আন্তরিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই যে ছোটগল্প নামক শিল্পপ্রকরণেয় জন্ম, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। গোটা ঊনবিংশ শতকেই বুদ্ধিজীবীদের মানসিক অস্থিরতা লক্ষ করবার মতো। এই শতকের মাঝামাঝি সময় ফ্রান্সে বাস্তবতাদের উদ্ভব ঘটে গুস্তাভ ফ্লবেয়ার ও অনুবর্তীদের হাতে। একদিকে সমাজ-সমালোচনা ছিল এঁদের সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন, অন্যদিকে রাজশক্তিকে তাঁরা বিশ্বাস করতেন সবচেয়ে বেশি। রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের সমস্যাও ছিল প্রায় একই ধরনের। তা নইলে তলস্তয়ের মতো ঋষিপ্রতিম মানুষকে লিখতে হয় না 'দি ডেভিল'-এর মতো উপন্যাস। আমেরিকায় এই ধরনের কোন রাষ্ট্রিক সংকট না থাকলেও একটা কসমোপলিটান সমাজ সেখানেও কম সমস্যার সৃষ্টি করেনি।

আমরা যা বলতে চাই তাকে আরো সরলভাবে বললে এই রকম দাঁড়ায় যে জীবনে একটা যে-স্থির বিশ্বাসের আশ্রয় থাকলে উপন্যাস রচনা করা সম্ভব হয়, ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ এবং অন্তপর্বে তা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে আসছিল। এর মধ্যে যাঁরা বিশ্বাসকে অবিচল রাখতে পেরেছেন তাঁরা মহৎ উপন্যাসও লিখেছেন। রাশিয়ায় তুর্গেনেভ এই বিশ্বাসে ভর করেই লিখেছেন 'ফাদার্স এ্যাণ্ড সন্স্', তলস্তয় যখন তাতে আস্থা রাখতে পেরেছেন তখন তাঁর হাতে আমরা পেয়েছি 'ওয়র এ্যাণ্ড পিস্'-এর মতো উপন্যাস। চেকভ সে বিশ্বাস রাখতে পারেননি—এই বিশ্বাস সযত্নে আঁকড়ে ধরার নিদারুণ প্রয়াস সত্বেও, তাই ছোটগল্পই হয়ে ওঠে তাঁর প্রধান অবলম্বন। আমেরিকাতেও এই অনিকেত যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই জন্ম নিয়েছে ন্যাথানিয়েল হথর্নের গল্প বা এডগার আালান পো-র অসাধারণ ছোটগল্প।

এই কথাটাই একটু অন্যভাবে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, হয়তো একটু মিষ্টি করে কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের পথিকৃতের এই উক্তি আমাদের একবার মনে করা উচিত। মহাকাব্যের বিশাল আয়োজন না করে খণ্ডকবিতা কেন লিখলেন সেই প্রসঙ্গেই তাঁর বক্তব্য 'কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে।' বিশ্বাসের ভূমি না পেলে উপন্যাসের ভাস্কর্যও তেমনি ভাবেই সম্ভব হয় না, আধুনিক জীবনের 'সোয়ান সং' ছোটগল্প হয়ে তা ছড়িয়ে পড়ে। ফরাসী সাহিত্য তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। রাজভক্ত প্রস্পার মেরিমে অকালে মৃত্যু বরণ করলেন ; ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারী' ঐতিহাসিক কারণে যতো উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, সাহিত্যিক কারণে ততোটা নয়, 'স্যালাম্বো-র' পর তিনি আর অগ্রসর হতেও পারেন নি ; এমিল জোলা

চেষ্টা করেছিলেন তাঁর ন্যাচারালিজমকে অবলম্বন করে উপন্যাস রচনায় অগ্রসর হতে, সিদ্ধি খুব বড় মাপের নয়—অথচ ছোটগল্পের যন্ত্রনাময় বৃত্তে মোপাসাঁ স্মরণীয় হয়ে রইলেন।

অবশ্য সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে ছোটগল্পের প্রকৃতিবিচারে কেবল এই অনিকেত যন্ত্রণা এবং ব্যক্তি ও সমাজসম্পর্কের সামঞ্জস্যহীনতার প্রতিবাদই একমাত্র বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা করাটা ঠিক হবে না। বাংলা ছোটগল্পের জন্ম হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে, তাঁর জীবনে বিশ্বাসের ভূমি কখনো বিচলিত হয়নি—অন্তত তাঁর ছোটগল্পের সোনার ফসলের দিনে। ছোটগল্পে বিশ্বাসের বলিষ্ঠতা এবং সহজ জীবনের আনন্দও আমরা পরে অনেক দেখেছি। এর আন্তরিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আমাদের আরো গভীর আলোচনায় স্থির করতে হবে, তবে তার আগে আর একটা কথা মনে রাখা ভালো, ছোটগল্প আবির্ভাবের একটা অন্য কারণও ছিল, এবং সেটা হল সংবাপত্রের আনুকুল্য। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ট্যাটলার-স্পেকটেটর-র‍্যামব্লারের কথা মনে পড়তে পারে আমাদের। মনে পড়তে পারে 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার কথা যার প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথকে ছোটগল্প লিখে যেতে হয়েছিল। মনে পড়বেই হর্থন, পো এবং হেনরি জেমসের কথা—সাময়িক পত্রিকাই ছিল যাঁদের প্রধান আশ্রয়। এ কথাও ভোলা শক্ত যে মোপাসাঁ তাঁর প্রায় সব কটি গল্পই লিখেছেন সাময়িক পত্রিকায় প্রয়োজনেই।

খ. ছোটগল্পের উৎসসন্ধান

ছেটেগল্প একান্তভাবেই আধুনিক সাহিত্য-প্রকরণ। তা সত্বেও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে কেউ কেউ এর উৎস সন্ধান করেছেন। আমাদের দেশের পুরাণের গল্প, রূপকথার গল্প, পরবর্তীকালের জাতক সাহিত্য, বাইবেলের প্যারাবল্‌স্‌, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপের গল্প ইত্যাদি নানা ধরনের কাহিনীর মধ্যেই ছোট-গল্পের বীজের সন্ধান করা হয়েছে। সেভাবে দেখলে সংস্কৃত সাহিত্যের 'বৃহৎ কথা', 'কথাসরিৎ সাগর' বা দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত'-কেও আমরা ছোটগল্পের পূর্বসূত্র বলতে পারি।

ঠিক এই ভাবেই ইউরোপীয় সাহিত্যের বিভিন্ন মধ্যযুগীয় রচনার মধ্যে ইংরেজি ছোটগল্পের উৎস সন্ধান করা হয়েছে। অনেকের মতে গিয়োভানি বোক্কাচ্চিও-র 'দেকামেরন'-এর গল্পগুলিই ইংরেজি ছোটগল্পের আদি উৎস। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন ইংরেজি গল্পের উৎস সন্ধান করতে অতো দূরে যাওয়াটা ঠিক নয়। তাঁদের মতে চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দের লেখক বোক্কাচ্চিও নন, ষোড়শ শতকের ইংরেজ কবি চসারের 'কাণ্টারবেরি টেল্‌স্‌'-কেই আদিসূত্র হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' অবশ্য বোক্কাচ্চিওকেই বেশি সমর্থন করেছে বলে মনে হয়—"It is the stories that matter. In Chaucer's Canterbury tales the tales, often weary us but the tellers never do : in Boccaccio the tales never weary us but the tellers always do."

আধুনিক কথাসাহিত্যের ইতিহাসে নতুন সাহিত্য-প্রকরণ হিসাবে ছোটগল্পের প্রাচীনতম সূচনা সন্ধান করতে গেলে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দকে আমাদের স্মরণীয় মনে হবে, কারণ এই বছরই ন্যাথানিয়েল হথর্ন তাঁর 'টোয়াইস টোল্‌ড্ টেল্‌স্'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটির তাৎপর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দেয় এডগার অ্যালান পো-র সমালোচনা। এর তিন বছর পর পো নিজেই তাঁর বিখ্যাত সংকলন 'টেল্‌স্ অব দি গ্রোটেস্ক অ্যাণ্ড অ্যারাবেস্ক' প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পকাররা অনেকেই এই দুই লেখকের সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত ও উপকৃত হয়েছেন।

এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে রাশিয়ান ছোটগল্পকারদের কথা। অ্যালান পো-র সমকালেই সৃষ্টিশীল ছিলেন নিকোলাই গোগোল। তাঁর 'দি ওভারকোট' গল্পটি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প হিসাবে স্বীকৃত হয়। তুর্গেনেভ মূলত ঔপন্যাসিক হলেও সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের ছোটগল্পের একটি সংকলন প্রকাশ করেন—'হাণ্টিং স্কেচেস'। রাশিয়ার ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেন তলস্তয়, চেকভ এবং আরো পরবর্তীকালের ম্যাক্‌সিম গোর্কি।

ছোটগল্পে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান অবশ্যই ফরাসী সাহিত্যিকদের সেরা দুটি নাম বালজাক এবং মোপাঁসা। মোপাঁসা যখন সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় তাঁর অসামান্য ছোটগল্পগুলি প্রকাশ করতে থাকেন তখন ফরাসী সাহিত্যে ন্যাচারালিস্ট আন্দোলন প্রায় তুঙ্গে। এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ এমিল জোলা সৃষ্টিকার্যে ছিলেন অক্লান্ত শিল্পী। আলফাঁস দোদে ছিলেন জোলার সার্থক শিষ্য। পরবর্তীকালে আনাতোল ফ্রাঁসও ছোটগল্পের বড় শিল্পী ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সার্থক সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথের হাতে। 'হিতবাদী' ও 'সাধনা' পত্রিকার চাহিদা মেটাবার জন্য তিনি ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দুটি ছোটগল্প লিখলেও তাঁর নিয়মিত ছোটগল্প লেখা আরম্ভ হয় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এবং জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত অল্প ও বেশি ছোটগল্পের চর্চা তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পরেই কথাসাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শিল্পী শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু তার মধ্যেই তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেই সময় ছোটগল্পকার হিসাবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও খ্যাতিমান ছিলেন। অতঃপর বাংলা ছোটগল্পের দিক্ পরিবর্তন ঘটে কল্লোল যুগে। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক ছিলেন

উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছোটগল্পের সমর্থ শিল্পী, ছিলেন কিন্তু সে গল্পের স্বাদ ছিল পৃথক। উত্তর-কল্লোলীয় পর্বে শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক নিঃসন্দেহে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পের সম্পদে পূর্ণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল যেমন শক্তিশালী গল্পকার ছিলেন, উত্তরকালে সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী প্রভৃতি ছোটগল্পের বড় শিল্পী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের মানও বিশেষ উন্নত।

গ. ছোটগল্প ও উপন্যাস

সাম্প্রতিককালে ছোটগল্পই সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী সাহিত্য-প্রকরণ। সমালোচকগণ এরকম কথাও মনে করতে শুরু করেছেন যে উপন্যাস পাঠের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে—এখন বিরাট বিরাট উপন্যাস, টেনিসন যাকে বলেছেন 'great still books, তার দিন ফুরিয়েছে; এর জায়গা এখন নেবে ছোটগল্প। একথা অবশ্য কখনই মেনে নেওয়া যায় না, কারণ, কথাসাহিত্যের এই দুটি প্রকরণের স্বাদ সম্পূর্ণ পৃথক। সেই পার্থক্যগুলি সূত্রাকারে নির্দেশ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এক ॥ আকারের পার্থক্য প্রথমেই চোখে পড়ে, যদিও সে পার্থক্য মোটেই তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কারণ ছোট ছোট নক্সা বা anecdotes-কে বড় করলে যেমন তা ছোটগল্প হয় না, তেমনি উপন্যাসকে ছোট করে লিখলে তা ছোটগল্প হয় না। প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যেই উপন্যাস ও ছোটগল্প পৃথক, নতুবা আকৃতিতে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস 'মালঞ্চ' এবং ছোটগল্প 'নষ্টনীড়'-এর মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি নয়। আমরা 'নষ্টনীড়' বা 'মেঘ ও রৌদ্র'-কে যেমন ছোটগল্প বলি, তেমনি বনফুলের অতিহ্রস্ব গল্প, যাকে বলা যেতে পারে 'post-card stories'—সেগুলিও ছোটগল্প হিসাবে স্বীকৃত। কাজেই প্রমথ চৌধুরী যে বলেছেন ছোটগল্পকে আগে হতে হবে ছোট এবং তার পরে গল্প, সে কথার ভিন্ন তাৎপর্য আছে, আকার ছোটগল্প ও উপন্যাসের কোন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নয়।

দুই ॥ উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যে প্রধান পার্থক্য, উপন্যাস জীবনের এক সামগ্রিক রূপের পরিচয় দেয়। জীবনের যে সমস্যাই উপন্যাসে রূপায়িত হোক, কারণ জীবনসমস্যা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই উপন্যাসের প্রধান কথা—সেই সমস্যাকে অখণ্ডভাবে তুলে ধরতে হবে, যাতে এ সম্পর্কে কোন সংশয় বা অতৃপ্তি পাঠকের না থাকে। এই অখণ্ডতার অর্থ, জীবন সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব যেন সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, সেখানে যেন প্রশ্নচিহ্ন থেকে না যায়। সমালোচক

Walter Allen সেই কথাই বলেছেন—"A novel is a totality, made up of all the words in it and must be judged as a totality." পক্ষান্তরে ছোটগল্পের কাছে সম্পূর্ণ জীবনবৃত্ত কেউ আশা করে না, একে বলা হয়েছে 'moment's monument' বা 'বিন্দুতে সিন্ধুদর্শন'। জীবনের এক খণ্ডাংশ উজ্জ্বল ভাবে তুলে ধরে ছোটগল্প যার কোন আরম্ভও নেই, স্পষ্ট শেষও নেই—কিন্তু সেই অতি সীমিত খণ্ডাংশেও জীবনের সামগ্রিক রূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা আমাদের গড়ে ওঠে। এ সম্বন্ধে John Courons সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলেছেন—"The parable is indeed a fragment, but it is a complete fragment, and if it is cumulation of truth, it is still better the essence of all truth and it is not less than the whole of which it is a fragmemt." ছোটগল্পের সমাপ্তি আসলে সেই জীবনের প্রকৃত সমাপ্তি নয় বলেই ছোটগল্প পাঠ করার পর এক ধরনের অতৃপ্তিও মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়।

তিন ॥ উপন্যাসের স্বাদ যদি হয় জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায়, তার জটিল সমস্যা ধীরে ধীরে বুনে তুলবার আমেজে, ছোটগল্পের স্বাদ তাহলে লেখকের নিপুণ সংযমে। বিস্তারই উপন্যাসকে আকর্ষণীয় করে তোলে, অবশ্যই যদি তা অপ্রসঙ্গিক না হয়। ছোটগল্পের লেখক একটি অপ্রয়োজনীয় পংক্তিও রচনা করতে পারেন না—সংযমই ছোটগল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

চার ॥ উপন্যাস যদিও ঘটনাপ্রধান এবং চরিত্রপ্রধান—উভয় প্রকারেরই হতে পারে, তবু উপন্যাস রচনার জন্য আখ্যান রচনার বিষয়বুদ্ধি কিছু প্রয়োজন হয় কারণ আধুনিক পাঠক চরিত্রচিত্রণ সম্বন্ধে যতোই উৎসাহী হোন, গল্পের আকর্ষণ অল্প হলেও তাঁদের থাকে। অন্তত আখ্যানহীন বা আখ্যাননিরপেক্ষ উপন্যাস প্রায় আমরা চিন্তা করতে পারি না। কিন্তু ছোটগল্পের লেখক বরং অন্তর্মুখী হলেই ভালো। গল্পের একটা আয়োজন ছোটগল্পেও যে থাকে না তা নয়। তবু চরিত্রই সেখানে বেশি আকর্ষণীয়। 'ঘটনার ঘনঘটা' সেখানে সর্বদা বর্জন করা উচিত।

পাঁচ ॥ চরিত্রসৃষ্টি ছোটগল্পে বেশি আকর্ষণীয় হলেও উপন্যাসে চরিত্রের বিবর্তন দেখাবার যে সুযোগ থাকে, ছোটগল্পে সে সুযোগ একেবারেই নেই। আভাসে-ইঙ্গিতে, সুনির্বাচিত ঘটনার মাধ্যমে খুব অল্প কথায় চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে হয়। এই নির্বাচন ও ব্যঞ্জনায় যিনি যতো বেশি দক্ষ, তাঁর হাতে ছোটগল্প ততো বেশি শিল্প সফল হয়ে ওঠে।

দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালে সূত্রগুলি আর একটু স্পষ্ট হয়ে উঠবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে এমন একটি উপন্যাস ও ছোটগল্প গ্রহণ করা যাক যাদের মধ্যে বক্তব্যের কিছুটা অভিন্নতা আছে। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' এবং রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' আমরা পাশাপাশি বিচার করতে পারি। স্বামী-স্ত্রীর মানসিকতা যদি এক-

রকমের না হয়, স্বামী নিজের কাজ কর্ম ও পড়াশুনা নিয়ে যদি ব্যস্ত থাকেন—স্ত্রীকে যেটুকু সময় দেবার তা যদি না দেন তবে প্রকৃতির নিয়মেই স্ত্রীর মনের শূন্যস্থান অপর একজন অধিকার করে নেবে, এটাই স্বাভাবিক। চন্দ্রশেখর তাঁর অধ্যয়ন ও বিদ্যাচর্চার মধ্যে এতো নিবিষ্ট ছিলেন যে শৈবলিনীকে দেওয়ার মতো সময় তাঁর বিশেষ ছিল না। বাল্যপ্রণয়ী প্রতাপ এই কারণেই শৈবলিনীর হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছিল। 'নষ্টনীড়' গল্পের চারুলতার ক্ষেত্রেও প্রায় একই ব্যাপার ঘটেছিল। সমাজের উন্নতি ও সংবাদপত্র প্রকাশের উন্মাদনায় স্ত্রী চারুলতার কোমল হৃদয়ের শূন্যতার প্রতি মনোযোগী হবার সময় ভূপতি পায়নি। যখন পেল তার আগেই কিন্তু সম্পর্কিত-ভাই অমল চারুলতার শূন্য হৃদয় অধিকার করেছে। এবার সূত্রানুযায়ী এই উপন্যাস ও ছোটগল্পের পার্থক্য লক্ষ্য করে দেখা যেতে পারে।

এক॥ আকারে 'চন্দ্রশেখর' এবং 'নষ্টনীড়ের' মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে, কিন্তু উপন্যাসের যে আয়তন স্বচ্ছন্দতায় বৃদ্ধি পেতে পারে—পৃথিবীর বিভিন্ন ধ্রুপদী উপন্যাসের যে আয়তন আমরা দেখেছি তার তুলনায় 'চন্দ্রশেখর'-কে বিশাল-কলেবর বলা চলে না। পক্ষান্তরে 'নষ্টনীড়' আখ্যানের যে কলেবর আমরা দেখি, তা সাধারণভাবে ছোটগল্পের তুলনায় কিছুটা বড়োই বলতে হবে। অথচ প্রকৃতিগত লক্ষণ বিচারে 'নষ্টনীড়'-কে যে সার্থক ছোটগল্প আখ্যা দিতেই হবে তা বিভিন্ন সূত্র বিচার করলেই বোঝা যাবে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আকার এই দুই সাহিত্য-প্রকরণের পার্থক্যবিচারে খুব বড় কথা নয়।

দুই॥ দাম্পত্যজীবনের মধুরকোমল দিক অস্বীকার করে প্রগাঢ় শাস্ত্রালোচনা ও বিদ্যার চর্চা করলে জীবনে কী ধরনের অশান্তি নেমে আসতে পারে, জীবন কীভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, তার এক সামগ্রিক ও অখণ্ড চিত্র আমরা 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে পাই। (শৈবলিনী ও প্রতাপের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তার পরিণাম, চন্দ্রশেখরের বোধোদয়, তাঁর প্রতিক্রিয়া ও প্রায়শ্চিত্ত—সবই এমন সম্পূর্ণতায় দেখানো হয়েছে যে জীবনের এই সমস্যাটি অখণ্ড ভাবে ফুটে উঠেছে, এ কথা আমাদের বলতেই হবে। উপন্যাসটি শেষ করার পর আমাদের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির প্রশ্ন স্বতন্ত্র, কিন্তু কোন অতৃপ্তি বা অজানা রহস্য আমাদের আলোড়িত করে না।) এর পাশে যদি তুলনা করা হয় 'নষ্টনীড়'-কে তাহলে আমরা দেখতে পাবো (একেবারে আকস্মিক ভাবে চারুলতার নৈঃসঙ্গ এবং ভূপতির অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততাতেই গল্পের শুরু এবং অচিরেই সেই নিঃসঙ্গ হৃদয়ের উপযুক্ত সঙ্গী অমলের আবির্ভাবে গল্পের জটিলতা দানা বাঁধে।) (সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়ে যেমন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস শেষ হয়েছে, 'নষ্টনীড়ে' কিন্তু তা হয়নি।) অমল বিবাহ করে অন্যত্র বসবাস করলেও চারুলতা তাকে ভুলতে পারে না, ভূপতির এখন নিরন্তর কাছে আসার চেষ্টাও প্রবলভাবে ব্যর্থ হয়ে যায়—এই অতৃপ্তি একদিকে যেমন পাঠককে আলোড়িত করে ; (অন্যদিকে চারুলতার দাম্পত্য জীবন আবার স্বাভাবিক হবে কিনা, ভূপতি ভালোবাসার দ্বারা চারুলতার হৃদয় জয় করতে পারবে কিনা, এই অন্তহীন প্রশ্ন নিয়েই গল্পটি সমাপ্ত হয়।)

তিন ॥ বিস্তারিত বর্ণনা 'নষ্টনীড়' গল্পে পুরোপুরি বর্জন করা হয়েছে, যতটুকু আবশ্যক এবং একেবারে অপরিহার্য, সেটুকুই শুধু রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বিপর্যয়ের অনুভূতি জাগার পর যথাক্রমে চন্দ্রশেখর ও ভূপতির প্রতিক্রিয়া আমরা স্মরণ করতে পারি। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে কিন্তু এমন অনেক বর্ণনা আছে, উপন্যাসের আস্বাদ দেবার জন্যই যা লেখক রচনা করেছেন, কাহিনীর পক্ষে যার অনিবার্যতা ছিল না, অন্তত তা বর্জিত হলে গল্পপ্রিয় পাঠকের কোন ক্ষতি হতো না। 'নষ্টনীড়' সেক্ষেত্রে আবশ্যককেও বর্জন করেছে। গল্প এমন লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয় যে গল্পের প্রিয় পাঠক মধ্যের ফাঁকগুলি ভরাট করবার সময় অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন।

চার ॥ (ছোটগল্প রচনার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে এবং গল্পের লেখক সেই উদ্দেশ্যের পক্ষে যা অপরিহার্য তাই রচনা করেন।) পক্ষান্তরে গল্পের আয়োজনটা উপন্যাসের অন্যতম শর্ত বলেই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের দ্বিতীয়াংশে লেখককে ঘটনার ঘনঘটা সৃষ্টি করে পাঠককে অভিভূত করে ফেলতে হয়। চন্দ্রশেখর তার জীবনের প্রধান অপূর্ণতার অনুভূতি পাবার পর এতো সব রোমহর্ষক ঘটনার সমাহার আজকের পাঠকের ভালো নাও লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে গল্পপ্রিয় পাঠকদের অভিভূত করার মতো সুযোগও রবীন্দ্রনাথ বর্জন করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত 'নষ্টনীড়' গল্পে আছে। অমলের স্ত্রীর সঙ্গে চারুলতার সম্পর্ক পাঠকদের অত্যন্ত রুচিকর হতে পারতো, কারণ অমল অত্যন্ত প্রিয় বলেই একদিকে যেমন তার স্ত্রী চারুলতার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী হওয়ার কথা, অন্যদিকে যে-অমলের হৃদয় একদিন চারুলতা অধিকার করেছিল, যে মেয়ে এখন তা সম্পূর্ণ কেড়ে নিয়েছে, সে চারুলতার প্রতিদ্বন্দ্বিনী ছাড়া কিছুই নয়। (কাজেই অমলের স্ত্রী ও চারুলতার মুখোমুখি সাক্ষাৎকার আমাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো, কোন সন্দেহ নেই।) অমলের পক্ষে স্ত্রী নিয়ে একটা সৌজন্য-সাক্ষাৎকারে আসা স্বাভাবিকও ছিল। (অথচ গল্পের উদ্দেশ্যের পক্ষে অপরিহার্য নয় বলেই এই সুন্দর সম্ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করেছেন।)

পাঁচ ॥ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রের মূল বিবর্ধন এবং পরিণতি আমরা জানি—তাদের বিবর্তনের ইতিহাসটাই আমাদের কাছে উপভোগ্য। 'নষ্টনীড়' ছোটগল্পের তিনটি চরিত্র একেবারে হঠাৎ এসেছে, প্রয়োজন বুঝে মন্দা চরিত্রটি আনা হয়েছে এবং যখনই প্রয়োজন ফুরিয়েছে গল্পের মতো চরিত্র তিনটিও কোন স্পষ্ট কথা না বলেই বিদায় নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। চারুলতা ও ভূপতির বিবাহিত জীবনের সূচনা আমরা দেখি নি, অমলের সঙ্গে ঠিক কী সম্পর্ক ভূপতির আমরা জানি না, চরিত্রগুলির পরিণতি কী, সে বিষয়েও আমাদের কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। আমরা জানি, এই গল্পের জন্য দরকার চারুলতার নৈঃসঙ্গ দেখানো, সেখানে অমলের অনুপ্রবেশ এবং এটা অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়বার পর ভূপতি-

চারুলতার দাম্পত্য সম্পর্কের যন্ত্রণা। এই উদ্দেশ্য কঠোরভাবে মনে রেখে অমল-চারুলতার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন লেখক, সাহায্য নিয়েছেন মন্দা বৌঠানের, কিন্তু বিস্তৃত ভাবে নয়, কলমের দু-একটি আঁচড়েই ব্যাপারটা এগিয়েছে।

ঘ. ছোটগল্পের সংজ্ঞানির্ণয়

ছোটগল্পের কোন সুনির্দিষ্ট এবং সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা এখনও গড়ে ওঠেনি, কাজেই সংজ্ঞা নির্ণয়ের চেষ্টা করলেই ছোটগল্পের মূল প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা সহজ হবে। সেই কারণেই আমরা সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই আগে করবো। এ বিষয়ে সংজ্ঞা যাঁরা দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের মন্তব্য উদ্ধার করা সমীচীন বিবেচনা করছি এই কারণে যে, তাতে ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তত আমরা ধরতে পারবো এবং সেই ভাবেই এর সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারবো।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ছোটগল্প সম্পর্কে প্রথম সুচিন্তিত ও তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন কবি ও কথাসাহিত্যিক এডগার অ্যালান পো। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে ঠিক এর সংজ্ঞা না দিলেও আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন। আকার সম্বন্ধে তার মন্তব্য এটা এমন এক ধরনের গদ্যসাহিত্য "requiring from half an hour to one or two hours in its persual."

এই ধরনের একটি মন্তব্য H. G. Wells-ও করেছিলেন, তাঁর মতে ছোটগল্প দশ থেকে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়। Hudson এর সীমা আর-একটু স্থিতিস্থাপক ও যুক্তিগ্রাহ্য করে বলেছেন—"a short story is a story that can be easily read at a single sitting".

ছোটগল্পের প্রকৃতি সম্বন্ধে পো-র মন্তব্য—"In the whole composition there should be no word written of which the tendency, direct or indirect, is not to the one pre-established design...undue brevity is just as exceptionable here as in the poem ; but undue length is yet more to be avoided."

এখানে ছোটগল্পের প্রকৃতিগত একটি বৈশিষ্ট্য আমরা পাচ্ছি, কঠিন সংযম।

এ বিষয়ে একটা নতুন কথা এবং কার্যত নতুন ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন Brander Mathews তাঁর The Philosoply of the Short story গ্রন্থে—

"The short story by its effect, a certain unity of impression which set it apart from other kinds of fiction...A short story deals wiih a single character, a single event, a single emotion or the series of emotions called forth by a single situation."

অর্থাৎ ছোটগল্পের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি এখানে ঐক্য বা একক ব্যাপারটির ওপরই জোর দিলেন, বললেন তাতে থাকবে হয় প্রতীতির ঐক্য অথবা একটিই চরিত্র একটিই ঘটনা, একটিই আবেগ অথবা একটি পরিস্থিতিবোধক কিছু ভাবাবেগ।

এই একটি বা এককত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে ওয়েবস্টার ডিক্শনারি এবং এনসাইক্লোপিডিয়াতেও, সেখানে বলা হয়েছে—"A short story usually representing the orisis of a single problem."

কথাটিকে সমর্থন করা হয়েছে Hudson-এর সাহিত্য-প্রবেশিকাগ্রন্থ An Introducton to the Study of Literature গ্রন্থেও, তিনি লিখেছেন—"A short story must contain one and only one informing idea, and that this idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of method."

একই কথা পাই Fred Lewis Pattey-র সংজ্ঞায়: Impressionist prose tale···short, effective, a single blow, a moment of atmosphere, a glimpse of a climatic incident—"

ম্যাথিউজ যে প্রতীতির কথা বলেছিলেন সেই প্রতীতির উল্লেখ এখানে আমরা পাচ্ছি। এ ব্যাপারে অত্যন্ত জোর দিয়ে কথা বলেছেন Sean O' Faolain তাঁর The Short story প্রবন্ধে। তিনি বলতে চেয়েছেন লেখকের একান্ত নিজস্ব প্রতীতিই ছোটগল্পের সম্পদ এবং মহৎ ছোটগল্পে তাই পাঠক আশা করেন—"The short story is an emphatically personal exposition. What one searches for and what one enjoys in a story is a special distillation, a unique sensibility whcih has recognised and selected at once a subject that above all other subject, is of value to the writers temperament and to his alone—his counterpart, his perfect opportunity to project himself."

ছোটগল্পের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও। 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতার সেই অংশটুকু এখনও বিখ্যাত হয়ে আছে:

"ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

দেখা যাবে, একেবারে খাঁটি কথাগুলিই রবীন্দ্রনাথ এখানে ধরেছেন, সেগুলি হল—ছোটগল্প সাধারণ মানুষের সাধারণ সুখ-দুঃখের গল্প, সংযম এর প্রধান লক্ষণ বলেই বর্ণনার বাহুল্য এখানে থাকবে না, এখানে আমরা চাই চরিত্রের দীপ্তি—গল্পের চমৎকারিত্ব নয়, তত্ত্ব বা উপদেশের কোন স্থানই এর সংযত পরিসরে নেই। আর একটি প্রায়-নতুন কথা তিনি শোনালেন, এর উপসংহার হবে অত্যন্ত অতৃপ্তি-জনক। আমরা এর প্রত্যেকটি লক্ষণ নিয়েই আলোচনা করবো, কিন্তু আপাতত একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা নির্ণয় করা যাক। আমরা সাহিত্যিক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সংজ্ঞাই ঈষৎ পরিবর্তিত করে বলতে পারি :

ছোটগল্প লেখকের মানসপ্রতীতি-জাত একটি সংহত গদ্যকাহিনী যার একমাত্র বক্তব্য কোন ঘটনা, চরিত্র, পরিবেশ অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।

এবার ছোটগল্পের এইসব প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

৬. ছোটগল্পের বিশিষ্ট লক্ষণ

যে সংজ্ঞার্থগুলি আমরা পরীক্ষা করলাম তার ভিত্তিতে ছোটগল্পের কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ আমরা নির্ণয় করতে পারি। আসলে সাহিত্য-সংসারের কনিষ্ঠতম সদস্য হিসাবে বাংলা ছোটগল্প যতোটা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তা বিচার-বিশ্লেষণের উপযুক্ত গ্রন্থাদির সংখ্যা সে পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। সেই কারণেই গল্পগুলির সৌন্দর্য এবং তা মূল্যায়নের কিছু আদর্শ আমাদের জেনে রাখাটা খুবই দরকার।

● ছোটগল্পের একমুখিনতা

ছোটগল্পের বিভিন্ন লক্ষণ নিয়ে বহু মতভেদ আমরা লক্ষ করেছি, কিন্তু এই একটি লক্ষণ সম্বন্ধে সমালোচকগণ এখনও পর্যন্ত একমত—একটি এবং কেবলমাত্র একটি উদ্দেশ্য নিয়েই ছোটগল্প রচিত হবে। ছোটগল্পের সঙ্গে উপমা দিতে গিয়ে কবি কিপলিঙের সার্থকভাবেই মনে পড়েছে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশের 'Bull's eye Lantern'-এর কথা—যে আলো বেশি জায়গায় পড়ে না, পড়ে সামান্য কিছুটা জায়গায়, কিন্তু সেই জায়গাটিকে আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে। ছোটগল্পও ঠিক তাই। জীবন অনেক বড়ো, অনেক বিশাল, অনেক ব্যাপ্ত—সেই ব্যাপ্ত জীবন-ভূমি আলোকিত করার দায় নেই ছোটগল্পকারের। তিনি বুল্স্ আই লণ্ঠনের মতো চকিত তীব্র আলো ফেলেন মানুষের হৃদয়ের যে কোন একস্থানে। বাকি সব অন্ধকার থাক কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু ওই স্বল্প স্থানের তীব্র উদ্ভাস সমস্ত মানুষটাকে স্পষ্ট করে তোলে, এটাই ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য।

একটা এবং যে কোন একটা—এই ঐক উদ্দেশ্যই ছোটগল্পের সাফল্যের মূলমন্ত্র। কোথাও আবেগের বশবর্তী হয়ে অথবা জনপ্রিয়তার প্রলোভনে এই একমুখিনতা থেকে বিচ্যুত হলেই ছোটগল্পের শিল্প মহিমা ক্ষুন্ন হবার আশঙ্কা থাকে। একমুখী উদ্দেশ্য মানে একটি বিচিত্র চরিত্রকে দেখানো হতে পারে যেমন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনেক গল্পেই দেখিয়েছেন ; চরিত্রের একটি অদ্ভুত প্রবণতা হতে পারে—যেমন আমরা দেখেছি জগদীশ গুপ্তের 'পয়োমুখম্' গল্পে কিংবা বিমল মিত্রের 'লজ্জাহর' গল্পে। একটি বিশেষ ধারণা বা প্রতীতি নিয়েও ছোটগল্প রচিত হতে পারে, যেমন মানুষ সারাজীবন ধরে বাঁচে না, বাঁচে কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্তের স্মৃতি নিয়ে—এই রকম একটা ধারণা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'একরাত্রি' নামে একটি অসাধারণ ছোটগল্প লিখেছেন। এক ধরনের মেজাজ বা mood নিয়েও ছোটগল্প রচিত হতে পারে, সেখানেও পটভূমি বা অন্য কিছু বর্ণনায় সেই মেজাজ ধরে রাখবার চেষ্টা করা হয়, যেমন সামারসেট মমের 'দি রেন' অথবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আত্মহত্যার অধিকার'। একটি বিশেষ ভাবাবেগ বা সেণ্টিমেণ্ট নিয়ে ছোটগল্প লেখা যেতে পারে, যেমন জগদীশ গুপ্তের 'অপহৃত আকাশ-কুসুম', বিমল করের 'তুচ্ছ'। কোন বিষয়ে এক রোমাঞ্চকর উদ্বেগ ও উত্তেজনা বা সাসপেন্স নিয়েও ছোটগল্প লেখা হতে পারে—তা অ্যালান পো-এর 'দি পিট এ্যান্ড দি পেণ্ডুলাম'-এর মতো গা হিম করা অনুভূতি হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণের' মতো রোমাঞ্চমধুর উত্তেজনা হতে পারে, অথবা হতে পারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ইকেবানা'-র মতো ত্রিভুজ প্রেমের টানটান উত্তেজনা। আসলে লেখক কী উদ্দেশ্য নিয়ে ছোটগল্প লিখছেন সেটা বড় কথা নয়, যে উদ্দেশ্য নিয়ে গল্প লিখতে শুরু করেছেন তা কখনই বিস্মৃত হবেন না, এটাই কাম্য এবং এতেই ছোটগল্পের সিদ্ধি।

● ছোটগল্পে ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন

লেখক তাঁর নিজের ব্যক্তিত্বকে সম্প্রসারিত ও প্রতিফলিত করার সুযোগ সাধারণভাবে কথাসাহিত্যে নিশ্চয়ই পান, কারণ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর উপন্যাস বা ছোটগল্প রচনার প্রধান প্রেরণা, কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এ কথা আরো গভীরভাবে সত্য। কারণ ছোটগল্প মূলত অনুভূতিমূলক। কবি তাঁর যে অনুভূতি ব্যক্তিগত অনুভূতি হিসাবেই প্রকাশ করেন, ছোটগল্পকার তা সম্প্রসারিত করেন তাঁর গল্পের নায়ক-নায়িকা বা পার্শ্ব-চরিত্রের মধ্যে, এইটুকুই পার্থক্য। অনুভূতির ওপর মহৎ ছোটগল্পকার এতোখানি গুরুত্ব আরোপ করেন বলেই ক্রোচের মতো দার্শনিক মোপাসাঁ-র গল্পে গীতিকবিতার স্পন্দন শুনতে পেয়েছেন। Poetry and Non-Poetry প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"The lyric is

really intrinsic to the from of the narrative, and shapes each part of it, without mixture and without having any residue."

একটি মানুষ আসলে প্রতিদিনের ব্যবহারে হাজারটা মানুষ হয়ে যায়, নিজের মধ্যে সে অজস্র সত্তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে—বিশেষ মুহূর্তে ও বিশেষ পরিস্থিতিতে সেটা বোঝা যায়। কখনো নিজেকে সেই ভাবে জানা বা চেনা ব্যক্তির মধ্যে অচেনা সত্তার আবিষ্কার লেখক করতে পারেন তাঁর ছোটগল্পে—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে যা আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। তাছাড়াও কিন্তু লেখকের এই আত্মপ্রক্ষেপ ঘটতেই থাকে আত্মনিষ্ঠ ছোটগল্পে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'পোস্টমাস্টার' গল্পের শেষে লেখেন মানুষের হৃদয় মানুষকে ভালবেসে যতোই ব্যথা পাক, পুনর্বার সুযোগ পেলে সে আবার মানুষকে ভালবাসবে এবং যন্ত্রণা পাবে ; অথবা 'হৈমন্তী' গল্পে যখন প্রচলিত দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে মন্তব্য করেন, তখন তিনি নিজের বিশ্বাসকেই গল্পে প্রতিফলিত করেন। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি ছিলেন বলেই যে ব্যাপারটা ঘটেছে তা নয়—নিজের জ্ঞানবিশ্বাস ও ব্যক্তিত্ব অনুসারে পরোক্ষ ভাবে আত্মপ্রক্ষেপ ঘটে বলেই একই বিষয় বিভিন্ন লেখকের গল্পে বিভিন্ন ব্যঞ্জনা লাভ করে। পশু নিয়ে গল্প অনেকেই লেখেন, তবু শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', প্রভাতকুমারের 'আদরিণী', পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' ও তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' যে ভিন্ন স্বাদের হয় শেষপর্যন্ত, তার কারণ এই ব্যক্তিত্বের অদৃশ্য প্রভাব। এই কারণেই শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' গল্পের বিজলী তার চটুল বাগ্‌ব্যবহার সত্বেও মহীয়সী নারীতে রূপান্তরিত হয়, জগদীশ গুপ্তের 'ঠিকানায় বুধবার' গল্পের নায়িকা বাস্তব সংসারের average গণিকা হয়েই থাকে। ব্যক্তিত্বের প্রক্ষেপ যে ঘটে এবং তাতে যে গল্পের কোন ক্ষতি হয় না, এ বিষয়ে ইংরেজ সমালোচকের একটি মন্তব্য উদ্ধার করেছেন সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাশ—"No man ought to embark upon a career of short story writing who is not aware that he himself lives a hundred short stories a day, and that he is not unlike anybody else in the world in this."

● ছোটগল্পের বিষয়

ছোটগল্পের বিষয় কী হতে পারে, এ আলোচনা না করে বরং আলোচনা করা উচিত ছোটগল্পের বিষয় কী হতে পারে না। প্রশ্নের উত্তরে এই রকম একটি কথাই বলেছিলেন চেকভ, কোরোলেংকোকে। যে-কোন বিষয়, এমন কি অ্যাশ-ট্রে নিয়েও ছোটগল্প লেখা যায়, এই ছিল তাঁর ধারণা এবং বিশ্বসাহিত্যের সামান্য কিছু মহৎ ছোটগল্পের সন্ধান রাখলে বোঝা যাবে চেকভের ধারণা অসংগতও

ছিল না। তাঁকে সমর্থন করেছেন হুইটম্যান এই বলে যে, Reject nothing, আবার হুইটম্যানকে সমালোচনাও করেছেন লরেন্স। কিন্তু আসল কথাটা এই যে, ছোটগল্পকার নিজে যদি মনে করেন এই বিষয়টি নিয়ে গল্প লেখা যায়— তাঁর অনুভূতি এবং মানসিকতা এর দ্বারা তিনি প্রকাশ করতে পারেন, তাহলে তাকে বিষয় হিসাবে নির্বাচন না করার কোন কারণ নেই।

ছোটগল্পের বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি নির্দেশ রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন— ছোটপ্রাণের ছোটখাট দুঃখ কথা, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের কথা নিয়েই লেখা হবে ছোটগল্প, বিরাট মানুষ বা বিরাট ঘটনার সন্ধান করবার কোন দরকার নেই। ছোটগল্পে বৈচিত্র্যসন্ধানী লেখকদের ব্যঙ্গ করে চেকভ একটি চিঠিতে প্রায় এই ধরনের কথাই লিখেছিলেন—"People do not go to the North Pole and fall of icebergs ; they go to office, qurrel with their wives and eat cabbage soup." অর্থাৎ সাধারণ মানুষের এইসব সাধারণ ঘটনাই ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে এবং তাই হওয়া উচিত।

অবশ্য এই মনোভাবের বাড়াবাড়ি ঘটলে—অর্থাৎ আমি যাকে গল্পের বিষয় ভাববো তাই হবে গল্প, এই মনোভাব চূড়ান্ত আধিপত্য করলে গল্প ব্যাপারটাই ধীরে ধীরে ছোটগল্প থেকে চলে যেতে পারে। এই লক্ষণ যে আধুনিককালে দেখা দেয়নি, এমনও নয়। ঠিক আন্দোলনের আকারে না হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই আধুনিককালে এমন ধরনের গল্পের সন্ধান আমরা পেয়েছি যা থেকে মনে হতে পারে ছোটগল্পে আদৌ কোন গল্প থাকবার প্রয়োজন নেই। কয়েক মুহূর্তের আন্দোলিত মানসিকতা, একটি বিষণ্ন বা ভোঁতা মেজাজ, কিছুটা 'জাগর-স্বপ্ন' বা surrealism—এ সবই ছোটগল্পের অবলম্বন হতে পারে, এমনকি অলীক কিছু চিন্তাও। এসব নিয়ে ছোটগল্প লেখাও হয়েছে, যেখানে গল্প ব্যাপারটাই প্রায় অনুপস্থিত। আমেরিকার বিশিষ্ট লেখক জন ও-হারা সংবাদপত্রের বিবৃতির মতো গল্প লিখেছেন, আমাদের সাহিত্যে জগদীশ গুপ্তও তাই। গল্পহীন গল্প লিখেছেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক পার লাগের্কভিস্ট্। এই ধরনের গল্প নিয়ে 'ছোটগল্প নব নিরীক্ষা' নামে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন বাংলা ছোটগল্পে বিমল কর।

ছোটগল্পের বিষয়ভিত্তিক এক স্বেচ্ছাচারকে তীব্র সমালোচনা করেছেন সামারসেট মম। তিনি এই ধরনের গল্পকে বলেছেন 'drab stories'-একেবারে বর্ণহীন নীরক্ত গল্প। যাঁরা ভেবেচিন্তে একটি সুসংহত বৃত্ত রচনা করে ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করতেন তাঁদের গুরুত্ব অনেক বেশি বলে তাঁর ধারণা এবং এই বর্ণহীন গল্প একটা হুজুকমাত্র। এজন্য চেকভকেই মূলত দায়ী করে 'Creature of Circumstances' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন—"Nor is a story any the worse for being neatly built with a beginning, a middle and an end. All

good story writers have done their best to achieve this. It is the fashion of today for writers, under the influnce of an inadequate acquaintance with chekov, to begin anywhere and end inconclusively…The result is a spate of drab stories in which nothing happens."

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য, গল্প মোটেই নিন্দনীয় নয়, যারা গল্পকে বা গল্পাংশকে ভিত্তি করেই ছোটগল্প লিখেছেন তাঁদের প্রতিভাকে আমরা স্বীকার করি। বিষয় হিসাবেও শুধু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনীতেই তাকে আবদ্ধ করে লাভ নেই। জীবনের বৈচিত্র্য অনেক, যে মানুষ প্রথম একটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করল—চোখের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে এমন কেউ নেই, তার পায়ের কাছে বরফের অন্দোলিত সমুদ্র, এই নিয়েও ছোটগল্প রচিত হতে পারে, অবশ্যই পারে। কিন্তু মানুষের আফ্রিকার গহন অরণ্যে অভিযান যদি গল্পের বিষয় হয় তবে তার চেয়েও দুর্ভেদ্য যে মন, সেই মনের অরণ্যভ্রমণ গল্পের বিষয় হবে না কেন! গভীর অনুভূতি অনেক সময়ই সংকেতের চেহারা নিয়ে আসে —গল্পের শরীর সেখানে খুব বড় হয়ে ওঠে না, সেগুলিকে আমরা গল্প বলবো না কেন! বাংলা ছোটগল্পেও এরকম উদাহরণ প্রচুর আছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাতের গাড়ি', বিমল করের 'শীতের মাঠ' প্রভৃতি এর উদাহরণ। এর পরেও থাকে আধুনিক রূপক গল্প। মনে করতে পারি প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'স্টোভ', বিমল করের 'বাঘ', রমাপদ চৌধুরীর 'বড়বাজার' প্রভৃতি অসাধারণ গল্পের কথা রূপকধর্মী ছোটগল্পের যে বিচিত্র পরীক্ষা আমরা সাম্প্রতিককালে বিমল করের পাঁচটি গল্পে দেখেছি তাও স্মরণযোগ্য। ছোটগল্পকে তার কথাবস্তু ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ না দিলে তার স্বাস্থ্যকর বিকাশ ঘটবে কী করে!

তবে এই সঙ্গে আর একটা কথাও আছে। একদিকে যেমন দেখতে হবে ছোট-গল্প যেন গল্পসর্বস্ব না হয়, অর্থাৎ গল্পকারের অনুভূতি এবং গল্পের বিশেষ প্রতীতি যেন সেখানে ধরা পড়ে; আবার অন্যদিকে দেখতে হবে একেবারে নির্বস্তুক প্রতীতিসর্বস্ব হয়ে উঠে যেন তা কবিতা না হয়ে যায়—কারণ সেক্ষেত্রে বর্তমানকালের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রকরণের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে পারে।

● ছোটগল্পের সূচনা

চলমান জীবনের সমগ্রতা বা অখণ্ডতা দেখাবার কোন সুযোগ ছোটগল্পের নেই, বুল্‌স্‌-আই লণ্ঠনের মতো জীবনের একটি অংশকেই সে তীব্রভাবে আলোকিত করে তোলে। আগে-পরে বিশাল অন্ধকার, কিন্তু ওই একটি অংশে চকিত আলোর

দীপ্তি গোটা চরিত্রকেই আলোকিত করে তোলে। দৃষ্টান্ত হিসাবে মনে করা যায় তারাশঙ্করের 'সমুদ্র-মন্থন' গল্প যেখানে যখন-তখন চুরি করা ঘৃণ্য একটি খোনা মেয়ে অসাধারণ দীপ্তি পেয়ে যায়, যখন শুনতে পাই সে চুরি করে তার অসুস্থ স্বামীকে বাঁচাবার জন্য।

এই কারণেই ছোটগল্পের আরম্ভটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের যে খণ্ডাংশ তা ধরতে চায় তা জীবনের আরম্ভ নয় বলেই সুস্পষ্ট সূচনা দিয়ে গল্প আরম্ভ হতে পারে না, তা আরম্ভ হয় ওই মাঝখান থেকেই। মনে করা যাক রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' গল্পের সূচনা—"কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে।"

অথবা ভাবা যাক সাম্প্রতিক কালের গল্পকার আবুল বাশারের 'নিগ্রহান্তর' গল্পের সূচনা—"আমির হালদারের বড় জামাই সুফল বাঁদ্য পাট্যা গুঁচোর ঠান্ডা ঝোলসর দিয়ে শুকনো কড়কড়ে আমন ভাত মেখে মুখে সোয়াদ করে খাবে বলে তৈরি, তা এমন সময় পেট-ফেলানী সুমুরুদ্দির বউ মালেকা চৈত-পবনী আউড়ী এসে উঠোনে দাঁড়াল।"

কোন ভূমিকা নেই, আড়ম্বর নেই—একেবারে গল্পের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম আমরা। অবশ্য এর একটা অন্য কারণও আছে। সংযমই ছোটগল্পের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কতো অল্প কথায় কতো বেশি কথা বলা যায়, এটাই ছোটগল্পের লক্ষ্য হওয়া উচিত, সুতরাং উপন্যাসের মন্থর সূচনা তার জন্য নয়—তাকে সোজাসুজি ঢুকে পড়তে হবে গল্পের মধ্যে। এই কারণেই গল্পলেখকদের সম্বন্ধে এডগার অ্যালান পো-র নির্দেশ ছিল—"If his very initial sentence tend not to the outbringing of this effect, then he has failed in his first step."

যে গল্পের যা উদ্দেশ্য সেইভাবেই তার সূচনা হয়, একথাও পো-এর এই নির্দেশ থেকে আমরা জানতে পারি। গল্পের মোটামুটি একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে যায় এই সূচনা থেকেই, যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' গল্পের প্রারম্ভ বাক্যটি এই—'মাঝরাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল।'

অথচ গল্পের মেজাজ সম্বন্ধে প্রারম্ভ বাক্যেই আমাদের ধারণা জন্মে যায় যখন আমরা শুরু করি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প 'চোর'—"আমি যেদিন পেঁপে চারাটা পুঁতলাম ঠিক সেদিন ও আমাদের বাড়ীতে এল। তখন শ্রাবণ মাসের বিকেল।"

তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ছোটগল্পের সূচনাকে ভিত্তি করে এর দু-ধরনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে—Initial Incident বা চমকিত সূচনার গল্প এবং Preliminary

Situation বা পূর্ব ঘটনা সূচক আরম্ভ। বিমল করের দুটি বিখ্যাত গল্প থেকে এই পার্থক্যের উদাহরণ দেওয়া যায়।

এক ॥ চমকিত সূচনা : ”নদীর চরায় শিবাণীর চিতা জ্বলছিল।” (আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন)

দুই ॥ পূর্বসূচনামূলক : “আমরা ভাইবোন মিলে মা-র পাঁচটি সন্তান। বাবা বলত, মার হাতের পাঁচটি আঙুল।” (জননী)

আসল কথা, গল্প সম্বন্ধে একটা আভাস দেওয়া এবং প্রথম থেকেই একেবারে গল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া—স্বল্প উপকরণে বিরাট প্রতিক্রিয়া তৈরি করার দিকেই লক্ষ রাখা উচিত গল্পলেখকের।

● ছোটগল্পের উপসংহার

‘শেষ হয়ে হইল না শেষ’—এই মধুর অতৃপ্তিতেই ছোটগল্প সমাপ্ত হওয়া উচিত, এ কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছোটগল্পের প্রকৃতি বিচার করলে এর একটা যৌক্তিকতাও আছে। ছোটগল্প জীবনের যে অংশ আমাদের দেখায় তা তার যেমন আরম্ভ নয়, তেমনি যেখানে সে জীবনের চিত্র দেখানো বন্ধ করে সেটাও তার পরিসমাপ্তি নয়। মাঝখান থেকে শেষ হয় বলে একটা মধুর অতৃপ্তি থেকে যাওয়াটা বোধহয় উচিত। স্মরণ করে দেখা যেতে পারে ‘বিষবৃক্ষ’ এবং ‘মধ্যবর্তিনী’ এই দুটি কথাসাহিত্যের উপসংহার। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বিষবৃক্ষে’ নগেন্দ্র দত্ত দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিল কুন্দনন্দিনীকে, কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পর নগেন্দ্রর স্ত্রী “সূর্যমুখী রোরুদ্যমান স্বামীর হস্তধারন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। পরে নগেন্দ্র ধৈর্যাবলম্বন-পূর্বক কুন্দকে নদীতীরে লইয়া যথাবিধি সৎকারের সহিত, সেই অতুল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জন করিয়া আসিলেন।” এর পরেও অবশ্য একটি পরিচ্ছেদ আছে এবং তার পর লেখক ‘গৃহে গৃহে অমৃত’ ফলাবার আকাঙ্ক্ষায় গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন। এটি উপন্যাস বলেই আমরা ধরে নিতে পারি, ‘ইহার পর সূর্যমুখী ও নগেন্দ্র দত্ত মহাসুখে ঘরসংহার করিতে লাগিলেন’-এই বাক্যটি উহ্য আছে।

‘মধ্যবর্তিনী’ রবীন্দ্রনাথের একটি অনবদ্য ছোটগল্প বলেই এর উপসংহার দৃশ্যত একরকম হয়েও এতো মধুর তৃপ্তিতে শেষ হয়নি। সেখানেও অসুস্থ হরসুন্দরী উপযাচিকা হয়ে নিবারণের বিবাহ দিয়েছিল শৈলবালার সঙ্গে। শৈলবালার মৃত্যুর পর দুজন পুনর্মিলিত হল, কিন্তু কীভাবে! তার বর্ণনাতেই গল্পটির সমাপ্তি— “উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।”

ছোটগল্প-লেখক এবং তার সমালোচকদের মধ্যে স্পষ্ট দুটি শ্রেণী-বিভাগ করা যায়—এক ॥ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের এই মধুর অতৃপ্তিকেই ছোটগল্পের আদর্শ উপসংহার বলে মনে করেন, দুই ॥ যাঁরা মনে করেন এরকম কোন অতৃপ্তি দিয়ে শেষ করা মানে পাঠকের প্রতি অবিচার করা। তাই অতৃপ্তির পরিবর্তে ধীর স্বাভাবিক পরিণতিই এঁদের কাম্য। ছোটগল্পকার চেকভ এবং সমালোচক হেনরি জেমস্ এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তে পারেন। অবশ্য যতো সহজে আমরা এই শ্রেণীবিভাগ করে ছিলাম, ব্যাপারটা এতো সহজ নয়। এই দুটি শ্রেণীর জটিলতর উপবিভাগ আছে। অতৃপ্তি যাঁরা পছন্দ করেন তাঁদের মধ্যে একদল আছেন চরমপন্থী যাঁদের পছন্দ আরো চমকজাগানো উপসংহার—যাকে বলে whip-crack ending বা চাবুক-হাঁকড়ানো সমাপ্তি। এড্‌গার অ্যালান পো, মোপাসাঁ, ও হেন্‌রি প্রভৃতি বিখ্যাত ছোটগল্প-লেখক এই ধরনের উপসংহারের পক্ষপাতী। এঁদের জনপ্রিয় গল্পগুলি স্মরণ করলেই বোঝা যাবে এই চাবুক হাঁকড়ানোর স্বরূপটি কী। বাংলা সাহিত্যে ঠিক এই ধরনের চমকিত বা জ্বালাধরানো উপসংহার অল্প আছে সত্য কথা কিন্তু একেবারে নেই এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের 'দেনা-পাওনা' গল্পের শেষ বাক্যটি স্মরণ করা যাক—"এবারে বিশ হাজার টাকা পণ, এবং হাতে হাতে আদায়।' মনে পড়তে পারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী' গল্পের শেষ বাক্যটিকেও—"খাও হে চক্কোত্তি।"

সামারসেট মম এই জাতীয় উপসংহারকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেছেন—"There is nothing to be condemned in a surprise ending if it is the natural end of a short story, on the contrary it is an excellence."

যাঁরা অতৃপ্তি ও চমক-জাগানো উপসংহার পছন্দ করেন না তাঁদের মধ্যে দু-ধরনের গল্পলেখক দেখা যায়—একদল পছন্দ করেন শান্ত স্বচ্ছন্দ উপসংহার, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' গল্পের সমাপ্তি 'অনেক দিনের একটি হাস্যধারার অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।'

আর একধরনের ছোটগল্পে উপসংহার গল্পকে এক বিরাট ব্যাপ্তি দান করে একটি বিশেষ সত্য শাশ্বত সত্যে পরিণত হয়। উদাহরণ হিসাবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের সমাপ্তি মনে করা যায়—"যে ধারাবাহিক অন্ধকার মাতৃগর্ভ হইতে সংগ্রহ করিয়া দেহের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ভিখু ও পাঁচু পৃথিবীতে আসিয়াছিল এবং যে অন্ধকার তাহারা সন্তানের মাংসল আবেষ্টনীর মধ্যে গোপন রাখিয়া যাইবে তাহা প্রাগৈতিহাসিক। পৃথিবীর আলো আজ পর্যন্ত তাহার নাগাল পায় নাই-পাইবেও না।"

অবশ্য এইসব উপসংহারের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয় সে সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করার কোন অর্থ হয় না। একই লেখক যে একাধিক উপায়ে ছোটগল্প সমাপ্ত করেছেন তার উদাহরণও অনেক আছে। আসলে বোধহয় বিষয় ও উদ্দিষ্ট প্রতীতিসৃষ্টি

অনুযায়ী যে উপসংহার লেখক উপযোগী মনে করেন সেই ধরনের সমাপ্তিই তিনি বেছে নেন।

চ. ছোটগল্পের বিভাগ-বিভাজন

ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগের ব্যাপারে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। বিষয় অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করতে হলে খুব স্থূল দুটি বিভাগ হতে পারে—এক ॥ ব্যক্তির নিজস্ব সমস্যার বিশ্লেষণ, এবং দুই ॥ ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সমস্যা বা সমাজ-সমস্যার বিশ্লেষণ। মূলত এই দুটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েও বহু ধরনের ছোটগল্প রচিত হতে পারে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মোট বারোটি উপবিভাগ করেছেন-দার্শনিক, সমাজ-সমস্যামূলক, নারী-পুরুষের মধ্যগত সম্পর্ক ও প্রশ্নাত্মক, মনস্তাত্ত্বিক, রোম্যান্টিক, চরিত্রাত্মক, রূপক, ব্যঙ্গমূলক, কাব্যধর্মী, আদর্শাত্মক ও রাজনৈতিক, অতিলৌকিক এবং বিচিত্র।

সাহিত্য-প্রকরণ গ্রন্থগুলির পথিকৃৎ 'সাহিত্য-সন্দর্শন' গ্রন্থে শ্রীশচন্দ্র দাশ এই পনেরোটি বিভাগের কথা বলেছেন—

এক ॥ প্রেমবিষয়ক : প্রেমই এই গল্পের প্রধান অবলম্বন, যথা তুর্গেনেভের The District Doctor, রবীন্দ্রনাথের 'শেষরাত্রি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ভস্মশেষ' প্রভৃতি।

দুই ॥ সামাজিক : এই বিভাগের মধ্যে আসা উচিত সমাজ সমস্যামূলক কোন গল্প, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা', শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'নারীমেধ,' নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' প্রভৃতি।

তিন ॥ প্রকৃতি ও মানুষ : এই শ্রেণীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—"এই শ্রেণীর গল্পে প্রকৃতির পটভূমিকায় চরিত্রাঙ্কন করা হয় এবং প্রকৃতি মানুষের সুখ-দুঃখের পশ্চাৎ-পট রূপে ব্যবহৃত হয়।" এই সংজ্ঞা থেকে মনে হয় Wordsworth লুসি গ্রে-র যে গল্প কবিতায় শুনিয়েছেন সেরকম গল্পই এই শ্রেণীতে পড়তে পারে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি', 'শুভা,' বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু গল্প, মনোজ বসুর 'বনমর্মর' এই শ্রেণীর গল্পের উদাহরণ।

চার ॥ অতি প্রাকৃত : ভৌতিক বা অলৌকিক জগতের অবতারণা না করে কেবলমাত্র অতিপ্রকৃতের রহস্যে পাঠককে অভিভূত করে রাখাই প্রকৃত অতিপ্রাকৃত গল্পের লক্ষ্য। গোগোলের 'ক্রিসমাস ইভ', এডগার অ্যালান পো-র 'ব্ল্যাক ক্যাট' বা 'দি ফল অব দি হাউস অব আশার', রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'মণিহারা,' সুবোধ ঘোষের 'ন তস্থৌ,' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মর্কট', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাসি', সত্যজিৎ রায়ের 'নীল আতঙ্ক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাঁচ ॥ হাস্যরসাত্মক : নামেই এই শ্রেণীর পরিচয়, তবে হাসির উদ্ভব ঘটতে পারে বিভিন্ন ভাবে—সামাজিক অসংগতি থেকে, চরিত্রগত অতিরঞ্জন থেকে, অথবা ঘটনাগত সজ্জা থেকে। উডহাউসের 'দি কাস্টাডি অব দি পাম্পকিন', রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বলবান জামাতা' বা 'মাস্টারমশাই', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'ডমরুধর-চরিত', পরশুরামের 'ভূশণ্ডীর মাঠ', বা 'গড্ডলিকা', শিবরাম চক্রবর্তীর 'শুঁড়ওয়ালা বাবা' অথবা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'সোফা-কাম বেড' এই জাতীয় গল্পের উদাহরণ।

ছয় ॥ উদ্ভট : ইংরেজিতে থাকে বলে Fantasy, বাংলায় তাকেই উদ্ভট গল্প বলা চলে। অসম্ভব কল্পনার মধ্যে কৌতুকই সাধারণত প্রধান হয়ে ওঠে। এইচ. জি. ওয়েলস-এর 'দি ইনভিজিবল্ ম্যান', পরশুরামের 'গগনচটি', কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভগবতীর পলায়ন', সত্যজিৎ রায়ের 'অংকস্যার ও গোলাপি বাবু' প্রভৃতি গল্পের নাম করা যায়।

সাত ॥ সাংকেতিক গল্প : সাধারণভাবে আপাতবর্ণিত বিষয় বা ঘটনা যেখানে একটি রহস্যময় সংকেতকে আশ্রয় করে থাকে সেখানে এই শ্রেণীর গল্পের উদ্ভব ঘটে। রূপকধর্মী বা Allegorical গল্প এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়, symbolic বা সাংকেতিক ব্যঞ্জনাই এসব গল্পের প্রাণ। উদাহরণ হিসাবে সামারসেট মমের 'দি রেন', রবীন্দ্রনাথের 'একটি অসম্ভব গল্প', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাতের গাড়ি', বিমল করের 'বাঘ' প্রভৃতি গল্পের নাম করা যেতে পারে।

আট ॥ ঐতিহাসিক : ইতিহাসের পটভূমিকায় কথাসাহিত্যিকগণ উপন্যাস লেখার ব্যাপারেই বেশি আগ্রহী হন, তবে ছোটগল্পও ঐতিহাসিক আখ্যানকে অবলম্বন করে লেখা হতে পারে। এই ধরনের গল্পের দৃষ্টান্ত—রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মৃৎপ্রদীপ', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রত্নতত্ত্ব' প্রভৃতি।

নয় ॥ বিজ্ঞান নির্ভর : এই জাতীয় গল্পকে ইংরেজিতে বলে সায়েন্স-ফিকশন। বিজ্ঞানের কোন প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অবলম্বন করে সুস্থ কল্পনার দ্বারা এরকম গল্প লেখা হয়। উদ্ভট গল্পেও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান থাকে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি কোনরকম আনুগত্য সেসব গল্পে থাকে না। এইচ. জি. ওয়েলস্ ও জুলে ভার্নের গল্প এই জাতীয় গল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ যুগের লেখকদের মধ্যে আইজ্যাক অ্যাসিমভ এবং আর্থার সি ক্লার্কের নাম করা যেতে পারে। বাংলায় বিজ্ঞাননির্ভর গল্প, খুব কম। যা আছে তার মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদার গল্প, সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কুর গল্প উল্লেখযোগ্য। ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য শুধু বিজ্ঞাননির্ভর গল্পই রচনা করেছেন।

দশ ॥ গার্হস্থ্য : পারিবারিক বা গার্হস্থ্য জীবন অবলম্বন করে লেখা

গল্পকেও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। চেকভ ও রবীন্দ্রনাথের গল্পে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে।

এগারো ॥ মনস্তাত্ত্বিক : পৃথক শ্রেণীতে মনস্তাত্ত্বিক গল্পকে বিন্যস্ত করা শক্ত কারণ মনস্তত্ত্ব নির্ভর না হলে ছোটগল্পের আকর্ষণই অনেক কমে যায়। তবু মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অত্যধিক প্রাধান্য পেলে তাকে আমরা এই শ্রেণীতে ফেলতে পারি, যেমন—রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি', 'শাস্তি', শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হাড়', বিমল মিত্রের 'লজ্জাহর', আবুল বাশারের 'হবা' প্রভৃতি।

বারো ॥ মনুষ্যেতর : মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবজন্তু নিয়েও অনেক গল্প লেখা হয়েছে। এমনকি একটি গাড়ি নিয়ে লেখা সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প হিসাবে স্বীকৃত। এই জাতীয় গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বালজাকের 'Passion in the desert', জন স্টেইনবেকের 'The snake', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়', 'নারী ও নাগিনী', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুধির বাড়ী ফেরা' প্রভৃতি।

তেরো ॥ বাস্তবনিষ্ঠ গল্প : ছোটগল্পমাত্রই বাস্তবনিষ্ঠ হয়ে থাকে, অন্তত তাই হওয়াই উচিত। তবু সাধারণভাবে ন্যাচারলিস্ট আন্দোলনে উদ্ভূত গল্পগুলিকে এই শ্রেণীতে ফেলা হয়। বাংলা ছোটগল্পের মধ্যে শৈলজানন্দের 'কয়লা কুঠির গল্প', জগদীশ গুপ্তের 'রামের টাকা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক', সমরেশ বসুর 'পাড়ি' প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

চৌদ্দ ॥ গোয়েন্দা গল্প : অপরাধ এবং অপরাধীকে ধরার ব্যাপারে পুলিশ বা গোয়েন্দার তৎপরতা যে সব গল্পের মুখ্য অবলম্বন তাদের বলা যেতে পারে গোয়েন্দা গল্প। ইংরেজিতে এই ধরনের গল্পে দক্ষতা দেখিয়েছেন এডগার অ্যালান পো, আর্থার কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি, চেস্টারটন। বাংলায় এই শ্রেণীর গল্পে দক্ষতা দেখতে পাই পাঁচকড়ি দে, হেমেন্দ্রকুমার রায়. নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায় প্রভৃতি সাহিত্যিকের।

পনেরো : বিদেশী পটভূমিকাযুক্ত গল্প : বিদেশের পটভূমিকায় কিছু অনবদ্য বাংলা ছোটগল্প রচিত হয়েছে, তাদের আমরা এই শ্রেণীতে ফেলতে পারি এই সব গল্পের মধ্যে প্রধান অবিনাশচন্দ্র বসুর 'বম্বের মোহ', রাখাল সেনের 'সহযাত্রী', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ফুলের মূল্য', ভিখারী সাহেব' প্রভৃতি।

● ছোটগল্পের ভিন্নতর বিভাগ

বিষয় ভিত্তিক এই বিভাগে ছোটগল্পের প্রকৃতি প্রায় উপেক্ষিতই থাকে। এর

প্রকৃতিকে প্রাধান্য দিয়ে পাশ্চাত্য সমালোচকগণ তিন ধরনের শ্রেণীবিভাগের পক্ষপাতী—

(ক) Story of Incident বা ঘটনামুখ্য গল্প।

(খ) Story of Character বা চরিত্রমুখ্য গল্প, এবং

(গ) Story of Impression বা প্রতীতিমুখ্য গল্প।

উপন্যাসের শ্রেণীবিচারের সময় যে কথাগুলি বলা হয়েছিল, তা এখানেও একবার স্মরণ করে নেওয়া যেতে পারে। উপন্যাসের শ্রেণীবিচার অত্যন্ত দুরূহ এই কারণেই যে সেখানে যে বিশেষ ধর্মের উপস্থিতিতে তাকে বিশেষ ধরনের উপন্যাস বলা হয় তা উপন্যাসমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম। এখানেও আমরা বলতে পারি, ছোটগল্পে ঘটনা কিছু ঘটবেই, তার তীব্রতা ও তাৎপর্য যতোই কম হোক না কেন, এমন কি তা প্রায় 'গল্পহীন' ছোটগল্প হলেও। আর গল্প যেখানে আছে, অর্থাৎ ঘটনা, সেখানে ঘটনা সংঘটনের উপযোগী চরিত্রকেও থাকতে হবে, কারণ কেবলমাত্র বর্ণনায় কোন গল্প তৈরি হয় না। প্রতীতি প্রসঙ্গে বলা যায়, এটি যে ছোটগল্পের অপরিহার্যগুণ সে তো ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়েই আমরা বলেছি, সুতরাং প্রত্যেকটি ছোটগল্পে ঘটনা, চরিত্র এবং প্রতীতি থাকবেই, এবং সেই কারণেই শ্রেণী নির্ণয়ে একজন সমালোচকের সঙ্গে অন্যজনের বিরোধ দেখা দেবেই। উপন্যাসের মতোই এখানে এদের যে কোন একটির প্রাধান্য ও অনিবার্যতা বিচারের চেষ্টা না করলে তার শ্রেণীনির্ণয়ও করা সম্ভব হবে না।

কোন গল্পকে ঘটনামুখ্য আমরা তখনই বলতে পারি যখন ঘটনাই গল্পকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ঘটনার অপ্রত্যাশিত মোচড় থেকেই পাঠকের মনে প্রতীতির সৃষ্টি হয়। মোপাসা বা ও হেনরির বেশ কিছু গল্প এই শ্রেণীতে পড়তে পারে। বাংলা সাহিত্যে বনফুলের কিছু এই শ্রেণীর গল্প আছে। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত এই ধরনের গল্প লেখেন না, তবে তাঁর 'মুক্তির উপায়'-কে এই শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে। গোয়েন্দা গল্প বা ভৌতিক গল্পে ঘটনা প্রাধান্য পায় বলে সাধারণভাবে তাদের এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে, তবে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও আছে, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ।'

চরিত্রমুখ্য গল্প বিদেশি সাহিত্যে এবং বাংলা সাহিত্যে অনেক লেখা হয়েছে। একটি বিশেষ চরিত্রকে অবলম্বন করেই এরকম গল্প লেখা হয় বলে এই গল্পের শ্রেণীভুক্তি বিশেষ সমস্যার ব্যাপার হয় না। শুধু একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার, ছোটগল্প বলেই চরিত্রকে সামগ্রিক ভাবে দেখবার সুযোগ সেখানে থাকে না, চরিত্রের একটি বিশেষ প্রবণতাই তুলে ধরেন ছোটগল্পকার। অথবা এমনও হতে পারে যে একটি বিশেষ প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য বা উৎকেন্দ্রিকতাযুক্ত চরিত্রই লেখক নির্বাচন করেন। 'রামকানাইয়ের 'নিবুদ্ধিতা' গল্পে রামকানাইয়ের নিপাট সারল্য ছোটগল্পের বিষয় করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'আলোবাবু' গল্পে পশুপ্রীতির

আন্তরিক ও গভীর উৎসাহসম্পন্ন মানুষকে ধরেছেন বনফুল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় অর্ধেক গল্প চরিত্রপ্রধান। রূপোকাকার মতো সরল মানুষ, হাজুর মতো মেয়ে, যাত্রাজগতের মানুষ, এই রকম অনেক চরিত্রই তাঁর গল্পের প্রধান অবলম্বন হয়েছে।

প্রতীতিমুখ্য গল্পে শেষ পর্যন্ত একটি প্রতীতি বা Impression বড় হয়ে ওঠে। গল্পে চরিত্র ও ঘটনাকে অতিক্রম করে যদি সেই ধারণাটিই মনে গেঁথে যায়, বলা যাবে গল্পটি এই শ্রেণীর। এই বিচার অনেক সময় জটিল হতে পারে, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পে এমন মনে হওয়া সম্ভব যে ফটিকই সেখানে মুখ্য অবলম্বন। সত্যিই যে তাই, একথা ঠিক হলেও গল্পের শেষে কিন্তু এমন একটা প্রতীতিই বড় হয়ে ওঠে যে নিজের পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে মানুষের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে—সে মানসিক শান্তি তো পায়ই না, চূড়ান্ত পরিণতিও ঘটে যেতে পারে। প্রতীতিমূলক গল্পই আধুনিক সাহিত্যে বেশি লেখা হয়। তারাশঙ্করের 'চোখের ভুল', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুচ্ছ', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'টিকিট', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রেকর্ড', বিমল করের 'নিষাদ', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশ্বমেধের ঘোড়া', আবুল বাশারের 'তেলেগ দাসরি' প্রভৃতি এই শ্রেণীর গল্পের উদাহরণ।

ছ. ছোটগল্পের বৃত্তগঠন

উপন্যাস রচনায় Plot Construction বা বৃত্তগঠনের যেমন ভূমিকা আছে, ছোটগল্পেরও সুচিন্তিত বৃত্তগঠন অপরিহার্য—এর গুরুত্ব অন্তত উপন্যাসের বৃত্তগঠনের চেয়ে কম নয়। কারণ একটি প্রতীতি যেহেতু ছোটগল্পকারের প্রধান অবলম্বন, সেই প্রতীতির প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁকে বৃত্ত গঠন করতে হয়। এই জন্যই করতে হয় যে উপন্যাসের মতো অপচয়ের বিলাসিতা করবার উপায় তাঁর নেই, একেবারে প্রথম বাক্য থেকেই তাঁকে নিশ্চিত লক্ষ্যে এগুতে হবে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে এড্‌গার অ্যালান পো-র সেই কথা—"If his very initial sentence tend not to the outbringing of this effect, then he has failed in his first step."

তবে উপন্যাসের প্রথাগত বৃত্তগঠনে আমরা কাহিনী ও উপকাহিনীর বিন্যাস হিসাবে যেমন সরল, জটিল ও যৌগিক বৃত্তের নির্মিতি পাই, ছোটগল্পের বৃত্ত-গঠনে তা পাওয়া যায় না, কারণ কাহিনীর জটিলতা অপেক্ষা তার উপস্থাপনের সমস্যাই এখানে প্রধান। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের গঠন ও বিন্যাস বিশ্লেষণ

করে সমালোচকগণ মোটামুটি ভাবে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ছোট গল্পের বৃত্ত গঠন সাধারণত তিন রকমের হয়ে থাকে—

(ক) Stiair-Step Construction বা সোপানারোহ গঠন

(খ) Rocket Construction বা চকিতোন্নত গঠন এবং

(গ) Circular Construction বা ঘূর্ণরেখ গঠন।

সোপানারোহ গঠন বলতে বোঝায় ঘটনাক্রমের উন্নতি, চূড়ান্ত পর্যায়ে তার আরোহন এবং দ্রুত অবনমন। নাটকের প্রথাগত পিরামিড-আকৃতির পঞ্চাংক গঠনের সঙ্গে এর পার্থক্য, ঘটনাগুলি ক্রমশ একটি তুঙ্গ অবস্থা বা Crisis-এ পেঁছয়, কিন্তু তার পরই দ্রুত সমাপ্তি ঘনিয়ে আসে। এর সঙ্গে চকিতোন্নত গঠনের পার্থক্য এই যে এই ধরনের বৃত্তে প্রায় প্রথমেই Crisis দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ ঘটনা তুঙ্গে পেঁছয় প্রথমেই, এরপর লেখক সুকৌশলে ধীরে ধীরে কাহিনীকে রসসিদ্ধ পরিণতি দেবার চেষ্টা করেন। তৃতীয় যে বৃত্তগঠনকে বলা হয়েছে ঘূর্ণরেখ সেখানে বর্তমান কাহিনীকে উপলক্ষ করে একটি ঘূর্ণায়মান অতীত কাহিনী থাকে। দুটি কাহিনীই বৃত্তাকারে বেষ্টন করে থাকে একে অপরকে, অথচ তারা প্রত্যেকেই থাকে গতিশীল।

উদাহরণ ব্যতীত এই তিন রকম বৃত্তগঠনের পার্থক্য সঠিক ভাবে বোঝা শক্ত হতে পারে। তবে তার আগে বলা দরকার, গল্প বলার কৌশলকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—ঘটনাশ্রয়ী সূচনা এবং বর্ণনাশ্রয়ী সূচনা। একটি প্রারম্ভিক ঘটনা বা Initial incident দিয়ে গল্পের সূচনা হতে পারে, অথবা কোন মন্তব্য বা সঠিক পরিস্থিতি অর্থাৎ Preliminary Situation দিয়েও সূচনা হতে পারে গল্পের। এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, এক বিশেষ ধরনের বৃত্তগঠন গল্প বলার বিশেষ এক কৌশল অবলম্বন করে। অর্থাৎ ঘটনাশ্রয়ী সূচনা হলেই যে তার বৃত্ত হবে চকিতোন্নত এবং বর্ণনাশ্রয়ী সূচনা হলেই সোপানারোহ বৃত্ত নির্মাণ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প থেকে উদাহরণ সন্ধান করলে বলা যায়, 'কাবুলিওয়ালা' এবং 'পোষ্টমাষ্টার',—দুটি ছোটগল্পেরই বৃত্তগঠন করা হয়েছে সোপানারোহ পদ্ধতিতে, কিন্তু 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের সূচনাতেই আমরা একটি ঘটনা পাই অর্থাৎ মিনির সঙ্গে কাবুলিওয়ালার সাক্ষাতের ঘটনা যা শেষপর্যন্ত একটি আলোড়ক পরিসমাপ্তিতে উপনীত হয়েছে। পক্ষান্তরে 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পে শহরের মানুষ গ্রামে আসার দুঃসহ পরিস্থিতিই বর্ণনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথেরই আর দুটি ছোটগল্পের কথা এখানে স্মরণ করতে পারি—'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' এবং 'শাস্তি'। দুটি ছোটগল্পেরই বৃত্ত চকিতোন্নত গঠনের উদাহরণ, অথচ প্রথম গল্পটির সূচনা যখন স্পষ্টত ঘটনাশ্রয়ী, দ্বিতীয় গল্পটি তখন পরিস্থিতি বর্ণনার পরই একটি Crisis তৈরী করেছে। ঘূর্ণরেখ বৃত্ত গঠিত হয় সাধারণত একটি ঘটনাকে আশ্রয় করেই, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' বা 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

জ. ছোটগল্পের ভাষারীতি

ছোটগল্পের প্রধান গুণ সংযম, একথা বার বার বলা হয়েছে, সুতরাং ভাষার আলোচনায় সেই কথাটিই পুনর্বার স্মরণ রাখা প্রয়োজন। গল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী ভাষারীতির পরিবর্তন ঘটবে, এটাই প্রত্যাশিত। উপন্যাসের আলোচনায় আমরা যা বলেছিলাম, এখানেও ভাষারীতির সেই বিভাগগুলিরই উল্লেখ করতে পারি—Narrative বা বর্ণনাত্মক রীতি, Dramatic বা নাটকীয় রীতি এবং Lyrical বা কাব্যিক রীতি। ছোটগল্পের বিষয় এবং প্রতীতি অনুযায়ী তার রীতির পরিবর্তন ঘটে, অনেক সময় একই লেখক গল্পের মেজাজ অনুযায়ী তাঁর ভাষারীতি পালটে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ দিয়েই বলা যায়, প্রথম দিকের গল্প 'দেনাপাওনা' বা 'পোস্টমাস্টার'-এ তিনি যে বর্ণনাত্মক রীতি ব্যবহার করেছেন, পরে তা পরিবর্তিত হয়েছে। 'একরাত্রি' কিম্বা 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের ভাষারীতি রীতিমত কাব্যিক; অথচ শেষ পর্যায়ের গল্পে, ধরা যাক 'ল্যাবরেটরি', তিনি ব্যবহার করেছেন নাটকীয় রীতি।

অবশ্য এমনও হতে পারে, কোন কোন ছোটগল্পকার তাঁদের বিশেষ মানস-গঠনের জন্য একটি বিশেষ রীতি বেছে নেন। যেমন জগদীশ গুপ্ত এ কথা বিশ্বাস করেন যে জীবনে নাটক খুবই অল্প, তাই চমকিত ঘটনা থাকলেও তার তিনি বিবরণ দেন একেবারেই অনুত্তেজক ভাষায়। তাই তাঁর বেশির ভাগ গল্পেই ভাষারীতি বর্ণনাত্মক। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে 'তাঁর সবার শেষে গয়া' ছোটগল্প থেকে—

"গয়ামণি ও রামের পুত্র লব যখন মাত্র তিন বৎসরের শিশু তখন লবের বাবা রাম মারা গেল। রাম ছিল দিন-মজুর। মজুরের কাজে খাটিতে খাইয়া রাম একদিন উঠিয়া গেল সুউচ্চ এক আমবৃক্ষে, তাহার শাখা ছেদন করিতে।"

কাব্যিক রীতি অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় গল্পেরই স্বার্থে, যদিও এক-একটি পর্বে এক-এক ভাষারীতি প্রধান ভাবে আশ্রয় করেছেন এমন লেখকও আছেন। তারাশঙ্কর প্রথম পর্বে সাধারণত কাব্যিক রীতিই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু পরবর্তী কালেও তা ব্যবহার করেছেন কখনো সখনো; তাঁর 'কান্না' ছোটগল্পটি কাব্যিক রীতির একটি সার্থক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' থেকে এই ভাষারীতির দৃষ্টান্ত সন্ধান করছি, কারণ এই প্রলোভন সামলানো খুব কঠিন :

"হঠাৎ গুমট ভাঙিয়া হু হু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মতো কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্তে একসঙ্গে মর্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল।...যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কাষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না।

বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।"

নাটকীয় রীতির উদাহরণও রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প থেকেই নেওয়া যাক। আমরা 'বদনাম' গল্পের সূচনা স্মরণ করতে পারি—

"ক্রিং ক্রিং ক্রিং সাইকেলের আওয়াজ; সদর দরজার কাছে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন ইন্সপেক্টার বিজয় বাবু। গায়ে ছাঁটা কোর্তা, কোমরে কোমর-বন্ধ, হাফপ্যান্ট-পরা, চলনে কেজো লোকের দাপট। দরজার কড়া নাড়া দিতেই গিন্নী এসে খুলে দিলেন। ইন্সপেক্টার ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ঝংকার দিয়ে উঠলেন—'এমন করে তো আর পারিনে, রাত্তিরের পর রাত্তির খাবার আগলে রাখি, তুমি কত চোর ডাকাত ধরলে, সাধু সজ্জনও বাদ গেল না, আর একটা লোক অনিল মিত্তিরের পিছন পিছন তাড়া করে বেড়াচ্ছ, সে থেকে থেকে তোমার সামনে এসে নাকের উপর বুড়ো আঙুল নাড়া দিয়ে কোথায় দৌড় মারে তার ঠিকানা নেই।"

● ছোটগল্পের সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা

বর্তমানে ছোটগল্প সবচেয়ে সজীব শাখা। সেই কারণে ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নিয়েই বোধহয় সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। এর মধ্যে আঙ্গিক পরীক্ষাও যেমন আছে, তেমনি আছে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা। একেবারে রিপোর্টের মতো করে গল্প লেখা, যেমন জগদীশ গুপ্ত তাঁর 'যথাক্রমে' উপন্যাসে করেছেন, আমরা লক্ষ্য করেছি কারো কারো লেখায়। ছোটগল্পকে উপন্যাসের মতো বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করেছেন কোন কোন লেখক—এই মুহূর্তে আবুল বাশারের 'ভোর-পোয়াতী তারা' গল্পের কথা মনে পড়ছে। সতীনাথ ভাদুড়ি চিন্তার ভাষা হিসাবে ভাষার এক রকম পরীক্ষা করেছিলেন। এই সময়ে এরকম চিন্তাও কারো কারো মাথায় আছে—ফলে ঘটমান বাস্তব এবং চিন্তার জগতের সত্যের মধ্যে ভাষাগত একটা বৈপরীত্য সৃষ্টির কথা তাঁরা ভাবছেন।

গল্পের বিষয়হীনতা বা না-গল্প নিয়ে বর্তমানে কেউ কেউ খুবই চিন্তিত। এটাকে চিন্তার বিষয় বলে আমরা মনে করি না। গল্পের আকর্ষণ চিরকালই বজায় থাকবে—আজও আছে, পরেও থাকবে, তাই না-গল্পের সময়েও গল্প বলা ছোটগল্পের সৃষ্টি ব্যাহত হবে না। কিন্তু পাঠক হিসাবে যতোই পরিণতি আসবে আমাদের, ততোই আমরা ছোটগল্পের মধ্যে খুঁজতে চাইবো তার স্রষ্টাকে। তাঁকে সঠিকভাবে অনুভব করার আনন্দ কিন্তু গল্পপাঠের আনন্দের চেয়ে কম নয়। কাজেই এমন হতে পারে, ছোটগল্প এতে কবিতার কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে, কিম্বা একাঙ্ক নাটকের যা গতিপ্রকৃতি তাতে ছোটগল্প ও একাঙ্ক নাটকও তাদের আস্বাদে কাছাকাছি এসে দাঁড়াতে পারে—কিন্তু পরিণত-মনস্ক পাঠকের কাছে ছোটগল্প এর পরেও ক্রমশই আরো বেশি আকর্ষণীয় হতে থাকবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ক. সাহিত্যিক মতবাদ ও সাহিত্যে তার প্রভাব—সাহিত্যসৃষ্টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কিনা—সাহিত্য, শিল্পী ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক—সাহিত্যিক আন্দোলন কাকে বলে ও তার উদ্ভবের কারণ। খ. মিস্টিসিজ্‌ম্‌-এর সংজ্ঞা—মিস্টিসিজমের দার্শনিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা—মিস্টিসিজম প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা—ইংরেজি কবিতায় মিস্টিসিজম—বাংলা মিস্টিক কবিতা—মিস্টিসিজমের গভীর রহস্য। গ. ক্লাসিসিজম ও রোম্যান্টিসিজম—প্রাচীন ক্লাসিসিজম—নব্য ক্লাসিক যুগ—ক্লাসিক সাহিত্যের লক্ষণ—রোম্যান্টিসিজমের উদ্ভব ও তার বৈশিষ্ট্য—দার্শনিক জগতে উদ্ভূত রোম্যান্টিসিজমের স্বরূপ—রুশোর সমাজবাদ ও কান্টের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ—রোম্যান্টিকতার সংজ্ঞা—রোম্যান্টিকতার লক্ষণ—ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা—ইংরেজি সাহিত্যের দৃষ্টান্ত—উভয় দৃষ্টিভঙ্গি একে অপরের পরিপূরক—বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক যুগের বিস্তৃত পরিচয়। ঘ. রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজম—বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের স্বরূপ—দার্শনিক আন্দোলন হিসাবে আগে এর উদ্ভব—বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের উদ্ভব—দ্রুত এই আন্দোলনপুষ্ট সাহিত্যের বিস্তার—বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের লক্ষণ—ন্যাচারালিজম : এই আন্দোলনের স্বরূপ—এর কিছু সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত। ঙ. সিম্বলিজম বা প্রতীকীবাদ—প্রতীকের সাধারণ ব্যবহার ও প্রতীকীবাদ—বাংলা সাহিত্যে এর প্রভাব। চ সুর-রিয়ালিজম : এর উদ্ভব ও প্রকৃতিবিচার—বাংলা সাহিত্যে এই আন্দোলনের সমধর্মী কবিতা। ছ. অন্যান্য কিছু সাহিত্যিক মতবাদ।

ক. সাহিত্যিক মতবাদ ও সাহিত্যে তার প্রভাব

খুব সাধারণভাবে দেখতে গেলে মনে হতে পারে সাহিত্যসৃষ্টি নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়াস, সুতরাং সামাজিক ও গোষ্ঠীগত পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্টির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তা নয়, যদি তা হতো তবে সাহিত্যের কোন ইতিহাস থাকতো না, কারণ প্রত্যেক শিল্পীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন মানস-প্রবণতা নিয়ে কোন ইতিহাস রচনা করা যায় না। অথচ সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেন তাঁরা বিশেষ সময়ের কিছু বিশেষ প্রবণতা কিন্তু পেয়ে যান, বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। এই জন্যই অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্রের মতো কবিকে মঙ্গলকাব্য রচনা করতে হয়, এ যুগে কোন কবিই পুরনো আখ্যানধারায় একটি মঙ্গলকাব্য রচনা করতে বসেন না। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে ও পরে বৈষ্ণব পদাবলীর স্বাদ আমূল বদলে যায়—এবং সেটা কিন্তু কোন পর্বেই সমর্থ কবির একান্ত অভাবের জন্য নয়। একটা সময় হঠাৎ দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে কৃত্রিম মহাকাব্য লেখার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিল, আবার যখন তা মিলিয়ে গেল তখন কেবল রবীন্দ্রনাথেরই যে 'কল্পনাটি গেল ফাটি হাজার গীতে' তা নয়, হাজার গীত সৃষ্টিরই প্রবণতা দেখা দিল রবীন্দ্রনাথের

চেয়ে অনেক অল্পক্ষম কবিদের কাব্যপ্রয়াসেও। সুতরাং ব্যক্তিগত অভিরুচি স্বীকার করলেও যুগের অভিরুচি বলে একটা ব্যাপার থেকে যায়।

তা থাকে বলেই এ কথাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে শিল্পী, সমাজ এবং শিল্প—এখানে ধরা যাক সাহিত্য-শিল্প, পরস্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্ক যুক্ত। সমাজ এবং সাহিত্য, এদের কে কাকে প্রভাবিত করে, কার অধিকার বেশি, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ না হলে সাহিত্যিকের কর্তব্যচ্যুতি ঘটে কিনা, সাহিত্যকে স্বাধীন বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত কিনা—এসব প্রশ্ন এখানে উত্থাপনের প্রয়োজন নেই, কারণ এসব নিয়ে দ্বন্দ্ব-বিসংবাদ দীর্ঘকালের এবং তার সুষ্ঠু মীমাংসা আজও হয়নি। তবু এই দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ মতামতের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা হল কারণেই যে এসব দ্বন্দ্বের নিরসন করতেই বেশ কিছু সাহিত্যিক মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে।

জটিল আলোচনায় আমরা প্রবেশ করবো না অথবা মনস্তাত্ত্বিক ইয়ুং-এর মতো এমন প্রশ্নও তুলবো না গ্যেটে-ই 'ফাউস্ট'-ই রচনা করেছেন, অথবা 'ফাউস্ট'-ই গ্যেটে-কে। তবু এই কথাটা শুধু স্বীকার করে নেবো যে-পারস্পরিক সম্পর্ক একটা আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক, কারণ মানুষের ব্যক্তিগত রুচি তার সাহিত্যসৃষ্টির নিয়ামক হতে পারে, কিন্তু যে-কোন শিল্পের মতোই সাহিত্যও তার সমাজবদ্ধ জীবনেরই দান—মানুষ আগে সামাজিক হয়েছে, তবে এসেছে তার শিল্প। যুক্তির খাতিরে সমাজকে শিল্পের আগে স্থান দিলেও, এ কথা আমাদের মানতেই হবে যে শিল্পও সমাজকে অনেক কিছু দেয়। সাহিত্য সমাজের দর্পণ, এই রকম একটা কথা দীর্ঘদিন প্রচলিত আছে; আমরা মনে করি কথাটা মোটেই সত্য নয়, অথবা এই উক্তি অত্যন্ত একদেশদর্শী। সাহিত্য যদি একটা শিল্প হয় তবে শিল্পী বা স্রষ্টার ভূমিকা সেখানে খুব বড়ো হয়েই দাঁড়ায়। সমাজজীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাই শিল্পীকে সাহিত্যকর্মে উৎসাহী করে, এ কথা ঠিক, কিন্তু তাকে নিজের মতো করে গ্রহণ করেন সাহিত্যিক, ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ হতে পারে, নাও পারে। তিনি যে জগতের ছবি আঁকেন তা তাঁর জ্ঞান ও বিশ্বাস মতো সত্যিকারের জগতের ছবি। এ ছবি আজকের সমাজে হয়তো দেখা যাবে না, কিন্তু আগামী দিনে এ ছবি সত্যই হয়ে উঠবে। তাই শিল্পীও সমাজকে অনেক কিছু দান করেন, সমাজও এতে উপকৃত হয়।

সমাজের বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং যুগরুচি সাহিত্যকে কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত তো করেই, কিন্তু বিভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলনও সাহিত্যকে বিশেষ এক ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন করে তুলতে সাহায্য করে। এইসব আন্দোলন বেশির ক্ষেত্রে অবশ্য জন্ম নেয় দার্শনিক পরিমণ্ডলে, পরে তা সাহিত্যক আন্দোলনে রূপান্তর লাভ করে। এই রকম বহুতর জটিল আন্দোলনকে সরলীকৃত করলে বলতে হবে, একদিকে যেমন ভাববাদ ও বস্তুবাদই বিভিন্ন ভাবে তীব্রতা ও রূপ বদল করে আন্দোলনকে পরিচালিত করেছে, অন্যদিকে ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক চেতনাই বিভিন্ন

আন্দোলনে পরস্পরকে প্রতিস্থাপিত করেছে। এই ক্ল্যাসিক ও রোম্যান্টিক মনোভাবই সাধারণত সাহিত্যের আঙ্গিকের লক্ষণীয় পরিবর্তনগুলি নিয়ে আসে। অবশ্য এক কথায় এদের প্রকৃতি বোঝানো খুবই দুরূহ, এবং সেই একইভাবে ভাববাদ ও বস্তুবাদেরও। ভাববাদের মধ্যেই অনেক রকমের বিভাগ, বস্তুবাদের মধ্যেও তাই। এইসব সূক্ষ্ম পার্থক্য কোন বিশেষ সাহিত্যিক আন্দোলন সম্বন্ধে অবহিত হতে গেলে জানতে হতে পারে। এখনই সে বিষয়ে পর্যালোচনার আবশ্যক নেই। আমরা কয়েকটি প্রধান সাহিত্যিক আন্দোলনজাত মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি। প্রথমে অবশ্য যেটি আমাদের আলোচনার বিষয় হবে—মিস্টিসিজম বা মরমীয়াবাদ, তার সঙ্গে সাহিত্যিক আন্দোলনের কোন সম্বন্ধ নেই, সম্ভবত সাহিত্যেরও নয়, কারণ বলা হয়েছে The poet is not a mystic, কিন্তু যেহেতু মধ্যযুগীয় সাহিত্যে মরমীয়াবাদের প্রকাশ খুব বেশি, এ বিষয়ে আমাদের কিছু জানতেই হবে।

খ. মিষ্টিসিজম্

মিস্টিসিজম বা মরমীয়াবাদকে কোনও বিশেষ মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না; জীবন ও জগৎ, জীবনাতীত ও জগতাতীতকে দেখবার এবং বুঝবার জন্য এটিকে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বলাই ভালো। শ্রীশচন্দ্র দাশের মন্তব্য অনুসরণ করে আমরা এইভাবে এর সংজ্ঞা দিতে পারি—যে অখণ্ড দৃষ্টি ও গভীর অনুভূতির সাহায্যে কবি ভগবৎ সত্তা এবং বিশ্বসৃষ্টির পরম সত্যকে উপলব্ধি করে তার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন হবার বোধ ও আনন্দ লাভ করতে পারেন, সাহিত্যে সেই বোধি-দৃষ্টি-সাধনাকে আমরা মিস্টিসিজম নামে অভিহিত করতে পারি।

এই মনোভাব কোন বিশেষ সময়ের নয় বলেই একে বিশেষ মতবাদ হিসাবে উল্লেখ করতে পারি না, অথচ সাহিত্য-সাধনায় এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা বার বার পাই এবং এর প্রেরণায় রচিত সাহিত্য অনেক সময়ই পরম আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের মধ্যযুগীয় বাউল ও সুফী সাধনা যেমন সাহিত্যে এই মনোভাবের পরিচয় রেখেছে, ইংরেজি কবিতায় উইলিয়াম ব্লেক থেকে শুরু করে ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থ পর্যন্ত এই দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক যুগের কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতায় মিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি, পেয়েছি অঁধার রাতে ॥'

এখানে যে অস্পষ্ট রহস্যময়তার পরিচয় আমরা পাই, সেই রহস্যময়তা প্রায় সর্বদাই জড়িয়ে থাকে মিস্টিসিজমের সঙ্গে—এর ভাবেও থাকে, ভাষাতেও থাকে। সেইজন্য কখনো কখনো এমন হতে পারে যে উপমা, প্রতীক ইত্যাদির ব্যবহার বেশি

থাকলেই আমরা মনে করতে পারি কবি এই দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। অথবা ভাষায় আলো-আঁধারির সৃষ্টি করলেই মনে হতে পারে তা মরমীয়া কবির সৃষ্টি। কিন্তু বস্তুত তা নয়, তা যদি হতো তবে চর্যাপদের কবিকেও মিস্টিক বলতে হতো।

মিস্টিক চেতনা বলতে দার্শনিক ও ধর্মীয় চেতনার এক সমন্বয় বোঝায়। এই চেতনাসম্পন্ন মানুষের অন্তরে থাকে উজ্জ্বল এক বোধি বা Intution, এবং সেই বোধির আলোকেই তিনি পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সংসারের গভীরে একটি স্বতন্ত্র সত্তার পরিচয় সন্ধান করতে পারেন। এই পরিচয় বুদ্ধিতে, প্রজ্ঞায় বা তত্ত্বজ্ঞানে সম্ভব নয়, মরমী মনের কাছে ইঙ্গিতের মাধ্যমেই সে পরিচয় অস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। দার্শনিক প্লেটো বলেছিলেন ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টি একটি আইডিয়ামাত্র এবং সেটিই সত্য, দৃশ্যমান জগৎ তারই এক প্রতিভাস। মরমীয়া কবিরা সে কথা মনে করেন না, তাঁদের মতে বাইরের দৃশ্যমান জগৎ এবং জগতাতীত এক পরম সত্তা একই ঐক্যবন্ধনে বিধৃত হয়ে আছে—সেই রহস্যময় সূত্রটিই তাঁরা অনুসন্ধান করেন। যে বোধির দ্বারা সেটি আয়ত্তে আসে তাকে বোঝাও শক্ত, ঠিক মতো বোঝানোও শক্ত। তাই সাঙ্কেতিক ভাষায় বলতে হয়—

"আমার বাড়ির পাশে আরশিনগর
সেথায় এক পড়শী বসত করে
আমি নাম জানি না তার।"

বুদ্ধিবিচার দিয়ে এই অনুভূতি পাওয়া যায় না, কারণ জ্ঞানের সাহায্য নিতে গেলেই জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যে একটা বিভাজন-রেখা সৃষ্টি হয়। এ জিনিষ উজ্জ্বল আলোর মতো হঠাৎ এক-একজনকে উদ্ভাসিত করে। সেই কবি তখন—in the position of a man who, in a world of blindmen, has suddenly been granted sight, who gazing at the sunrise, overwhelmed by the glory of it, tries, however, faultingly, to convey to his fellows what he sees."

সেইজন্য অবস্থা কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না বলেই কবিকে বিশেষ রূপবন্ধ (Image), উপমা ও প্রতীকের সাহায্য নিয়ে রহস্যময় ভাষায় তাকে ধরবার চেষ্টা করতে হয়। এই কারণেই টেনিসনের মতো সরল চিন্তাধারার কবিকেও Sunset and the evening star'-এর সাহায্যে এই অসীম বিস্ময়কে প্রকাশ করতে হয়। শেলি প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেন বিচিত্রমধুর এক গম্বুজ—

"Life, like a dome of many-coloured glass
Stains the white radiance of eternity."

এই eternity-র সন্ধান পান বলেই শেলি লিখতে পারেন—

"And my spirit·······
Interpenetrated lie
By the glory of the sky;
Be it love, light, harmony,
Odour, or the soul of all
Which from Heaven like dew doth fall,
Or the mind which feeds this verse
Peopling the love universe."

মিস্টিক অনুভূতির জন্যই ইংরেজি সাহিত্যে রোম্যান্টিক যুগের অগ্রদূত ওয়র্ডসওয়র্থ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন—

"A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things."

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের কিছু বাউলসংগীতেও মিস্টিক চেতনা আমরা খুঁজে পাই, যেমন—

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি
দিতাম তাহার পায়।"

অক্ষয়কুমার দত্ত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থে দেহতত্ত্ববিদ বাউল কবির যে সংগীত উদ্ধৃত করেছেন তাতে তাঁকেও মরমীয়া কবিই বলতে হবে—

"দেল দরিয়া খবর কররে মন।
তোর কোথা বৃন্দাবন, কোথা নিধুবন, কোথায় রে তোর গুরুর আসন।
যদি পদ্মা পাড়ি দিবি, তবে ঢাকা দেখতে পাবি
মুখসুধাবাদ করবে অন্বেষণ।
আছে কলিতে কলিকাতা, তিন শহরে আটা,
সাঁতার দে যায় রসিক যে জন।"

যে ভাবসমৃদ্ধ প্রেমদৃষ্টি ছিল বলে ইংরেজ কবি প্রেমিকার স্তব করতে গিয়ে তাকে একই সঙ্গে বলেন 'গৃহিণী, ভগিনী এবং দেবী,' চণ্ডীদাস যে দিব্যদৃষ্টি দিয়ে বলতে পারেন—

"তুমি রজকিনী আমার ঘরণী
তুমি হও মাতৃপিতৃ।

ত্রিসন্ধ্যা যাজন তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী ॥"

সেই দৃষ্টিভঙ্গিই বোধের উচ্চতম শিখরে পৌঁছলে রবীন্দ্রনাথের মত বলা যায়—

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিনী।
অন্তরমাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়-বৃন্ত-শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত-গগনে,
চারিদিকে চির-যামিনী ॥"

মিস্টিসিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে যে কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সেটি উল্লেখ করা দরকার। অধ্যাত্মবোধ, বিশ্ববিধান, রহস্যময়তা ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণায় মনে হতে পারে যে ধর্মীয় বা দেবদেবীর স্তুতিমূলক সাহিত্য ছাড়া অন্য কোথাও বোধ হয় মিস্টিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ কথা অবশ্য মিথ্যা নয়, যে মিস্টিসিজমের সঙ্গে ধর্মের একটা সম্পর্ক আছে; মধ্যযুগের ভারতীয় মিস্টিক সাধনা, পারস্যের আবু সঈদ, হাল্লাজ, হাফিজ, রুমি প্রভৃতি সুফী সাধকদের সাধনক্রমের কথা মনে করলেই এটি বোঝা যাবে। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্বদৃষ্টি বা প্রথানুসারী বিশ্বাস ছাড়াও, শুধু ঐশ্বরিক আকুলতাও মিস্টিক কবিতার বিষয় হতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথের—

"রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী ॥"

মিস্টিসিজম সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্র দাশ যা বলেছেন তা যতোটা অনুভবগম্য, ততোটা যুক্তিসাধ্য নয়, তাই তাঁর প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করবো— "Agnosticism বা অজ্ঞেয়তাবাদই বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার চরম মীমাংসা। পরমকে জানা ও পরম হওয়া বলিতে যাহা বুঝায় অর্থাৎ, জানা (Knowing) যখন হওয়ার (Becoming) সহিত অভিন্ন ও অচ্ছেদ্য হইয়া উঠে সেই ধ্যানদৃষ্টি-সম্ভূত চরমাবস্থার কথা বিজ্ঞান ভাবিতে পারে না। যোগী যাহা ধ্যানে, কবি যাহা নেশায় পাইয়া থাকেন, সেই অহং-বিলুপ্ত তন্ময়াবস্থা মিস্টিকের ব্যক্তিগত অনুভূতি। শ্রুতি যাহাকে পরাবিদ্যা বলে, ইহাও বোধ হয় তাহাই।"

গ. ক্ল্যাসিসিজম ও রোম্যান্টিসিজম

ক্ল্যাসিসিজম ও রোম্যান্টিসিজম—এই দুই মতবাদের প্রসঙ্গই সম্ভবত সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। ঠিক বিশেষ কোন সাহিত্যিক বা দার্শনিক আন্দোলনকে না বুঝিয়ে আমরা সাহিত্যসৃষ্টির দুই প্রধান দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বোঝাতেই শব্দ দুটি আমরা বেশি ব্যবহার করি। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গি কিছু বাহ্যিক সাধারণ লক্ষণ অঙ্গে ধারণ করেই প্রকাশিত হয়েছিল, সে কথা স্বীকার করে নেওয়া ভালো। সাধারণভাবে বিচার করলে বলা যায় বিভিন্ন সময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গিই একে অপরকে স্থানচ্যুত করেছে। যখন ক্ল্যাসিক মনোভাব সজীবতা হারিয়ে রীতিসর্বস্ব হয়ে উঠেছে তখন রোম্যান্টিক সাহিত্য তাকে সরিয়ে দিয়েছে, আবার যখন রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্রাহীন হয়ে পড়েছে তখন ক্ল্যাসিক মনোভাবই ফিরে এসেছে আবার। অবশ্য এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যেমন একটা বড়ো রকমের পার্থক্য রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন সময়ের ক্ল্যাসিক বা রোম্যান্টিক মনোভাবের মধ্যেও পার্থক্য আছে। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের ক্ল্যাসিসিজম এবং অষ্টাদশ শতকের নিওক্ল্যাসিসিজম বা নব্য-ক্লাসিক মনোভাব নিশ্চয়ই এক রকম নয়। এই দুই মনোভাবের পার্থক্য, তাদের তুলনা এবং আপাত বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য কিছু আছে কিনা সেসব আলোচনার আগে এই দুই মনোভাবের প্রকৃতি এবং বিভিন্ন সময়ে তার পরিবর্তন বিষয়ে পৃথকভাবে একটু আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

● ক্ল্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন

ক্ল্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই অনেক প্রাচীন এবং ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টি বলতে আমরা গ্রীক ক্ল্যাসিসিজমকেই বুঝিয়ে থাকি। এ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স গ্রন্থে ক্ল্যাসিসিজমের লক্ষণ হিসাবে যে পরিমিতিবোধের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, গ্রীক ক্ল্যাসিসিজমের মূল কথা সেটিকেই বলা যেতে পারে। পরিমিতিবোধ ছাড়াও প্রাচীন ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যে আমরা আরো দুটি লক্ষণ দেখতে পাই, তারা হল যে কোন রকমের অসম্ভাব্যতা (Improbability) বর্জন এবং কল্পনার মধ্যেও একটা সংগতি রক্ষা। অধ্যাপক অ্যাবারক্রম্বি এটাকেই ক্ল্যাসিক সাহিত্যের লক্ষণ বলে মেনে নিয়েছেন—"There are elements which can join together in a concord of equilibrium; and such a health is classicism."

প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্য এই লক্ষণগুলি আশ্রয় করলেও বিষয় হিসাবে তার প্রধান অবলম্বন ছিল মানুষ, একেবারেই পার্থিব মানুষ—তার পুরুষকার, বলিষ্ঠ উদ্যোগ এবং চরিত্রের উৎকর্ষ।

ইংরেজি সাহিত্যে যাকে আমরা নব্যক্লাসিক যুগ বা Neoclássic age হিসাবে

জানি সেখানে কিন্তু মানুষের প্রতি এই উৎসাহেই ভাটা পড়েছিল। এই যুগটির স্থায়িত্ব অনেক বেশি, রেস্টোরেশনের (১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ) পর থেকে প্রায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এর স্থিতিকাল, যদিও একে আমরা অষ্টাদশ শতকের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বলেই মনে করি। এই যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কবি-প্রাবন্ধিক বলা যায় ড্রাইডেন, পোপ, অ্যাডিসন, সুইফ্‌ট্‌, জনসন, গোল্ডস্‌মিথ, এডমণ্ড বার্ক প্রভৃতিকে।

এই যুগে ক্ল্যাসিকতার যে লক্ষণ দেখা দিল তা সূত্রাকারে এইভাবে বলা যেতে পারে :

এক ॥ শুধু যুক্তি ও প্রথানুগত্য ছিল এঁদের আদর্শ। যে-কোন ব্যাপারেই আমূল পরিবর্তন তাঁরা সহ্য করতে পারতেন না। সাহিত্যসৃষ্টির যে-সব আদর্শ মহান সাহিত্যিকগণ তৈরি করে গেছেন তাদের প্রতি ক্ল্যাসিক সাহিত্যের আস্থা ছিল খুব বেশি।

দুই ॥ সাহিত্য এঁদের কাছে ছিল এক মহৎ শিল্পকলা। প্রতিভাকে তাঁরা অস্বীকার করতেন না, কিন্তু যে কোন শিল্পকলাই যেমন দীর্ঘদিনের সাধনা, শিক্ষা ও অভ্যাসের সামগ্রী, সাহিত্যও ঠিক তাই, এই ছিল তাঁদের ধারণা। সাহিত্য রচনার আদর্শ তাঁরা মনে করতেন হোরেসের 'আর্স পোয়েটিকাকে এবং সেখানে নির্ধারিত সাহিত্যসূত্র মেনে চলাই কর্তব্য, এ কথা তাঁরা ভাবতেন এবং বলতেন। অবশ্য যুগন্ধর প্রতিভাকে তাঁরা মেনে চলতেন, এই রকম প্রতিভা নিয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, কোন নিয়ম-কানুনই যে তাঁদের জন্য নয়, এ বিশ্বাস নিওক্ল্যাসিক কবিদের ছিল। কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তাঁদের নির্দেশ ছিল সাহিত্যের নিয়ম-শৃঙ্খলা না মেনে স্বেচ্ছাচারী কিছু সৃষ্টি করলেই তা সাহিত্য হয় না। তাঁরা সাহিত্যের বিষয়বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মনে করতেন তার প্রকাশভঙ্গি অর্থাৎ আঙ্গিক।

তিন ॥ সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য বা কলাকৈবল্যবাদ (Art for art's sake) নীতিতে এঁদের বিশ্বাস ছিল না। কোন এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত, অর্থাৎ Art with a purpose ছিল এঁদের আদর্শ এবং সে উদ্দেশ্য মানুষকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হওয়া উচিত, এটাও বেশির ভাগ ক্যাসিক বা ধ্রুপদী শিল্পী মনে করতেন।

চার ॥ ব্যক্তিচরিত্র অপেক্ষা শ্রেণীচরিত্র সৃষ্টিতে ক্ল্যাসিক সাহিত্যিকদের আকর্ষণ ছিল বেশি, অর্থাৎ ব্যক্তির এমন কিছু গুণের পরিস্ফুটন তাঁরা কাম্য বলে মনে করতেন যা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে, দেখলেই আমরা যাকে চিনে নিতে পারি। বিষয় এইরকম সাধারণই হবে, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গি হবে অনবদ্য, একেবারে মৌলিক এবং নিজস্ব—এই ছিল তাঁদের ধারণা। শেক্‌স্‌পীয়রকে তাঁরা এইজন্যই এতো পছন্দ করতেন যে তাঁর চরিত্রগুলি শ্রেণীগত হয়েও পৃথক, স্পষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত।

পাঁচ ।। নিওক্ল্যাসিক সাহিত্যিক এবং দার্শনিকগণ মনে করতেন উচ্ছৃঙ্খল কল্পনায় মানুষ যা নয় সেই রকম ক্ষমতাশালী বলে দম্ভ করে। এই দম্ভ ভুলে গিয়ে নিজের শক্তির সীমা সম্বন্ধে তার সচেতন থাকা উচিত। প্রকৃতি এবং মানবজগৎ একই নিয়মের বন্ধনে বাঁধা, সেই নিয়মশৃংখলাকে মেনে চলাই মানুষের উচিত। এই নিয়ম না মানলে কী হয়, কিছু ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তার পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন। মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে তাঁদের উচ্চ ধারণা থাকলেও তাঁরা নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন মূলত ব্যঙ্গাত্মক কমেডি, গদ্যধর্মী কবিতা এবং বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধে—শেষোক্ত শ্রেণীটি নিওক্ল্যাসিক কবিদের হাতেই সবচেয়ে সমৃদ্ধ।

● রোম্যান্টিসিজমের উদ্ভব ও তার বৈশিষ্ট্য

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নিওক্ল্যাসিক সাহিত্যিকগণ ফর্মসর্বস্বতা এবং রুচিবাদ (decorum) নিয়ে এমন প্রাণহীন সাহিত্যের দিকে ঝুঁকতে থাকেন যে এই জাতীয় সাহিত্যসৃষ্টির বিরুদ্ধে অসন্তোষ জমা হতে থাকে। আকাশের তারাগুলি ছড়ানো-ছেটানো কেন, তাদের সুসজ্জিত করা হয়নি কেন, পাহাড়গুলি এমন দৃশ্যকটুভাবে উঁচু নিচু কেন—ইত্যাকার আক্ষেপও আমাদের সহ্য করতে হয়েছে। এঁদের বিরুদ্ধে ক্ষীণ বিদ্রোহ জানাতে থাকেন গ্রে, ব্লেক, বার্নস প্রভৃতি কবি এবং তার ফলেই ইংরেজি সাহিত্যে রোম্যান্টিক যুগের সূত্রপাত ঘটে।

অনেকে মনে করেন ইংরেজি সাহিত্যে রোম্যান্টিক যুগের সূত্রপাত ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী-বিপ্লব থেকে, আবার মতান্তরে—এবং এই মতটিই বেশি গৃহীত হয়েছে, ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ এবং কোলরিজের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে Lyrical Ballads প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রোম্যান্টিক যুগের প্রবর্তন ঘটে। এঁদের প্রধান কথাই ছিল, সাহিত্যের অনুভূতি জন্ম নেয় হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়—সাহিত্যসৃষ্টি করতে হবে হৃদয় দিয়েই, বুদ্ধি দিয়ে নয়।

অবশ্য এইভাবে এক কথায় রোম্যান্টিকতার বা সাহিত্যে রোম্যান্টিক যুগের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। যথার্থ রোম্যান্টিক মানসিকতা বোঝানো আরো শক্ত। কারণ সাধারণভাবে আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা, তা যেমন করেই হোক তৈরি হয়েছে যে, রোম্যান্টিক বলতে বোঝায় জীবনবিমুখ এবং কল্পনাবিলাসী এক ধরনের রস সাধনা—কখনো তা ধ্রুপদী সংযমের বিরোধী, কখনো কল্পমায়ার অধ্যাত্মলীলা। এরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা যে তৈরি হয়েছে তা পাশ্চাত্য সমালোচকও জানেন, সেইজন্যই তিনি বলেন—

"One poet is romantic because *he falls is love,* another romantic because he *sees a ghost* ; another romantic because he *hears a cuckoo* ; another romantic because he is *reconclled to the church.*"

আসলে রোম্যান্টিকতা সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা আমাদের তৈরি হবার কারণ

হল রোম্যাণ্টিকতার এক ধরনের অতিরেক, ইংরেজিতে যাকে বলে Romantic extravagance ; এবং এই অতিরেকের আর একটি দিকই হল Romantic transcendentalism বা রোম্যাণ্টিক অতীন্দ্রিয়বাদ। বস্তুত, বিশুদ্ধ রোম্যাণ্টিকতার সঙ্গে জীবনবিমুখতার কোন সম্পর্ক নেই, থাকতেই পারে না। কারণ জীবনকে বলিষ্ঠ, সুন্দর এবং আরো সজীব প্রাণময়তা দেবার জন্যই তো ছটফট করেন রোম্যাণ্টিক শিল্পীরা।*

কারণ আমরা সাহিত্যিক মতবাদ হিসাবে যে সাহিত্যিক প্রতিক্রিয়ায় এর জন্ম তাই উল্লেখ করেছি, কিন্তু এর মূল আছে দার্শনিক জগতে। সেই দার্শনিক ভিত্তির পরিচয় দিলেই রোম্যাণ্টিসিজ্‌মের প্রাণশক্তির রহস্য বোঝা যাবে।

দার্শনিক জগতের দুটি বিশিষ্ট মতবাদ রোম্যাণ্টিসিজমের উদ্ভব সম্ভব করেছে— রুশোর বিদ্রোহমূলক জীবনসৃষ্টি এবং অন্যদিকে জার্মানীর দার্শনিক কাণ্ট ও হেগেল প্রবর্তিত Transcendentalism বা তুরীয়বাদ। এর সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের প্রবল অনুপ্রেরণা তো আছেই। রুশোর জীবনদর্শন আমরা পাই মূলত তাঁর The Social Contract গ্রন্থে, তবে Emile, New Heloise প্রভৃতি গ্রন্থেও তার সম্যক-পরিচয় পাওয়া যাবে। মানুষ হিসাবে মানুষের প্রকৃত মহত্ত্ব ও মর্যাদা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মনের অনিবার্য ও অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, প্রেমের সুতীব্র শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে রুশোর বিপ্লবাত্মক চিন্তা কেবল যে দার্শনিক জগতে আলোড়ন এনেছিল তাই নয়, তৎকালীন জনমানসেও তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অত্যন্ত তীব্র।

একই কথা বলা যায় জার্মানে উদ্ভূত দার্শনিক আন্দোলন সম্বন্ধে। বস্তু জগৎ যে অসম্পূর্ণ, কবির অনুভূতির দ্বারা সঞ্জীবিত না হলে যে তার অখণ্ড সৌন্দর্য

* এ বিষয়ে 'কবি নজরুল ও সঞ্চিতা' গ্রন্থে সকলিত আমার 'রোম্যাণ্টিক নজরুল : প্রেমের কবিতা' প্রবন্ধ থেকে সামান্য অংশ উদ্ধার করি :

"সুস্থ রোম্যাণ্টিকতা আসলে এক বিশেষ জীবনদৃষ্টি। সেখানে ব্যক্তিসত্তা অত্যন্ত প্রবল কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু, বাস্তবকে তা প্রত্যাখ্যান করে না—বাস্তবকে সহনীয়, মহৎ ও সুন্দর করে তোলার প্রত্যয়ী স্বপ্ন দেখে, জীবনকে আরো বরণীয় ও কাঙ্ক্ষিত করে তোলার সমূলক সম্ভাবনা চিন্তা করে।…রোম্যাণ্টিক কবিদের অগ্রগণ্য শেলি যখন গগনবিহারী স্কাইলার্ককে দেখে মুগ্ধ হন তখন তিনি মুক্ত জীবনের স্বপ্নসম্ভাবনার পুলকেই আবিষ্ট বোধ করেন…বাংলা কবিতায় রোম্যাণ্টিক ভাবনার অগ্রনায়কও বিপুল সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরি শুনেছেন, কিন্তু তা শুনেছেন 'রৌদ্রমাখানো অলস বেলায় তরুমর্মরে ছায়ার খেলায়' মত্ত হয়েই। 'মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই'—এই বেদনা আসলে 'বক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার' সে কথা চিন্তা করেই। মাটির পৃথিবী থেকে সৌন্দর্যের অধরা লোকে বিলুপ্ত হবার জন্য নয়, যথার্থ রোম্যাণ্টিকের সাধনা মাটির পৃথিবীতে সেই অধরা মাধুরী সৃষ্টি করবার,.. তা অনুভব করবার।"

ধরা পড়ে না সে কথা কাণ্টই প্রথম উপলব্ধি করেন ও সে মত প্রচার করেন। এর ফলে এমন এক উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় যা রুশোর মতের চেয়েও তীব্র। এর পরবর্তী দার্শনিক তত্ত্ব মন ও জড়ের অদ্বৈত সম্পর্কও সাধারণ মানুষকে আলোড়িত করে। অবশ্যই এর সঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব আছে এবং এই তিনটি ব্যাপার সাহিত্যে রোম্যাণ্টিক যুগের প্রতিষ্ঠায় বিপুলভাবে সাহায্য করেছে।

● রোম্যাণ্টিকতার সংজ্ঞা

রোম্যাণ্টিসিজমের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ যে কত কঠিন তা এর সুপ্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞা বিচার করলেই বোঝা যাবে। ওয়াটস্ ডানটনের মতে তা বিস্ময়-রসের পুনর্জীবন, ওয়াল্টার পেটারের মতে তা সুন্দরের সঙ্গে অদ্ভুত ব্যাপারের পরিণয় (strangeness added to beauty), ভিক্টর হুগোর মতে তা সাহিত্যের উদারপ্রাণতা, দার্শনিক ব্রুনেতিয়ের-এর মতে একে বলা যায় সাহিত্যে আত্মমুক্তি, আবার অনেক সমালোচক একে প্রকৃতির কাছে ফিরে যাওয়া বা প্রকৃতির রহস্য গভীরভাবে উপলব্ধি করা বুঝিয়েছেন। এর মধ্যে সমালোচক হারফোর্ড 'দি এজ অব ওয়র্ডস্ওয়র্থ'' গ্রন্থে এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন—'An extraordinary development of imaginative sensibility', তাকেই রোম্যাণ্টিকতার সবচেয়ে উপযোগী সংজ্ঞা বলে বিবেচনা করা যায়।

● রোম্যাণ্টিকতার লক্ষণ

এবার ক্ল্যাসিসিজমের মতোই রোম্যাণ্টিকতার লক্ষণগুলি আমরা সূত্রাকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করবো।

এক ॥ বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিতে প্রথানুগত্য স্বীকার না করে নতুন কিছু ভাববার চেষ্টা করা রোম্যাণ্টিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। অন্তত এই রকম একটি ঘোষণাপত্র বহন করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল প্রথম রোম্যাণ্টিক কাব্যসংকলন লিরিক্যাল ব্যালাডস্। তাতে অবশ্য এও বলা হয়েছিল যে এই কাব্য-আন্দোলনে কবিতা হবে সাধারণ মানুষের জন্য, সাধারণ মানুষের ভাষায়। বলা বাহুল্য ক্ল্যাসিক সাহিত্য ছিল অভিজাতদের জন্য, অভিজাত ভাষায়। এ ছাড়া দূর এবং অতীতের প্রতি আকর্ষণ এবং ভালবাসাও ছিল রোম্যাণ্টিক মানসিকতার বৈশিষ্ট্য। মনোভাবটি স্পষ্ট বোঝা যাবে শেলির কথা থেকে—

"I always seek in what I see,—the likeness of something beyond the present and tangible object."

দুই ।। রোম্যাণ্টিকতার প্রতিষ্ঠাতা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ধারণা ছিল, ভাল কবিতা মানেই হচ্ছে 'The spontaneous overflow of powerful feelings.' অর্থাৎ তীব্র অনুভূতির একেবারে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। অবশ্য সেই অনুভূতি টাটকা অবস্থায় প্রকাশ করতে গেলে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে, প্রশান্ত অবস্থায় তার স্মৃতিই কবিতা রচনার যোগ্য। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কবিতার জন্ম হবে, অথবা সাধনা, চেষ্টা ও পরিমার্জনার দ্বারা কৃত্রিমভাবে তা জন্মগ্রহণ করবে, এই ব্যাপারেই ক্ল্যাসিকের সঙ্গে রোম্যাণ্টিক দৃষ্টির একটি প্রধান পার্থক্য। কৃত্রিম ব্যাপারটাই রোম্যাণ্টিকদের পছন্দ নয়, কীট্‌স্‌ বলেছেন—"If poetry comes not as naturally as the leaves to a tree it had better not come at all."

তিন ।। প্রকৃতির প্রতি সমর্পিতপ্রাণ ভালবাসা রোম্যাণ্টিক কবিদের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এর আগে প্রকৃতির সঙ্গে কবিদের সম্পর্ক ছিল না এমন নয়, কিন্তু প্রকৃতির এমন বিমুগ্ধ বর্ণনা, প্রকৃতির সঙ্গে গভীর একাত্মতা আগে ছিল না বলেই এঁদের আর এক নাম ছিল 'নেচার পোয়েটস।' অবশ্য শুধু 'প্রকৃতির কবি' হিসাবে এঁদের চিহ্নিত করাটা ঠিক নয়, কারণ এঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃতিতেই নিজেদের সীমিত রাখেননি—মানবচরিত্র এবং মানবঅনুভূতির সঙ্গে এর অনিবার্য সম্বন্ধে উপনীত হয়েছেন। কারণ মানুষই যে তাঁদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, একথা রোম্যাণ্টিক কবিরা বলেছেন।

চার ।। ক্ল্যাসিক সাহিত্যের সঙ্গে রোম্যাণ্টিক সাহিত্যের আর একটি প্রধান পার্থক্য ক্ল্যাসিক সাহিত্য objective বা তন্ময়, রোম্যাণ্টিক সাহিত্য subjective বা মন্ময়। ক্ল্যাসিক কবি বিষয় হিসাবে বেছে নেন অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তি, রোম্যাণ্টিক কবির বর্ণনীয় বিষয় তিনি নিজেই—তাঁর আত্মভাবই ফুটে ওঠে নানা উপলক্ষের মধ্য দিয়ে। এ কথা শুধু রোম্যাণ্টিক কবিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, গদ্য সাহিত্যিকরাও এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই কারণেই আমরা পেয়েছি হ্যাজলিট এবং চার্লস্‌ ল্যাম্বের হাতে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ; ডি কুইন্সির 'Confessions of an English Opium Eater'-এর মতো অধ্যাত্মরসের বুদ্ধিদীপ্ত আত্মজীবনী; কোলরিজের 'Biographia Literaria-র মতো অসাধারণ গ্রন্থ। মোট কথা, রোম্যাণ্টিক কবি যখন আত্মস্থ ভঙ্গিতে সাহিত্য রচনা করেন তখন সামাজিক দায়দায়িত্বের কথা তাঁর স্মরণ থাকে না, তিনি তখন এক একক ব্যক্তিত্ব।

পাঁচ ।। সম্ভবত ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবেই প্রথম একটা মনোভাব রোম্যাণ্টিক কবিদের তৈরি হয়েছিল যে সর্বাত্মক একটা পরিবর্তন, বিশাল কাব্যাদর্শের বদল তাঁরা ঘটাতে পারবেন। একটি নবযুগ ঘোষণা করার গুরু দায়িত্ব রয়েছে তাঁদের ওপর। *মানুষের পরম মঙ্গল করার এক অসীম ক্ষমতা নিয়ে তাঁর জন্মগ্রহণ করেছেন, এই রকম এক আবেগ তাঁদের মধ্যে ছিল। মহতী প্রচেষ্টার ব্যর্থতাকেও তাঁরা মহৎ* মনে করেছেন। উচ্চাশার অতিরেককে যে ক্ল্যাসিকাল ট্র্যাজেডিতে একটি ত্রুটি বা

flaw হিসাবে ধরা হয়, সেটাও সেভাবে মেনে নিতে তাঁরা রাজি ছিলেন না। পুরনো দিনের রোম্যাণ্টিক কবিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরা অনেকেই দীর্ঘ কাব্য রচনার চেষ্টা করেছেন, যেমন—ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থের Prelude, শেলির Prometheus Unbound, কীটসের Hyperion, তাছাড়া বায়রণের বিখ্যাত Don Juan তো আছেই।

● ক্ল্যাসিকতা ও রোম্যান্টিকতার তুলনা

দৃশ্যত ক্ল্যাসিক ও রোম্যাণ্টিক কবিদের মধ্যে এক বিশাল পার্থক্য থাকলেও, একেবারে গভীরভাবে বিচার করলে কিন্তু সে পার্থক্য এতো বড় বলে মনে নাও হতে পারে। জীবনকে দেখবার ও বুঝবার এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আসলে পরস্পরের পরিপূরক। এ দুটির মধ্যে সম্পর্ক এতো নিবিড় যে একই কবির মধ্যে এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিরই সন্ধান পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কবি যখন ব্যক্তিকল্পনার উচ্ছ্বাসে পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করেন এবং বিরাট একটা কিছু সৃষ্টির মানসিক আনন্দে মেতে থাকেন তখন তাঁর মধ্যে রোম্যাণ্টিক দৃষ্টিরই প্রাধান্য ; কিন্তু সেই একই কবি যখন প্রকাশভঙ্গিতে সংযম নিয়ে আসেন, ভাবনাচিন্তাকে সংহত করার চেষ্টা করেন একটা নিয়মের মধ্যে, তখন তাঁর মধ্যে ক্ল্যাসিক মনোবৃত্তিরই প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। সমালোচক অ্যাবারক্রম্বি মনে করেন মনের যদৃচ্ছা কল্পনাচারিতা রোম্যাণ্টিক লক্ষণ, কিন্তু তাকে এইভাবে সমতা দেবার যে সুস্থতা, তারই নাম ক্ল্যাসিসিজম—"There are elements which can join together in a concord of equilibrium ; and such concord, such a health is classicism."

কাজেই কবির মানসিকতায় ক্ল্যাসিসিজম এবং রোম্যাণ্টিসিজম অনায়াসেই মিশে থাকতে পারে, আমাদের দেখতে হবে কল্পনার উদ্দামতা এবং আবেগের স্বতোৎসার সেখানে প্রবল অথবা প্রাধান্য পেয়েছে তার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ ও সংযমের বন্ধন। সেই অনুসারেই বলতে হবে কবির কাব্যে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেয়েছে। যেমন ধরা যাক, শেলির Ode to the West Wind কবিতা। এখানে যে রোম্যাণ্টিক কবিমানসই একচ্ছত্র প্রাধান্য পেয়েছে একথা অস্বীকারের কোন উপায় নেই। কিন্তু এরই সঙ্গে যদি তুলনা করি রোম্যাণ্টিক যুগের প্রবর্তক ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থের Laodamia কবিতার, তাহলে দেখবো সেখানে কিন্তু কল্পনার উচ্ছ্বাস অপেক্ষা সংযমের গভীরতা অনেক বেশি, সুতরাং তাকে ক্ল্যাসিকাল দৃষ্টি না বলে কোন উপায় নেই। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্ত ক্ল্যাসিক মনোভাবের কবি হিসাবেই খ্যাত। তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' আলংকারিক মহাকাব্য হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে, কিন্তু সেখানেও চতুর্থ সর্গে সীতা যখন তাঁর পঞ্চবটী বনে বাস করার মধুর স্মৃতি রোমন্থন করেন তখন তার মধ্যে রোম্যাণ্টিক ব্যঞ্জনাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই একই কবির 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের সমগ্র রচনা পরিকল্পনাটিই রোম্যাণ্টিক এবং 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের উপস্থাপনভঙ্গির মধ্যে কোথাও ক্ল্যাসিকতার লক্ষণই নেই।

কাজেই মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে রোম্যাণ্টিক এবং ক্ল্যাসিক মনোভাব থাকতেই পারে, সেটাকেই বরং সুস্থতার লক্ষণ বলে আমরা মনে করি। এ কথা বেশ স্পষ্ট করেই বলা যেতে পারে, রোম্যাণ্টিক মনোভাবের সঙ্গে বাস্তবতাবাদের পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু ক্ল্যাসিক মনোভাবের কোন অহি-নকুল সম্পর্ক নেই, বরং এরা একে অন্যের পরিপূরক ভাবাটাই সত্যবুদ্ধির পরিচায়ক।

● বাংলা সাহিত্যে ক্ল্যাসিক ও রোম্যান্টিক যুগ

প্রায় হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যকে যদি সামগ্রিকভাবে বিচার করা যায় এবং সাধারণভাবে কোন্ সময়ে কবিদের মধ্যে ক্ল্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কোন্ সময়ে রোম্যাণ্টিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় তবে একথা বলতেই হবে যে সুদীর্ঘ প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রায় সম্পূর্ণটাকেই রোম্যাণ্টিক যুগ আখ্যা দেওয়া উচিত। একথা অবশ্য ঠিক যে বিদ্যাপতির কাব্যে বা গোবিন্দদাসের কখনো কোন পংক্তিতে কিছুটা ক্ল্যাসিক সংযম ফুটে উঠলেও, সাধারণ ভাবে এই দীর্ঘ সময়কে আমরা রোম্যাণ্টিক যুগ হিসাবেই অভিহিত করতে পারি।

মধ্যযুগের একেবারে শেষ পর্বে ভারতচন্দ্রে এসে আমরা প্রথম দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন পাই। বিষয়ের মধ্যে গৌরবের বা আকর্ষণের কিছু খুঁজে পাননি ভারতচন্দ্র, কাজেই ভাষা এবং আঙ্গিকের প্রসাধনকলাতেই তাঁকে বেশি যত্নবান হতে হয়েছে, ফলে মধ্যযুগের এই Supereme literary craftsman-এর মধ্যে প্রথম আমরা পাই ক্ল্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গি। সেই অনুসারে ভারতচন্দ্রের সময়কে আমরা আখ্যা দিতে পারি বাংলা সাহিত্যের Neo-classic যুগ।

তবে বাংলার জলবায়ুর গুণেই হোক, অথবা বাঙালীর বিশিষ্ট মানসিকতার জন্যই হোক, ক্ল্যাসিক-পর্ব আমাদের সাহিত্যে বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে না। পারেও নি তা, ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই কবিওয়ালাদের সংযমহীন কাব্যচর্চা এবং উচ্ছৃংখল নিয়মহীন মাতামাতিতে আবার ফিরে এসেছিল রোম্যাণ্টিক যুগ ; বা রোম্যাণ্টিক যুগও নয়, বলা ভালো অসুস্থ রোম্যাণ্টিকতা বা Romantic extravagance-এর যুগ।

আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন যে সেই সময় কিছু শিক্ষিত বাঙালী কবি বাংলা কবিতাকে সেই উচ্ছৃংখলতা থেকে মুক্ত করে সাহিত্যে গুরুগম্ভীর বিষয়, সংযত কাব্যভাষা এবং সাহিত্যনির্মিতির কঠিন নিয়মের অনুশাসন প্রবর্তিত করেন। আটত্রিশ বছরের এই যুগের একপ্রান্তে আছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এবং অন্যপ্রান্তে নবীনচন্দ্র সেনের 'প্রভাস' কাব্য। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়টি অবশ্যই ক্ল্যাসিকাল যুগ এবং সাহিত্যের ইতিহাসও তাকে স্বীকার করে কৃত্রিম বীর যুগ বা Mock Classical age হিসাবে।

পরবর্তীকালে এসেছেন বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা গীতিকাব্যের পথিকৃৎ হিসাবে, অর্থাৎ পরবর্তী রোম্যাণ্টিক যুগের প্রবর্তক রূপে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন 'ভোরের পাখি' এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একটি বিশাল যুগ ও রোম্যাণ্টিক বলয় সৃষ্টি করে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই রবীন্দ্র যুগ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার জন্য একদল কবি যে রবীন্দ্রবিরোধী কাব্যসাধনা করেছেন এবং রবীন্দ্রোত্তর কবিতা বা সাধারণভাবে আধুনিক কবিতার ধারা প্রবর্তন করেছেন, লক্ষণবিচারে আমরা সেই সময় অর্থাৎ বর্তমান সময়ের কবিতা ও কথাসাহিত্যকে আখ্যা দিতে পারি ক্ল্যাসিকাল যুগ। অন্তত বুদ্ধির অতিপ্রাধান্য, ভাবের ব্যাপারে ঈষৎ সংকুচিত কিন্তু প্রকাশের ক্ষেত্রে সপ্রতিভ এই যুগে ক্ল্যাসিক ধর্মই বেশি আছে, কোন সন্দেহ নেই।

ঘ. রিয়ালিজম ও ন্যাচারালিজম

রিয়ালিজম বা বাস্তবতাবাদকে একটি বিশেষ সাহিত্যিক মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে কোন কোন সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলেছেন, সাহিত্যে সর্বদাই আমরা বাস্তবকে মান্য করতে চাই, অবাস্তব বা অসত্য নিয়ে সাহিত্য রচিত হতেই পারে না। সুতরাং সাহিত্যে বাস্তবতা কোন বিশেষ সময়ের প্রার্থিত ব্যাপার হতে পারে না। এই ধরনের মতাবলম্বী এক সমালোচক G. H. Lewes-এর মন্তব্য—"Art always aims at the representation of Reality, i.e. of Truth ; and no departure from Truth is permissible."

এইভাবে যখন 'বাস্তবতা' শব্দটিকে গ্রহণ করা হয় তখন কিন্তু সাহিত্যে বাস্তবতার আপেক্ষিক ধারণার কথাই ভাবা হয়। সাহিত্যে কখনো বাস্তব উপাদান কম থাকে, কখনো বা বেশি থাকে, কিন্তু সাহিত্যে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের কথা যখন আমরা বলি তখন বিশেষভাবে এমন এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত সাহিত্য পর্যায়কে বুঝিয়ে থাকি যার তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিপুলভাবে স্বীকৃত হয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মূল্যবোধ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হওয়ার পর একে বলা যেতে পারে এক নতুন আরম্ভ। এই আন্দোলন বিশেষ এক ভৌগোলিক অঞ্চলে উদ্ভূত হয়ে ক্ষণকালের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, এমন আন্দোলনও নয়। এ বিষয়ে এক দীর্ঘ সংকলনের সম্পাদক G. J. Becker তাঁর Documents of Modern Literary Realism গ্রন্থে বলেছেন—"Realistic movement···shook the academies and the public more deeply than any other literary movement in history."

বাস্তবতাবাদী আন্দোলন সাহিত্যে উপস্থিত হবার আগেই এর উদ্ভব ঘটেছিল দার্শনিক জগতে, সুতরাং বাস্তবতাবাদের সেই দার্শনিক আন্দোলন এবং ভাববাদের বিরুদ্ধে তার প্রতিক্রিয়ার কথাই আমাদের আগে জেনে রাখা দরকার।

স্থূলভাবে দেখতে গেলে ভাববাদ বা Idealism-এর প্রতিক্রিয়াতেই গড়ে উঠেছিল দার্শনিক জগতে বাস্তবতাবাদী আন্দোলন, আরো স্পষ্ট ও সূক্ষ্ম বিচার করলে বলতে হবে, ভাববাদের যে-দুটি প্রধান ধারার বিরুদ্ধে বাস্তবতাবাদী দর্শনের প্রতিবাদ, দার্শনিক পরিভাষায় তাদের নাম যথাক্রমে Conceptualism এবং Nominalism. প্রথম মতবাদটির মূল কথা, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু-সম্পর্কিত ধারণাই আমাদের মন তৈরি করে নেয়, মনের বাইরে তার আর কোন অস্তিত্ব নেই। Nominalism-কে আরো উগ্র ভাববাদ বলা চলতে পারে। এই মত মানতে গেলে বলতে হবে, পার্থিব বস্তু বলে ভ্রান্ত ভাবে যা গ্রহণ করা হয় তার কোন প্রকৃত অস্তিত্ব তো নেইই, এবং তা কিছু নামের সমষ্টি ছাড়াও আর কিছু নয়। ভাববাদী দর্শনের এই দুটি ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয় প্রথম অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় টমাস রীডের 'কমন সেন্স' স্কুলে। কীভাবে প্রতিবাদ জানানো হয় সেই সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হবার কোন দরকার নেই, বরং এর মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জন ডি. জাম্প তাঁর The Critical Idiom : Realism গ্রন্থে যা বলেছেন তাই এখানে উদ্ধৃত করা যায়—"It claimed that the objects of perception are objects and have a real existence outside the perceiving mind."

একে বলা যায় বাস্তবতাবাদী দার্শনিক আন্দোলনের সূচনা। বেশ কিছুদিনের মধ্যেই এই দর্শনচিন্তা প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় চেতনাকে অধিকার করে ফেলে। দার্শনিক জগতে যখন ভাববাদ প্রবল ছিল, সাহিত্যেও তখন ছিল ভাববাদী সাহিত্যেরই প্রাধান্য, স্থূল ভাবে যাকে বলা হয় রোম্যাণ্টিক সাহিত্য। দার্শনিক জগতে বাস্তবতাবাদ যেমন আক্রমণ করেছে Idealism-কে, সাহিত্যিক জগতে তা আক্রমণ করেছে রোম্যাণ্টিক মতবাদকে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, অর্থাৎ একেবারে এক কথায় বাস্তবতাবাদের স্বরূপ সন্ধান করতে গেলে বলতে হবে, মানুষকে তা দেখতে চেয়েছে objectively বা বস্তুগতভাবে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে 'বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা।' রোম্যাণ্টিক সাহিত্যিকরা জীবনের যে-চিত্র প্রকাশে উৎসাহী ছিলেন তা জীবনের এক কাম্য রূপ, আদর্শান্বিত রূপ-যথাযথ রূপ নয়; পক্ষান্তরে বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিকরা যে কাজটি করলেন সমালোচকের ভাষায় তা এই রকম—"It (Realism) observes life as it is in its wholeness and complexity with the least possible prejudice on the part of the artist."

● বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের উদ্ভব

বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রথম ফসল উপন্যাস এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গুস্তাভ ফ্লবেয়রের 'মাদাম বোভারী'-ই প্রথম বাস্তবতাবাদী উপন্যাস, এই রকম একটা ধারণা প্রচলিত থাকলেও সমালোচক Frank O' Conner এই মতের

প্রতিবাদ করেছেন এবং উপন্যাস এই আন্দোলনের পথিকৃতের সম্মান দিতে চেয়েছেন একযোগে চারজনকে—তুর্গেনেভ, তলস্তয়, এ্যান্টনি ট্রোলোপ এবং গুস্তাভ ফ্লবেয়রকে। আমরা এর সঙ্গে অপর এক শক্তিশালী ঔপন্যাসিক জর্জ এলিয়টের (মেরি অ্যান ইভান্স) নামও যুক্ত করতে পারি। কবিতায় অবশ্যই বাস্তবতাবাদ প্রবর্তনের সম্মান আমাদের দিতে হবে আমেরিকার কবি হুইটম্যানকে তাঁর 'Leaves of Grass' কাব্যগ্রন্থের জন্য। অবশ্য তা সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে একথা অনেকেই স্বীকার করে নেন যে, বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ফরাসী সাহিত্যে।

যে সাহিত্যেই বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটুক, অল্প দিনের মধ্যেই সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্য বা কণ্টিনেণ্টাল সাহিত্যকে তা আলোড়িত করেছে। ইংরেজি উপন্যাসে এর অভিঘাত কিছুটা কম বলে মনে হলেও জর্জ এলিয়টের 'সাইলাস মার্নার', 'মিল অন দি ফ্লস' প্রভৃতি উপন্যাস, জর্জ মুরের 'এ সামারস্ ওয়াইফ', সামারসেট মমের 'লিজা অব ল্যামবেথ্', জন গল্স্ওয়ার্দির 'ভিলা রুবেন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বাস্তবতাবাদী উপন্যাস সেখানে ক্রমান্বয়ে লেখা হয়েছে। এই আন্দোলনের একজন সমর্পিতপ্রাণ মানুষ ছিলেন আর্নল্ড বেনেট।

রুশ সাহিত্য বাস্তবতাবাদী আন্দোলনে খুব বেশি আলোড়িত হয়েছে। এই আন্দোলনের স্বপক্ষে যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে, তেমনি সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সংখ্যাও বিশেষ কম নয় বলেই আমাদের মনে হয়। তুর্গেনেভের নাম ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হিসাবে তলস্তয় বা দস্তয়েভ্স্কির নাম যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় তার কারণ তাঁদের অনেক লেখায় বাস্তবতাবাদী মনোভাব। কিন্তু সঠিকভাবে রুশ বাস্তবতাবাদী লেখক বলতে আমরা বুঝি অন্তত দুজন কথাসাহিত্যিককে—এঁরা হলেন 'এ থাউজ্যান্ড সোল্স্'-এর লেখক এ. এফ. পিসেম্স্কি এবং 'ওব্লোমোভ'-এর রচয়িতা আইভ্যান গণ্চারভ।

ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অন্যত্র এই আন্দোলনের স্বীকৃতিধন্য উপন্যাসের কথা ভাবতে গেলে আমাদের মনে পড়বে নরুইজীয়ান সাহিত্যে নুট হ্যামসুনের কথা—তাঁর 'দি হাঙ্গার' এক সময় আমাদের কল্লোলীয়দের জীবনবেদ ছিল। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান সাহিত্যে ইবসেন এবং জর্নসন, বিশেষ করে ইবসেনের নাটকগুলি উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'এ ডল্স্ হাউস' বা 'অ্যান এনিমি অব্ দি পীপল'-এর সঙ্গে আমরা বিশেষ ভাবে পরিচিত। ইতালীয় সাহিত্যে এই আন্দোলনের প্রধান পুরুষ ছিলেন অ্যালবার্তো মোরাভিয়া এবং বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের নাম সেখানে হয়েছিল Verismo. অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সাহিত্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির দ্বারা এই আন্দোলনের প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা হলেন স্পেনের ক্যামিলো সেলা, পর্তুগালের জেইমে ব্রাসিল, জার্মানীর Hauptmann প্রভৃতি। ইউরোপ ছাড়াও, আমেরিকাতেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল, যদিও একটু বিলম্বে। কবি হুইটম্যানের উল্লেখ আমরা আগেও করেছি, কুপারের উল্লেখ এই প্রসঙ্গেই করা

যায়। তবে আমেরিকায় বাস্তবতাবাদকে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন থিওডোর ড্রেইজার। পরবর্তীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য জেম্‌স্‌. টি. ফ্যারেল, ইউজিন ও'নীল, আপটন সিনক্লেয়ার প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনের অভিঘাত এসেছে বেশ কিছুটা দেরি করে। প্রধানত 'কল্লোল' ও অন্য কয়েকটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কথাসাহিত্যে 'কল্লোল যুগ' নামে পরিচিত যে সময়, সেই সময়েই কিছু তরুণ সাহিত্যিক এই আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেন। এঁদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে এঁদের মধ্যে সবচেয়ে সার্থক ভাবে বাস্তবতাবাদী আন্দোলনকে আত্মস্থ করেন জগদীশ গুপ্ত।

● বাস্তবতাবাদী সাহিত্যের লক্ষণ

ভাববাদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা ও বিদ্রোহের জন্যই যখন বাস্তবতাবাদের জন্ম তখন সাহিত্যসৃষ্টিতে এই মতবাদের উদ্দেশ্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। কথাসাহিত্যে এর লক্ষণ সেই কারণেই বুঝে নেওয়া মোটেই শক্ত নয়। এর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ প্রকৃতই যা তাকে ঠিক সেইভাবে চিত্রিত করা। অর্থাৎ মানুষ যেমন হলে ভালো হতো, আমাদের যেরকম মানুষের আচার-আচরণ দেখতে বা পড়তে ভালো লাগে, তা নয়; মানুষের যেমন হওয়া উচিত, হলে ন্যায়নীতি সব বজায় থাকে, সেরকমও নয়; মানুষ তার সভ্যতা বা কৃত্রিম আচরণের আড়ালে ঠিক যেরকম, তার প্রসাধনহীন সেই চেহারাটিই বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিকগণ পছন্দ করে থাকেন।

এ ছাড়াও অন্যান্য যেসব লক্ষণের দ্বারা বাস্তবতাবাদী কথাসাহিত্য চিহ্নিত, সেগুলিকে আমরা এইভাবে উল্লেখ করতে পারি :

এক ।। উপন্যাস রচনার জন্য তার বিষয়বস্তু আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়, যেটা তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল সেই বিষয়ের treatment বা সুষ্ঠু ব্যবহার।

দুই ।। রচনা-প্রকরণ এমন হওয়া উচিত যাতে লেখক সেই রচনায় একেবারেই অনুপস্থিত থাকতে পারেন। লেখকের স্বরূপ রচনায় অনধিগম্য হওয়াটাই সাহিত্যের পক্ষে সবচেয়ে কাম্য এবং দৃঢ় বস্তুধর্মিতা বা objectivity এবং নিরপেক্ষতাই সাহিত্যকে জীবনের সমান্তরাল করে তুলতে পারে।

তিন ।। সাহিত্য সম্পর্কে একটি কথা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, লেখক কোন বিশেষ মতবাদ দ্বারা পুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যের কাজ মোটেই প্রচার করা নয়—তা আমাদের জীবন ও মানুষের সত্য অবহিত করায় মাত্র।

চার ।। একেবারে বিষয়বস্তু বলতে কিছুই নেই, এরকম উপন্যাস রচনা করাও অসম্ভব নয় ।

● ন্যাচারালিজম

ন্যাচারালিজমের সঠিক কোন প্রতিশব্দ বাংলায় এখনও সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথ এর প্রতিশব্দ নির্বাচন করেছিলেন প্রকৃতিকতা, কিন্তু বর্তমানে বেশি প্রচলিত আর একটি শব্দ, যথাস্থিতবাদ। আমরা যথাস্থিতবাদ নামেই তাকে অভিহিত করবো।

অনেক সমালোচকই মনে করেন বাস্তবতাবাদ এবং যথাস্থিতবাদ প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন গোত্রের মতবাদ, তবে একেবারে অভিন্ন এদের বলা যায় না, কারণ যথাস্থিতবাদ বাস্তবতাবাদেরই চূড়ান্ত পরিণতি। John D. Jump এ বিষয়ে বিস্তৃত বিশ্লেষণের পর বলেছেন—"Naturalism is the logical result of realism ; one is a process and the other is the aim."

এই মত মেনে নিলে বলা যায়, বাস্তবনিষ্ঠ চরিত্র-চিত্রণ করতে গেলে আমরা যথাস্থিতবাদী পদ্ধতি না মেনে নিয়ে পারি না। আসলে ফরাসী সাহিত্যে বাস্তবতাবাদী আন্দোলন শুরু হবার অনতিকাল পরেই ন্যাচারালিজম তাকে এমন পরিণতি দিয়েছে দুটি মতবাদ প্রায় অভিন্ন হয়ে গেছে।

অন্য একটি মত হল এই যে, যথাস্থিতবাদীরা অন্য একটি দার্শনিক মতে বিশ্বাস করেন, সেই দার্শনিক মত ডারউনের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত। অবশ্য এই দুই ধারণার মধ্যে যেটাই গ্রহণযোগ্য মনে হোক যথাস্থিতবাদী সাহিত্যিকদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে সমালোচকদের বিশেষ মতভেদ নেই। এই প্রতিপাদ্য বিষয় অনুসারে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই, তার মধ্যে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক চেতনাও অনুপস্থিত—সে প্রকৃতির হাতে তৈরি এক অসহায় ক্রীড়নকমাত্র। তাকে প্রায় পশুই বলা যায়, তবে একটু উচ্চস্তরের পশু। তাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার বংশগতি এবং পারিপার্শ্বিক। একেবারে মৌলিক সত্তায় তার যে দুটি পাশব বৃত্তি আছে—ঔদরিকতা এবং কামতাড়না, তাই তার জীবনে বড় সত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কৃত্রিম আবরণে সেটাকে সে কিছুটা আবৃত করে রাখতে সমর্থ হয় এই মাত্র।

ফরাসী সাহিত্যে এই মতবাদ এবং মতবাদপুষ্ট সাহিত্যের উদ্গাতা বলা যায় এমিল জোলাকে। তিনি তাঁর এই মতবাদ সমন্বিত উপন্যাসকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'লে রোমাঁ এক্সপেরিমেঁতাল' অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত উপন্যাস। জোলার পরে স্বদেশে এবং অন্যত্র এই মতবাদের ধারক ও বাহক কিছু দেখা দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে খ্যাতিমান কয়েকজনের নাম ফ্র্যাঙ্ক নরিস, স্টিফেন, থিওডোর ড্রেইজার প্রমুখ।

বাংলা সাহিত্যে যথাস্থিতত্ত্ববাদী লেখক হিসাবে সবচেয়ে সমর্থ দৃষ্টান্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে যেমন মানুষের একেবারে জৈবিক স্তরের দুটি বৃত্তিই অনাবৃত ও বীভৎস ভাবে ফুটে উঠেছে, তেমনি 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসেও প্রকৃতির হাতে অসহায় মানুষের জীবনচিত্র দেখানো হয়েছে। অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের কথাসাহিত্যেই যথাস্থিতবাদী লক্ষণ প্রকট, পরবর্তী পর্যায়ে মানুষের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি আশাবাদী।

বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য যেসব লেখকের মধ্যে সমজাতীয় মানসিকতা দেখা দিয়েছে তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, গোকুলচন্দ্র নাগ, মনীন্দ্রলাল বসু প্রমুখের।

ঙ. সিম্বলিজম বা প্রতীকীবাদ

সিম্বলিস্ট বা প্রতীকীবাদী আন্দোলন হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে যা পরিচিত, তার প্রথম উদ্ভব ঘটে ফরাসী কাব্যসাহিত্যে বদলেয়ারের হাতে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর **Fleurs du Mal** কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমেই এর সূচনা ঘটে। অবশ্য তার পরেই বেশ কিছু সমর্থ কবি এই মতবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে পড়েন এবং তাঁদের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিতে এই কাব্য-আন্দোলন রীতিমত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এঁরা হলেন র‍্যাঁবো, ভার্লেন, মালার্মে এবং পল ভালেরি।

প্রতীকীবাদী কবিরা কবিতায় অহেতুক বর্ণনা, প্রাঞ্জলতার জন্য অনুভূতির গভীরতা হ্রাস, সংযমের অভাব ইত্যাদিকে একেবারে বর্জন করে কবিতার প্রকাশকে করতে চেয়েছেন প্রতীকী, এবং এই ভাবেই কবিতার অনুভব ও প্রকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে চেয়েছেন। কবিতা সম্পর্কে এই বোধ এবং এর ইত্যাকার প্রকাশ-সৌকর্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এবং ইংরেজ কবিদেরও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ব্রিটিশ এবং আমেরিকান কবিদের মধ্যে যাঁরা এ বিষয়ে সচেতন ভাবে কাব্যসৃষ্টি করেন তাদের মধ্যে আর্থার সিমনস্, আর্নেস্ট ডসন, ইয়েট্স্, এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, ডিলান টমাস, হার্ট ক্রেন, কামিংস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য প্রতীক বা সিম্বল ব্যবহার করা হলেই যে প্রতীকীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তার সংযোগ থাকবে, এমন নয়। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

প্রতীক, সংকেত বা সিম্বল সাহিত্যে দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহার করা হচ্ছে, এবং সেটাই স্বাভাবিক। প্রতীক বলতে বোঝায় এখন কিছু যার একটা আলাদা ব্যঞ্জনা আছে, এক হিসাবে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলিও প্রতীক-প্রতীকোদ্যতনাই ভাষার প্রধান ধর্ম। প্রত্যেক ভাষায় অবশ্য কিছু বহুব্যবহৃত প্রতীক আছে, পুরনো আমলের কবিরাই তাদের বহুব্যবহারে রীতিসিদ্ধ ও মলিন করেছেন। পরবর্তীকালের কবিরা কখনো কখনো

এই রীতি পালটান ফলে তারা ভিন্ন অনুষঙ্গ বহন করে। প্রচলিত রীতির প্রতীকের উদাহরণ হিসাবে যেমন আমরা উল্লেখ করতে পারি উদিত সূর্যের, ময়ূর বা ঈগল পাখি। এরা যথাক্রমে নবজাতক, গর্বিত ভঙ্গি এবং বিজয়ীর ঔদ্ধত্য বোঝাতে প্রতীকায়িত হয়। কবি ভিন্নভাবে ব্যবহার করেই প্রতীকের ব্যঞ্জনা পালটাতে পারেন, যেমন জীবনানন্দের হাতে হেমন্তের মাঠ বা সমর সেনের হাতে বুড়ো বট ভিন্ন ভাবে প্রতীকায়িত হয়েছে।

কবিরা একটি শব্দকে ঠিক কখন উপমা, রূপকের গণ্ডি পেরিয়ে প্রতীকায়িত করতে পারেন সে কথা অ্যাব্রামস্ সুন্দর ভাবে বুঝিয়েছেন, আমরাও সেই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতে পারি। 'গোলাপ' একটি ফুলের নাম, এর বাস্তব অর্থ সেই ফুল। একে উপমায় অনেকেই ব্যবহার করেছেন এর পেলব সৌন্দর্যের জন্য, যেমন বার্নস-এর কবিতায় পাই—

"O my love's like a red, red rose."

একে আমরা বিশুদ্ধ উপমাই বলবো। সেটা রূপকে পরিণত হতে পারে গোলাপ ও তার তুল্য বস্তুর পার্থক্য একেবারে ঘুচে গেলে। সেরকম প্রয়োগও যে ইংরেজি কবিতায় হয়নি এমন নয়, W. M. Praed লিখেছেন—

"She was our queen, our rose, our star ;
And then she danced—O Heaven, her dancing !"

এর পরেও তুলনা অগ্রসর হয়ে একেবারে উপনীত হতে পারে এমন একটা স্তরে যখন গোলাপ আর ঠিক কারো তুলনা থাকে না, নিজেই একটা পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনা হয়ে আবেদন জানাতে কাছে হৃদয়ের কাছে। স্মরণ করা যাক উইলিয়াম ব্লেকের The Sick Rose কবিতাটির কথা :

"O Rose thou art sick.
The invisible worm
That flies in the night
In the howling storm :

Has found out thy bed
Of crimson joy :
And his dark secret love
Does thy life destroy."

এখানে গোলাপের সঙ্গে কারো তুলনাই আমরা পাই না, তবু গোলাপ এখানে শুধু গোলাপ নয়, আরো কিছু। যদি তা না হতো তবে bed, joy, love ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার থাকতো না, থাকতো না সমস্ত কবিতায় ছড়ানো একটা বিষন্নতার সুর, কিম্বা এই তীব্র অনুভূতি—একটা গোলাপের পক্ষে যা বাহুল্য মাত্র। ফলে এটা হয়ে ওঠে প্রতীকী ব্যাপার।

আমাদের বর্ণনীয় প্রতীকীবাদ অর্থাৎ যে বিশেষ সাহিত্যিক আন্দোলনের কথা এখানে বর্ণনীয় তা যে কেবল কবিতায় দেখা দিয়েছিল তা নয়, কবিতায় তার সূচনা মাত্র। এরপর ইংরেজি এবং ইউরোপীয় কথাসাহিত্য ও নাটকেও তা ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত প্রতীকীবাদই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সাহিত্যে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় ছিল। কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার—প্রত্যেকেই প্রতীকী সাহিত্যকেই রচনার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম এবং শ্রেষ্ঠ প্রয়োগকৌশল বলে মনে করেছেন। এমন একটা ধারণাও প্রায় পৃথিবী জুড়ে সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা যায় যে মহৎ সাহিত্য মাত্রই ব্যঞ্জনাধর্মী—প্রতীকোদ্যতনা ছাড়া মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই প্রতীকী আন্দোলনের ফসল নন, কিন্তু প্রতীক ধর্ম তাঁর অনেক মহৎ রচনারই সম্পদ স্বরূপ। গীতাঞ্জলি-পর্বের কবিতায় এই প্রতীক পেয়েছে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা, বলাকা-পর্বে তা মহাজাগতিক ব্যঞ্জনায় পরিণত হয়েছে। নাটকে প্রতীকী ব্যঞ্জনা তাঁর রচনার স্বভাবধর্ম; 'রাজা' ও 'ডাকঘর' নাটকে তা আধ্যাত্মিক স্ফূর্তি পেয়েছে, এরপর 'রক্তকরবী' ও 'মুক্তধারা' নাটকে তা প্রতীক ধর্মের চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছে।

রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস দেখা যায়, কিন্তু সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত এবং উচ্চাঙ্গের প্রতীকী কবিতা আমরা পাই কবি জীবনানন্দ দাশের সৃষ্টিতে। প্রতীকী ধারাই অব্যাহত আছে বলা যায় এখনও। সাহিত্যের মহৎ ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে প্রতীক অপরিহার্য বলেই মনে করা হয়।

চ. সুররিয়ালিজম

সুররিয়ালিজম (Surrealism) বা অধিবাস্তববাদ জন্মগ্রহণ করে ফরাসী কবি আঁদ্রে ব্রেতোঁ-র 'Manifesto on Surrealism' নামক দলিলটি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হবার পর। এর বছরদশেক আগেই সর্বাত্মক নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ডাডাবাদ নামে একটি মতবাদের ক্ষণউদ্ভব ঘটে। তার চেয়ে অধিবাস্তবতাবাদ অনেক সর্বাত্মক ও দীর্ঘস্থায়ী। মানুষের মনের স্বাধীনতার ওপর যতোরকমের বিধিনিষেধ আছে, সমস্ত নিঃশেষ দূর করে দেবার প্রত্যাশা নিয়ে এই মতবাদের জন্ম। এইসব বিধিনিষেধের মধ্যে পড়ে সুষ্ঠু বুদ্ধি, নৈয়ায়িক শৃঙ্খলাবোধ, প্রথাসিদ্ধ নীতিবোধ, শিল্পসৃষ্টি এবং সামাজিক ভদ্রতা সম্বন্ধে সব রকমের নিয়মকানুন এবং পূর্বসিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা অনুযায়ী নিপাট সংযমী সাহিত্যসৃষ্টি। মনের গভীর স্তরে যে উজ্জ্বল অনুভব থাকে তাকেই সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছেন অধিবাস্তববাদীরা, বলেছেন সেটাই সমস্ত সৃষ্টিকর্মের মূলকথা; এবং তাকে যাতে কোন রকম ভাবে ব্যাহত না করা হয় সেজন্য এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত রচনাপ্রক্রিয়া বা 'automatic writing' অভ্যাস করেছিলেন তাঁরা। এই আন্দোলনকে সর্বাত্মক বলা হয়েছে এই

কারণে যে তা কেবল কবিতা বা উপন্যাস—বা আরো ভালোভাবে বলতে গেলে সাহিত্য-সৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ইত্যাদি অনেক শিল্পের ক্ষেত্রেই একটি আলোড়িত মনোভাব হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সর্বক্ষেত্রে যেমন এর বিস্তৃতি ছিল, তেমনি ভৌগোলিক বিস্তারও ছিল এর খুব বেশি। উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও আমেরিকা তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিল।

সুররিয়ালিজম বলতে সঠিক কী বোঝায় এবং ঠিক কী ধরনের দর্শনের সঙ্গে তার প্রকৃতির মিল আছে তা বোঝবার জন্য ব্রেতোঁ দ্বিতীয় আর একটি ম্যানিফেস্টো বার করেন। সে দুটি ম্যানিফেস্টোকে স্মরণ রেখে বলা যায়, অধিবাস্তবতা চায় স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে কোন বৈপরীত্যকে বড় করে না দেখে এদের মধ্যে এদের মিলন ও মিশ্রণজাত একটি বিশুদ্ধ বাস্তবের সৃষ্টি করতে। চিন্তাকে সমস্ত বন্ধন থেকে এঁরা মুক্ত করতে চান, কিন্তু বিশুদ্ধ কবিতার নাম করে অনিয়ন্ত্রিত ও অসংযত ভাবপ্রকাশের স্বেচ্ছাচারে তাঁরা বিশ্বাস করেন না। এঁদের মনোভাবের সঙ্গে মিল পাওয়া যায় কোন্ দার্শনিক মতের, সে কথা চিন্তা করতে গিয়ে হার্বার্ট রীড বলেছেন, অধিবাস্তববাদীরা মার্কসের Logic of totality-র তত্ত্বই অনুসরণ করেছেন, অর্থাৎ যে তত্ত্ব মার্কস্ হেগেলের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। আমরা কিন্তু মনে করি এই আন্দোলনের সঙ্গে ফ্রয়েডের দার্শনিক চিন্তার সাদৃশ্যই বেশি।

অধিবাস্তববাদী আন্দোলনে কবিতাই যে পথিকৃৎ, একথা আগে বলা হয়েছে। ব্রেতোঁ ছাড়াও এ ব্যাপারে তাঁর সহযোগী লুই আরাগঁ-র কথা আমাদের উল্লেখ করতে হবে। অধিবাস্তববাদী নাটকের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ককতোর 'অ্যান্টিগোন', 'দি ইনফার্নাল মেশিন' প্রভৃতি। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে নাম করতে হবে হেনরি মিলার, টমাস পিনচন্, উইলিয়াম বারোজ প্রভৃতির। তবে চিত্রকলায় অধিবাস্তবতার প্রয়োগ ও খ্যাতি হয়েছিল সবচেয়ে বেশি, সেইজন্য এই আন্দোলনের সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্কে যুক্ত চিত্রশিল্পী সালভাদোর দালি-র নাম আমাদের করতেই হবে।

বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতাবাদ, ডাডাবাদের মতোই অধিবাস্তবতাবাদী আন্দোলনের অভিঘাতও এসে পেঁীছেছিল কল্লোল গোষ্ঠীর কবি-সাহিত্যিকদের কাছে। অনেকে মনে করেন এঁদের কথাসাহিত্যে যেমন বাস্তবতাবাদের প্রভাব বেশি, রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় তেমনি অধিবাস্তবতার অধিকার বেশি। 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন, "আমি বলতে চাই না যে, কাব্যের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই; সম্বন্ধ রয়েছে—কিন্তু প্রসিদ্ধ প্রকটভাবে নেই।…সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়—কিম্বা প্রসূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যেন ছিল।"

এই চিন্তা যেমন অধিবাস্তববাদীদের আন্তরিক চিন্তা, তেমনি জীবনানন্দ দাশের কবিতাতেও স্পষ্টভাবেই এর প্রতিফলন আমরা দেখি। কবির ঘোড়া, হাঁস, পেঁচা, ইঁদুর প্রভৃতি প্রতীকের মধ্যে প্রকৃত ও অপ্রকৃতের এই রহস্যময় সম্মিলন ফুটে উঠেছে। আপাত-অসংগত বহু প্রতীক বা উপমা, চিত্র তিনি ব্যবহার করেন যা বাস্তব ও অবাস্তব, ধ্যান ও কর্ম, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সীমারেখা থেকে উঠে আসে—একবার যাকে অভিজ্ঞতার জগতে স্থান দিতে ইচ্ছা করে, তারপরই কল্পনার জগতে। একটি দৃষ্টান্ত :

"মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে বসে—অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতটা দূরে চলে যাই—চেয়ে দেখি আরো কিছু আছে তারপরে।
অনির্দিষ্ট আকাশের পানে উড়ে হরিয়াল আমারো বিবরে
ছায়া ফেলে। ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে যারা উড়ে যায় ধবল মিনারে,
কিম্বা যারা ঘুমন্তের মতো জেগে পায়চারি করে সিংহদ্বারে,
অথবা যেসব থাম সমীচীন মিস্ত্রির হাত থেকে উঠে গেছে বিদ্যুতের তারে,
তাহারা ছবির মতো পরিতৃপ্ত বিবেকের রেখায় রয়েছে অনিমেষ।"

[আবহমান]

পরবর্তীকালের বাংলা কবিতাতেও এই মানসিকতার নিদর্শন আমরা কিছু কিছু পাই।

ছ. অন্যান্য সাহিত্যিক মতবাদ

সাহিত্যিক আন্দোলন ও তৎসঞ্জাত মতবাদের জন্ম বিভিন্ন সময়েই হয়েছে এবং সম্ভবত হবেও, কারণ সেটাই সাহিত্যের স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এ বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ আছে, এদের উদ্ভবরহস্যও খুব আকর্ষণীয়। একটি মতবাদ জন্মলগ্নে অত্যন্ত সজীব ও বিরাট অবলম্বন হিসাবেই দেখা দেয়, কিন্তু অনতিকাল পরেই প্রথানুগত্যে তা প্রাণহীন হয়ে আসে—তার প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নেয় বিপরীত ধরনের কোন মতবাদ। বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই বলেই আমরা তাদের কয়েকটির উল্লেখমাত্র করছি এখানে।

১। অ্যাবসার্ডিজম (Absurdism)

ঔপন্যাসিক অলবেয়র কামুকে এই মতবাদের প্রবর্তক বলা যায়। বিংশ শতকের মতবাদ। মানুষের সঙ্গে তার অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবনের বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা থেকে এর উদ্ভব। আপেক্ষিকতার যে তত্ত্ব আইনস্টাইন প্রচার করেছেন সেই

বিষয়ীকেন্দ্রিক সত্যের রূপায়ণ ঘটেছে অ্যাবসার্ডিজম বা উদ্ভট মতবাদে। সামগ্রিক ভাবে এই তত্ত্বের প্রচারক ও ধারকদের দুটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়—কামু, কাফকা বা হেমিংওয়ের মত লেখক, যাঁরা অ্যাবসার্ড দর্শনের ভিত্তিকেই প্রধান করে নিয়েছেন এবং বেকেট, ইওনেস্কো-র মত অ্যাবসার্ড নাট্যকার যাঁরা তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টিতে জীবনের অসংলগ্নতা ও বিচ্ছিন্নতাকে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন।

২। **একমিইজম** (Acmeism)

এক ধরনের বাস্তবতাবাদী সাহিত্যিক মতবাদ বলা চলতে পারে। বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় এই সাহিত্যিক আন্দোলনের উদ্ভব। Mysticism বা মরমীয়াবাদী সাহিত্যিক মতবাদের প্রতিক্রিয়াতেই এই মতবাদের উদ্ভব বলে মনে করা যায়।

৩। **এ্যাকৃটিভিজম** (Activism)

এই মতবাদের উদ্ভব ঘটে জার্মানীতে, বিংশ শতকে। ঊনবিংশ শতকে উদ্ভূত এক্সপ্রেশনিজম্ নামক সাহিত্যিক মতবাদের প্রতিক্রিয়াতেই এর উদ্ভব ঘটে। সাধারণভাবে বিচার করতে গেলে একে বাস্তববাদী মানসিকতাসম্ভূত একজাতীয় সাহিত্যিক মতবাদ বলা চলে।

৪। **অটোমেটিজম** (Automatism)

এই মতবাদের উদ্ভব বিংশ শতাব্দীতে। এটিকে নতুন কোন মতবাদ না বলে সুর-রিয়ালিজম বা অধিবাস্তবতাদেরই একটি রীতি বলা যায়, যেমন অধিবাস্তবতা-বাদের আর একটি রীতি অটোমেটিজম্-এর স্বগোত্র এ্যাসোসিয়েশনিজম (Associationism)। গারট্রুড স্টেইনকে অটোমেটিজমের প্রবর্তক বলা যায়। কাব্যের এক বিশিষ্ট রচনারীতিতেই এই মতবাদের প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়।

৫। **ক্রিটিকাল রিয়ালিজম** (Critical Realism)

বাস্তবতাবাদের একটি বিভাগ হিসাবে ক্রিটিকাল রিয়ালিজম নামক মতবাদের কথা প্রথম বলেন ম্যাক্সিম গর্কি। বালজাক, স্তাঁধাল প্রভৃতির রচনায় তিনি এই ধরনের বাস্তবতা খুঁজে পান। ধনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়েও সমাজের স্থিরবস্থা এঁরা বজায় রাখতে চান। ক্রিটিকাল রিয়ালিস্টরা মানবপ্রেমিক, এই মানবপ্রেমের ভিত্তি বাস্তবভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির ওপর এঁদের বিশ্বাস কম।

৬। **কিউবো-ফিউচারিজম** (Cubo-futurism)

সাধারণভাবে এই মতবাদের সমর্থকগণ কিউবিস্ট নামে পরিচিত। এই মতবাদের উদ্ভব ঘটে রাশিয়ায়, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। প্রচলিত রীতি-নীতিও

যেমন মানেন না কিউবিস্টরা, তেমনি প্রচলিত ভাব ও ভাষাকে অস্বীকার করবার একটা অদ্ভুত খেয়াল তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। এক কথায় বলা যায়, তাঁদের রীতি কিছু উদ্ভট বলে মনে হলেও তাঁরা চেষ্টা করেন সত্যের রূপাতীত স্বরূপকে ধরবার।

৭। **ডাডাইজম** (Dadaism)

ডাডাইজমের জন্মভূমি জুরিখ, উদ্ভবকাল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ। এই মতবাদকে অধিবাস্তবতাবাদের পূর্বাভাষ বলা চলে। জুরিখে ট্রিসটান জারা, আমেরিকায় মার্সেল ডুকাম্প ও ফ্রান্সিস পিকারিয়া ছিলেন এই মতের প্রধান প্রচারক ও ধারক। জীবনের যাবতীয় মূল্যবোধকে অস্বীকার করে এই মতবাদ মানুষের অবচেতন মনের গুরুত্ব দিয়েছে বেশী করে। সনাতন পন্থার প্রতি বিদ্রূপ ও কাব্যরচনায় স্বেচ্ছাচার যে কী রকম প্রবল ছিল তা ট্রিসটান জারার একটি মন্তব্যেই স্পষ্ট হবে—"Take a newspaper, take scissors, choose an article, cut it out, then cut out each word, put them all in a bag, shake...?"

৮। **ডাইডাকটিজম** (Didactism)

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতনতা এবং সেই অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসে এই মতবাদের উদ্ভব ঘটে। কলাকৈবল্যবাদ বা Art for art's sake নীতির বিরোধী এই মতবাদ। এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে, আনন্দ বা সৌন্দর্য ছাড়াও সাহিত্যসৃষ্টির অন্য উদ্দেশ্য আছে। লোকশিক্ষা এবং নীতিশিক্ষাকে সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য মনে না করলেও শিল্পের পরোক্ষ উদ্দেশ্য এই দুটি শিক্ষা বলে এই মতবাদের সমর্থকগণ মনে করেন।

৯। **ইগো-ফিউচারিজম** (Ego-futurism)

সাহিত্যে ফিউচারিজম-এর আন্দোলন শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই রাশিয়ায় ইগো-ফিউচারিস্টদের আবির্ভাব ঘটে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এই সাহিত্যিক মতবাদের উদ্ভাবন করেন সিভেরাইয়ানিন। নামেই বোঝা যাবে, অহংবোধ এখানে খুবই প্রবল এবং অনাগত ভবিষ্যৎকে দ্রুত কাছে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা এঁদের ছিল। সিভেরাইয়ানিনের সংকল্প ছিল—"Striving of every egoist to realise the possibilities of tomorrow to-day."

১০। **এক্সপ্রেশনিজম** (Expressionism)

এটিকে দীর্ঘস্থায়ী সাহিত্যিক আন্দোলন-প্রসূত মতবাদ বলা চলতে পারে। উনবিংশ শতকেই এর উদ্ভব ঘটে। সাংকেতিক রীতিকে এঁরা শিল্পে সর্বাধিক মর্যাদা দিয়েছেন এবং চিত্রে ও কাব্যে এই রীতিকেই অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন।

যে-কোন ভাব সংকেতের সাহায্যেই সবচেয়ে ভালভাবে ব্যক্ত হতে পারে এবং সংকেতের সাহায্যেই তা পাঠক ও দর্শকের মনে তীব্রতম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, এই হচ্ছে এঁদের ধারণা ও বিশ্বাস।

১১। এক্‌জিস্টেনশিয়ালিজম (Existentialism)

এক কথায় বলতে গেলে 'Existence preceeds essence' এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন এক্‌জিস্টেনশিয়ালিস্ট বা অস্তিত্ববাদী শিল্পীরা। অস্তিত্ববাদের প্রবক্তা বলা যেতে পারে কিয়েকের্গার্ডকে। তিনি ঈশ্বরপ্রেম ও দার্শনিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বকে বড়ো করেছেন, ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন নি। কিন্তু শোপেন-হাওয়ারের ভাবশিষ্য নীৎসে এবং অস্তিত্ববাদের বড় প্রচারক ও অস্তিত্ববাদী সাহিত্যের স্রষ্টা জাঁ পল সার্ত্র ঈশ্বরকে মৃত বলেছেন বা না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছেন। এই মতবাদ subjective নিশ্চয়ই কিন্তু ভাববাদের দিকেই এর প্রবণতা বেশী।

১২। ফিউচারিজম (Futurism)

সমস্ত প্রাচীন প্রথাকে বর্জন করে অনাগত ভবিষ্যৎকে আহ্বান করাই এই মত-বাদের প্রধান কথা। এক বেপরোয়া এবং স্বেচ্ছাচারী মনোভাব এই মতবাদের সার বলে মনে হয়। প্রথানুসারী বিষয় এবং আঙ্গিক—দুটি ক্ষেত্রেই এই মতাবলম্বী শিল্পীদের অসহিষ্ণু অনাস্থা দেখা যায়। কাব্যে ও চিত্রে এর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই। বিংশ শতাব্দীতেই এই মতবাদের উদ্ভব ঘটে। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিলিপ্পো টোমাসো মেরিনিও এই আন্দোলনের সূচনা করেন।

১৩। হিউম্যানিজম (Humanism)

হিউম্যানিজম-এর আন্দোলন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভূত হয়েছে এবং সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। এই মতবাদের মৌলিক সত্য মানুষকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দান। মানুষই পরম পুরুষার্থ, তা ছাড়া আর কিছু স্বীকার করা অর্থহীন বলে এই মতবাদ বিশ্বাস করে। মানুষের জীবন, তার কর্মময়তা, তার ধর্ম—এ সবের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশী করে। বিংশ শতকে এই আন্দো-লনের নূতন নামকরণ হয় Neo-Humanism. আমেরিকার পল এলমার মোর এবং ব্যাবিটে এই আন্দোলনের প্রধান পুরুষ বলা যায়। এই নতুন মতবাদ জীবনের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূল্য স্বীকার করেছে, সেই সঙ্গে সত্য-শিব-সুন্দরের সনাতন মর্যাদাকেও স্বীকার করে নিয়েছে। পরবর্তীকালে উদ্ভূত হয়েছে Radical Humanism—ভারতবর্ষে যার প্রধান পুরুষ ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়।

১৪। আইডিয়ালিজম (Idealism)

শিল্প-সাহিত্যে আয়ডিয়ালিজম বা আদর্শবাদের প্রচলন দীর্ঘকালের। বিভিন্ন সময়েই এর প্রকৃতির কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। এই মতবাদের মৌলিক সত্যগুলি

এই রকম বলা যেতে পারে—শিল্প-সাহিত্যে নৈতিক আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে, মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা স্বীকার করতে হবে এবং শিল্পে তার জীবনের সেই রূপই প্রতিফলিত হবে, সাহিত্যের চরিত্র-চিত্রণ যথাযথ না করে চরিত্রের আদর্শায়ন ঘটাতে হবে এবং নৈরাশ্যবাদ পরিহার করে মানুষকে যেন আশাবাদী করে তোলা যায় এই-ভাবে শিল্পসৃষ্টি করতে হবে।

১৫। **ইমেজিজম** (Imagism)

কাব্যসৃষ্টিই এই সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র। এই আন্দোলনের প্রাবল্য দেখা গিয়েছিল আমেরিকা ও ইংলণ্ডে। এজরা পাউণ্ড, লোয়েল প্রভৃতির রচনায় এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটে। সাহিত্যে যে সাংকেতিক আন্দোলন দেখা গিয়েছিল ইতিপূর্বে, এই আন্দোলনকে তারই একটা নতুন দিক বলা চলে। ইমেজ বা প্রতিরূপকে ভাবের বাহন হিসাবে সৃষ্টি করার চেষ্টা এঁরা করেছিলেন। আঙ্গিকের দিকে দেখি সামান্য বচনকে এঁরা যথাসম্ভব বর্জন করার চেষ্টা করেছেন।

১৬। **ইম্প্রেশনিজম** (Impressionism)

একে বলা চলতে পারে একজাতীয় অতিবাস্তববাদ। বাস্তবতাবাদী আন্দোলনেরই পরিণতি হিসাবে এই আন্দোলনের সূত্রপাত এবং অনতিকালের মধ্যেই এক দৃঢ় মতবাদ হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়। বস্তুর যথাযথ রূপ এঁরা সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে চাননি, বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করে পরিবর্তমান বিষয়ের উপলব্ধিই ছিল এঁদের কাছে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। এক কথায় বলা যায়, বাস্তবতাবাদী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত হয়েও বস্তুর পরিবর্তে বস্তুধর্মের সন্ধান ছিল এঁদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

১৭। **প্রিমিটিভিজম** (Primitivism)

এই আন্দোলন তীব্র ও ব্যাপক না হলেও সাহিত্যিক মতবাদ হিসাবে একেও স্বীকৃতি জানানো দরকার। সাধারণভাবে বলা যায়, এই মতবাদের মধ্যে এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি আছে। বর্তমানের প্রতি বিমুখতা এবং অতীতের প্রতি প্রীতি ও অতীত অনুসরণের প্রবণতা এই মতবাদের লক্ষণ।

১৮। **র‍্যাশনালিজম ও অ্যান্টি-র‍্যাশনালিজম** (Rationalism and Anti-Rationalism)

দুটি মতবাদই কয়েক শো বছরের পুরাতন। নামকরণ থেকে যেরকম মনে হয়, এদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যও কিছুটা সেই ধরনের। বুদ্ধিবৃত্তির ওপর প্রচণ্ড আস্থা-শীলতার লক্ষণ নিয়ে উদ্ভূত হয় র‍্যাশনালিজম। প্রধানত এম্পিরিসিজমের প্রতি-ক্রিয়াতেই এই বিরুদ্ধ-চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই মতবাদের প্রধান কথা এই রকম—প্রত্যক্ষ প্রতীতি ব্যতিরেকেই, মানুষ নিজের বুদ্ধিবৃত্তি থেকেই প্রচুর জ্ঞান

লাভ করতে সমর্থ, কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যেই সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব, বিশ্বজগৎ কঠিন নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলেই বুদ্ধি দ্বারাই এই নিয়ম-শৃঙ্খলাকে জানা সম্ভব, এবং সব কিছুর প্রতি উদগ্র সন্দেহ এবং স্বাধীন চিন্তা দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে কোন কিছুকে স্বীকার করে নেওয়া।

র‍্যাশনালিজমের প্রাবল্য যখন দেখা যায় তখন এই প্রতিক্রিয়াতেই উদ্ভব ঘটে অ্যান্টি-র‍্যাশনালিজমের। বোধিবৃত্তির ওপর আস্থাস্থাপন এর বৈশিষ্ট্য। র‍্যাশনালিজমের প্রধান কথা যেগুলি বলা হয়েছে, তার বিপরীত কথাগুলিই অ্যান্টি-র‍্যাশনালিজমের সারমর্ম।

১৯। **রিজিওনালিজম** (Regionalism)

বাস্তব শিল্পানুকৃতির এক বিশেষ ধরনের প্রবণতা থেকে রিজিওনালিজম বা আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম হয়েছিল। বিশেষ অঞ্চলের বা প্রদেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য, তাদের সংস্কৃতির পরিচয় এবং সেই বিশেষ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতিকে উপস্থাপিত করাই এই বিশিষ্ট মতবাদের দাবী এবং সেই অনুসারে শিল্পসৃষ্টি তাঁরা কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।

২০। **সেন্টিমেন্টালিজম** (Sentimentalism)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই সাহিত্যিক মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে। বুদ্ধির পরিবর্তে হৃদয়ধর্মের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য। আদর্শ এবং নৈতিক বোধ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্য ও আবেগপ্রবণতা ধরা পড়ে এই মতাবলম্বী সাহিত্যিকদের রচনায়।

২১। **সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম** (Socialist Realism)

বাস্তবতাবাদের একটি প্রধান শ্রেণী হিসাবে ম্যাক্সিম গর্কি সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম বা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং অচিরেই তা এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক মতবাদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই মতবাদের লক্ষ্য হচ্ছে প্রাচীন রীতিনীতির ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং তাকে সমূলে উৎপাটিত করা। সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বিপ্লবী সম্ভাবনার উন্নতিসাধনই এর আদর্শ। এই মতবাদ যেমন কলাকৈবল্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তেমনি যথা-স্থিতবাদীদের বিপক্ষেও। প্রকৃষ্ট ইতিহাস-চেতনা লাভ করে, গতিশীল বাস্তবকে উপলব্ধি করে এক ধরনের আশাবাদ প্রচার করতে চেয়েছেন এঁরা—যার ফলে সমাজতান্ত্রিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। গর্কি নিজেও ছিলেন এই মতবাদের সমর্থক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যজীবনের উত্তরপর্বে সচেতনভাবে এই মতবাদ প্রচার করার চেষ্টা করেছেন।

২২। **ট্র্যানসেনডেন্টালিজম** (Transendentalism)

ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং দিব্য অনুভূতিতে গভীর বিশ্বাস এই মতবাদের প্রধান

কথা। দার্শনিক লক্ষণে চিহ্নিত করতে গেলে বলতে হবে, এটি বাস্তবতাবিরোধী একধরনের ভাববাদ। পারমার্থিক সত্তাতে গভীর আস্থা স্থাপন করে বাস্তবের কঠিনতা পরিহার এই মতবাদের বৈশিষ্ট্য। এই সাহিত্যক মতবাদের প্রধান উদ্গাতা উনবিংশ শতকের এমার্সন এবং বিংশ শতকের গ্রে।

২৩। **আলট্রাইজম** (Ultraism)

বিংশ শতকে উদ্ভূত এই সাহিত্যিক মতবাদে মানুষের কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকার করা হয়নি। সমগ্র প্রকৃতি এবং জগৎপ্রবাহের সঙ্গে মানুষ এক হয়ে আছে এবং প্রকৃতির অন্যান্য প্রাণীদের মত মানুষও একই নিয়মের অধীন—এ কথাই এই মতবাদ বিশ্বাস করে। এককথায়, এর মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী মানববিরোধিতায় নিহিত মনে করা যেতে পারে।

২৪। **ইউন্যানিমিজম** (Unanimism)

বিংশ শতকের গোড়ার দিকে এই মতবাদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। সাধারণভাবে এক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবিরোধী মতবাদ বলা বলে। কারণ, মানুষের স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষ মর্যাদা না দিয়ে গোষ্ঠীচেতনাকেই এই মতাবলম্বীরা প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। মানুষকে দেখা হয় একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য হিসাবে, অথবা বলা যায় বিবর্তনশীল মানবগোষ্ঠীকে সমগ্রভাবে চিন্তা করে তার অন্তর্ভুক্ত একজন ব্যক্তি হিসাবে। মানবেতিহাস, নানা গোষ্ঠীর বিবর্তনের ইতিহাস, একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক—এইসবই এই মতবাদের প্রধান চিন্তার বিষয়।

২৫। **ভর্টিসিজম** (Vorticism)

এই মতবাদের মধ্যে বিভিন্ন মতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এত প্রবল যে এর নিজস্ব বক্তব্য সেই তুলনায় অস্পষ্ট হয়ে আছে। মনে হয় ইমেজিজম-এর সঙ্গে এর সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী। এতগুলি প্রতিষ্ঠিত মতবাদের বিরোধিতা করেছে এই শৈল্পিক আন্দোলন যে, সেই সূত্রেই এটি খ্যাতি লাভ করেছে। যথাস্থিতবাদ, ইম্প্রেশনিজম প্রভৃতি অনেক মতেরই এটি বিরোধী, তবে ফিউচারিজমের সঙ্গে এর সম্পর্ক সবচেয়ে কটু, এঁদের সিদ্ধান্ত—"The new vortex plunges to the heart of the present".

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে শিল্পী লেউইস এটি উদ্ভাবন করেন এবং এজরা পাউণ্ডের মত কবি-সমালোচক এর সমর্থক ছিলেন।

অনেকগুলি মতবাদের উল্লেখ করা হল। এ ছাড়া অন্য কোন মতবাদ সাহিত্যিক আন্দোলন ঘটায় নি বা 'ইজম্'-এ পরিণত হয়নি এমন নয়, কিন্তু সাধারণভাবে উল্লিখিত মতবাদগুলিই উনবিংশ-বিংশ শতকে সাহিত্যতাত্ত্বিক চিন্তার গতিবিধি বুঝতে সাহায্য করবে। এই চিন্তাভাবনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়েই আমরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যতত্ত্বের আলোচনায় আপাতত ছেদ টানতে চাই।

শিষ্ট
াংলা
ন।
এবং
শার
ংলা
য়ক
াও
ন:
বন',
গ্রন্থ
দেশ'
এই
শীল
নন।
তাঁর
ারিত্ত
পনা-
চনার
ধ্যেই
রছেন
লেই